# মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সেক্টর কমান্ডার এম হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক

আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি কমান্ডো ইউনিট নিয়ে বিকল্প পথে তৎকালীন তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে চলে আসেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশী হেলিকপ্টার চালক স্কোঃ লীঃ সুলতান মাহমুদের সাক্ষাৎ পান। মুক্তিযুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। ২০০৬ সনে বাংলাদেশ সরকার '৭১ এর রণক্ষেত্রে অসাধারণ নেতৃত্বের মূল্যায়নে ঢাকা শহরের অভিজাত বনানী আবাসিক এলাকার ২৩ নম্বর সড়কটি তার নামে নাম করণ করে তাকে সম্মানিত করা হয়।

জনযুদ্ধে সম্পৃক্ততার স্মৃতি তাকে জনতার সাথে কাজ করার তাগিদের প্রভাবে তিনি ১৯৭৮ সালে বিমানবাহিনী থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি ১৯৭৯, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে ২য়, ৫ম এবং ষষ্ঠ সংসদে ১৭৮ মুন্সিগঞ্জ ২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ৯ বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তিনি মাঠে ময়দানে থাকেন। সংগ্রাম আন্দোলনে ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ততার কারণে তিনি দুইবার কারারুদ্ধ হন। '৮৬ তে জাফর ড্রাইভার এপিসোড তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে তিনি ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে জেনারেল এসেম্বির প্লেনারী সেশনে নামিবিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি সমস্যার উপর ভাষণ দেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কনভেনর হিসাবে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমাগত লোকসানী সংস্থা থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত করেন। ঐ সংস্থাটির ব্যাপক উন্নয়নকল্পে তিনি বহুবিধ কার্যক্রম শুরু করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত ট্রাস্টের ৪.৩৩ একর জমি ভূমিদস্যুদের দখলমুক্ত করে সেখানে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা, চতুর্পার্শ্বের নিম্নবিত্ত জনসাধারণ এবং বিত্তহীনদের জন্য 'রাজধানী সুপার মল' প্রতিষ্ঠা করা।

পরবর্তিতে ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় একে 'গরিবের জন্য একমাত্র সুপার মল' আখ্যা দেয়। সংসদ সদস্য থাকাকালীন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, মন্ত্রীর পদমর্যাদায় হজ্ব ডেলিগেশনের নেতৃত্ব দিয়ে সৌদি সরকারের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, অনুমিত হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং বিদ্যুত-জ্বালানী ও সড়ক শাসন- যানবাহন সংক্রান্ত সাব কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অস্ট্রেলিয়ার স্যার স্টিফেন নিনিয়ানের সভাপতিত্বে আয়োজিত সরকার ও বিরোধী দলের সংলাপে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখে প্রশংসিত হন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও ইংরেজ আমল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর গবেষণা এবং একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব ছাড়াও তাঁর নির্বাচনী এলাকা ১৮৮ ঢাকা-১৫ (কাফরুল থানা এবং মিরপুর থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড) এর এলাকাবাসীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক সংযোগ রক্ষা করে চলছেন।

# মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সেক্টর কমান্ডার
এম হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা- চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

# মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সেক্টর কমান্ডার
এম হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১২

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
আজিজুর রহমান তালুকদার
মোবাইলঃ ০১৭২০-৯৮৫৩১৮

মূল্য ঃ ২৫০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
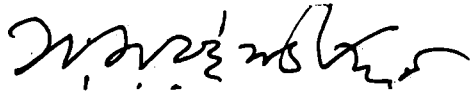
---

**Muktijudder Eteehas** by: M. Hamidullah Khan Birprotik, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. **Price: Tk. 250/- U$: 7/-**
**ISBN -984-70241-0034-4**

www.amarboi.org

# প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা অর্জনের চল্লিশ বছরে পা দিয়েছে। স্বাধিকারের আন্দোলন, ভাষাআন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন মাতৃভূমির অভ্যুদয় একটি বিশাল ইতিহাস পরিক্রমা। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণের নির্ভুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা একটি দুরুহ্ সাধনার বিষয় বৈকি। তবু সেক্টর কমান্ডার এম.হামিদুল্লাহ্ খান বীর প্রতীক বিজয়ের গৌরব দিপ্ত অহঙ্কার বুকে ধারণ করে **"মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস,** (৮নং থিয়েটার রোড কলিকাতা)" নামে একটি গ্রন্থ্ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানে জেড ফোর্সের প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিষদ বিবরণ অত্যন্ত সাবলিল ও সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, সত্য প্রচারের এটাই সঠিক সময়। সেই সময়ের কথা ভেবে মিথ্যাচারের খোলসকে খুলে ফেলে আসল ঘটনাগুলোকে সোজাসুজি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রনাঙ্গনের সংগ্রামের মূল উপাদান ও তথ্যাদি যথা সম্ভব নির্ভুলভাবে, সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং সময় ও ঘটনার পারম্পর্য অক্ষুন্ন রেখে উপস্থাপন করাই এই গ্রন্থের প্রয়াস।

সেক্টর কামান্ডার এম হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক রচিত **"মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস,** (৮নং থিয়েটার রোড কলিকাতা)" গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ গৌরব বোধ করছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের তথ্য বহুল সঠিক ও নির্ভুল গ্রন্থখানি এদেশের মুক্তিকামি মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি গ্রন্থখানি সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হবে।

**(এস. এম. রইসউদ্দিন)**
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

# মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন

## লেখকের কথা

এই বইটি মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বে রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনী, এফএফ, এমএফ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরের সহায়ক বাহিনীর যুদ্ধ এবং যুদ্ধ ময়দানে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব, বিভিন্ন সেক্টরে ও জেড ফোর্সের লড়াই নিয়ে লেখা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে জাতি যখন রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্য, দিশেহারা তখন জিয়াউর রহমান তাঁর ৮ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন নিয়ে ৫ ডিভিশন পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ শুরু করেন। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের সকল ক্যান্টনমেন্ট, সেনা ছাউনি, ইপিআর, পুলিশ এবং সর্বস্তরের ছাত্র যুবক জনতার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরের দিন আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকজন রাজনীতিকের অনুনয়ের কারণে তাঁর পূর্ব রাতের ঘোষণার সাথে 'শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে' পংক্তিটি যোগ করে দেন। আগেই বলেছি ২৫ রাতে বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ২৭ মার্চ '৭১ থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি পরিবর্তিত আকারে চট্টগ্রামস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের (কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র) মাধ্যমে দুই দিনেরও অধিক সময় ব্যাপী প্রচারিত হতে থাকে।

বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা অর্জনের চল্লিশ বছরে পা' দিয়েছে। স্বাধীকারের আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন মাতৃভূমির অভ্যুদয় একটি বিশাল ইতিহাস পরিক্রমা। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণের নির্ভুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা একটি দুরূহ সাধনার বিষয় বৈ কি। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার স্বাধীনতা আমরা হারিয়েছি। সেটি এক দিনের চক্রান্তের কুফল নয়। চতুর ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ বেনিয়ারা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কুমতলবে প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগ এবং একই সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৬৮৬ সালে ততদিনে অর্ন্তকোন্দলে লিপ্ত অকর্মন্য ও দুর্বল দিল্লীর মোগলদের অপেক্ষায় না থেকে হুগলীর মোগল শাসনকর্তা অক্টোবর মাসে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করেন। ইংরেজ সরকারের এজেন্ট, জব চার্ণক তাদের ঘাঁটি হুগলী থেকে স্থানান্তর করে হিজলীতে (বর্তমান কলকাতার অংশ) স্থাপন করে। ১৬৯৬ সালে সুতানটির স্থানীয় রাজা শোভা সিং মোগল শাসনের বিরুদ্ধে ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে বন্ধুত্ব করে কলকাতার দুর্গের নাম ইংরেজ রাজার নামানুসারে 'ফোর্ট



www.amarboi.org

উইলিয়াম' রাখে। দুর্বল মোগল সম্রাট ফারুক শাহরিয়ার বেনিয়াদের সাথে একটি অসম চুক্তি করেন। ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল নবাব আলি ওয়ার্দী খানের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোহন করেন। সিরাজউদ্দৌলা মসনদে বসার সাথে সাথেই লর্ড ক্লাইভ ত্বড়িৎ গতিতে সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সমূহ বেগবান করে। ধূর্ত ক্লাইভ উচ্চ বর্ণের বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর হিন্দুদের সক্রিয়, স্বতস্ফূর্ত সমর্থন এবং বিশ্বাসঘাতক মুসলমান নবাব/জমিদারদের সায় ইংরেজদের অনুকূলে নিতে সমর্থ হয়। ঢাকার দিওয়ান রাজবল্লভ এর পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে কলকাতায় ক্লাইভের আশ্রয়ে চলে আসে। এসব কর্মকান্ডে ক্রুদ্ধ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করলে উমিচাঁদ, নবকিষেন, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মানিকচাঁদ, অমর চাঁদ, শওকত জং, মীর জাফর গং নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি শত্রুতা শুরু করে। মীর মর্দান, মোহনলাল পক্ষে থাকলেও বহুমুখি ষড়যন্ত্রের ফলে অচিরেই সিরাজউদ্দৌলা পাতানো যুদ্ধে নিহত হন। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু তথা কামার, কুমার, মুচি, ধোবা, নাপিত ইত্যাদি দরিদ্র অস্পৃশ্য দলিত জনগোষ্ঠি প্রায় দুই শত বছরের অধিক কালের জন্য অত্যাচারী ইংরেজ বেনিয়া এবং তাদের বশংবদ উচ্চ বর্ণের বিত্তবান হিন্দুদের করায়ত্ব হয়। ১৭৬০ সাল থেকে বাংলার মুসলমানগণ হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ চালাতে থাকে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের জন্য প্রথম বিজয় বলে গন্য করা যায়। কিন্তু আবারও কলকাতার আর্ম-চেয়ার হিন্দু রাজনীতিক/জমিদার/ বিত্তবান মুসলিম বিদ্বেষী তথাকথিত উচ্চবর্ণ শ্রেণীগোষ্ঠীর বঙ্গভঙ্গ বিরোধি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে এ বিজয় বেশিদিন ধরে রাখা যায় নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে উপমহাদেশটি বিভক্ত হয়। এতেও বাঙ্গালীর স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়নি। পূর্ব পাকিস্তান- পশ্চিম পাকিস্তানের জন সংখ্যার অনুপাত ৫৬%: ৪৪% হলেও পূর্ব পাকিস্তান সার্বিক সুযোগ-সম্পদের কোন ক্ষেত্রেই অনুমানিক ২৫%-৩০% এর বেশি পায় নাই। এ ছাড়াও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সামরিক-বেসামরিক আমলাদের সিংহভাগ উর্দূভাষী/পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়ার দরুণ তারা পদে পদে পূর্ব পাকিস্তানী বাংলাভাষী জনগণকে অবজ্ঞা করাটাই সঙ্গত জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পার্টনারের মর্যাদা না দিয়ে বরং কলোনি ভাবতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করেছিল। সুতরাং আন্দোলন, সংগ্রাম এবং শেষ অবধি মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের বিকল্প ছিলনা। ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেল কিন্তু একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের আগ্রাসী তাড়া থেকে বুঝি আমরা আজও



www.amarboi.org

মুক্তি পেলাম না! আগে যেমন পাকিস্তানীরা আমাদেরকে কলোনি ভাবত এখন ভারত বাসী আমাদেরকে তাদের একটা প্রদেশ ভাবা শুরু করেছে। সম্প্রতি নেদারল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ উইলহেম ভ্যান সেন্ড্‌ল ইংরেজি দৈনিক 'নিউ এজ' এর সাপ্তাহিক প্রকাশনা 'এক্সট্রা' র জানুয়ারী ২০১১ এর প্রথম সপ্তাহের সংখ্যায় এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "ভারতীয়রা বাংলাদেশকে তাদের একটি প্রদেশ মনে করে। ভারতীয়রা প্রায়ই বাংলাদেশের আলাদা রাষ্ট্রীয় পরিচয় সম্পর্কে ভুলে যায়। তারা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় যেন বাংলাদেশ ভারতের একটি প্রদেশ।" বর্তমানে তাদের উগ্র স্বদেশী এবং রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বকামী (Chauvinist & hegemonic) চেহারাটা কোন রাখ ঢাক ছাড়াই বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিতে কোনো কসুর করছে না। তাদের দাবিগুলি একরকম গায়ের জোরেই আদায় করে নিচ্ছে। আমরা বাংলার আপামর জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধ করে পাকিস্তানী শৌভিনিস্টদের বিতারিত করেছি তাদের কাছে এই নতুন কর্তার উপস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

এ অবস্থাটি আমদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও আমরা টের পেয়েছি। তবে বিগত ২০ ডিসেম্বর ২০১০ইং সোমবার বিকেলে বেইজিং এর গ্রেট হলে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চীনের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ঝি ঝিংপিন এর সাথে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ঝি ঝিংপিন চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারে খালেদা জিয়ার অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, চীনের ক্ষমতাসীন সিপিসি, চীন সরকার ও তাদের দেশের জনগণ খালেদা জিয়াকে তাদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও বিশস্ত বন্ধু মনে করে। চীন সরকার ও চীন কম্যুনিস্ট পার্টির নিমন্ত্রণে খালেদা জিয়া সপ্তম বারের মত চীন সফর করেন। ঝি ঝিংপিন আসছে নির্বাচনে চীনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত ৫ জানুয়ারী বুধবার চীনের রাষ্ট্রদূত জ্যাং জিয়ানি রাজধানীর বারিধারায় চীনা রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে সন্ধ্যা ৭ টায় বেগম খালেদা জিয়ার সন্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করেণ। ভোজ সভায় চীনা রাস্ট্রদূত দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য বেগম জিয়াকে ধন্যবাদ জানান। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিতে আমরা ঘোর অমানিশার অন্ধকারের প্রান্ত সীমায় একটা শক্তিশালী আলোর রেখার আভাষ পাচ্ছি। আপাতত এ প্রসঙ্গে যতি টেনে মূল বর্ণনায় ফিরে যাই।



www.amarboi.org

১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই '৭১ পর্যন্ত ৮নং থিয়েটার রোডে যে নীতিনির্ধারণী সম্মেলন হয় সেখনে প্রশ্ন ওঠে যেহেতু আমাদের সহযোগী মিত্র বাহিনীর কমান্ডার ১ জন ব্রিগেডিয়ার ছাড়া বাকি ৯ জনই মেজর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার সেখানে আমাদের সর্বাধিনায়কের পদবি এই সম্মেলন থেকেই পূর্ণ জেনারেলে উন্নীত করার কথা ভাবেন। কিন্তু সূক্ষ্ম নীতিবোধ সম্পন্ন কর্ণেল ওসমানী এ প্রশ্নে নিজেই বাদ সাধলেন। তিনি বললেন, একটি স্বীকৃত সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের উপরে কোন পদবির স্থান নাই।

বঙ্গবীর ওসমানীর এ বদান্যতাকে পরে বংলাদেশ সরকার মূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন দু'টিই করেছে। এ ছাড়া গং কমিটি প্রধান সাবেক উপ সেনাপতি নিজেই নিজেকে একটি (বীর যোদ্ধা ৩য় বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কর্ণেল শাফায়াত জামিলের ভাষায় 'খয়রাতি' বীর উত্তম) পদকে ভূষিত করেছে, যেখানে বঙ্গবীর সেটা গ্রহণের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেছেন। তাছাড়া সেনা প্রধান কর্ণেল এম.এ.রবও ঐ পদক নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। কেননা বীরত্বসূচক পদক শুধু রণাঙ্গনের যোদ্ধা এবং তাদের কমান্ডারগণ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। পৃথিবীর সমর নীতি নির্ধারণী এবং রুটিন কর্মকান্ডে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় স্টাফ প্রধানসহ কোন স্টাফ অফিসারদের জন্য এই পদক প্রযোজ্য নয়। যদিও কর্ণেল ওসমানী মোটামুটি প্রায় সব সেক্টরে একাধিকবার তদারকি সফরে যান।

এই বইটি যুদ্ধ কালীন সময়ে ৮ নং থিয়েটার রোডের নীতিনির্ধারণী প্রবাসী সরকারের তত্ত্বাবধায়নে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনার ছক এবং তদানুসারে রণাঙ্গনের কমান্ডারদের ২নং সেক্টরে মেজর খালেদ মোশারফের যুদ্ধ, ৯নং সেক্টরে মেজর জলিলের যুদ্ধ এবং মেজর জিয়াউর রহমানের কিছুদিনের জন্য ১নং সেক্টরের বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যুদ্ধ, পরে ১১ নম্বর সেক্টরের কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা-বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের যুদ্ধ এবং জেড ফোর্সের কমান্ডার হিসাবে জিয়াউর রহমানের ১১ নম্বর, ৫ নম্বর সেক্টর এবং ৪নম্বর সেক্টরের যুদ্ধের সকল স্তরের অফিসার, নিয়মিত সেনা, এফএফ, এমএফ, ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সুসংগঠিত মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক বাহিনীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। (২ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধের বিবরণ এ বইতে নাই)। এর থেকে দেখা যায় জিয়াউর রহমান ১ নং সেক্টর, ১১নং সেক্টর, ৪নং সেক্টর, ৫নং সেক্টর এবং জেড ফোর্স নিয়ে দেশের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তের প্রায় পুরো অঞ্চল ব্যাপী তাঁর বিশাল বাহিনী এবং ঐ বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এক দল চৌকশ রনমত্ত কমান্ডার ঐ সব



www.amarboi.org

যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঠিক তেমনি ভাবে বিডিএফ হেড কোয়ার্টারে একমাত্র বঙ্গবীর ওসমানী ছাড়া আর কেহই যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন নাই। ৯ নম্বর সেক্টরটির পুরোপুরিই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিল। ২৬ মার্চ থেকেই মেজর জলিল নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনে নিয়োজিত করেন। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত বরিশাল ও পটুয়াখালীকে তিনি মুক্তাঞ্চল হিসেবে রাখতে সক্ষম হন। ৭ এপ্রিল মেজর জলিল খুলনা রেডিও ষ্টেশন মুক্ত করতে অপারেশন চালান। ২১ এপ্রিল অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুন্দর বনের গোপন পথ ধরে ভারতে যান। ফিরে এসে ৯ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খুলনার টাকি থেকে পরিচালনা করতে থাকেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পর '১৮ ডিসেম্বর বরিশালে মেজর জলিলকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। স্বাধীনতার পরপর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সম্পদ ও পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে নিয়ে যেতে থাকে। যশোরে লুটের মাল বয়ে নেয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ীবহর কে বাধা দেয়ায় ৩১ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশের তল্পিবাহক সরকার মেজর জলিলকে গ্রেফতার এবং যশোর সেনানিবাস অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়িতে আটক করে রাখে । তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী। ১৯৭২ সালের ৭ জুলাই মেজর জলিল মুক্তি পান। তার যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা তার লিখিত 'সীমাহীন সমর' বইতে আছে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডারকে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে প্রভুদের হুকুমে খেতাব বঞ্চিত করা হয়।

এই বইয়ের ভুলভ্রান্তি অপূর্ণতা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার অনুরোধ রইল। বইটির প্রথম অংশে ভু-রাজনৈতিক সমস্যার কিঞ্চিত বর্ণনা রয়েছে। ভৌগলিক দিক থেকে আমরা ছোট বলে দাদাদের অযাচিত খবরদারি ও চাপ সইতে হয় সে ব্যাপারেও যৎসামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

বইটিতে 'জেড' ফোর্সের প্রথম বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের প্রথম কোম্পানী কমান্ডার ২ বার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, ৩য় বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন কমান্ডিং অফিসার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল শাফায়াত জামিল, দেশী বিদেশী সংবাদ মাধ্যম, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দলিল পত্র থেকে মূল্যবান তথ্য নিয়েছি সে জন্য তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। পরিশেষে এই বই রচনার সময় এর কারিগরি দিক, তথ্য উপাত্ত দিয়ে যারা সহায়তা করেছেন তাদের ঋণ শোধ করা আমার সাধ্যের বাইরে।

www.amarboi.org

NO 01/17/72 (NGO) 108 DEF/SECY-7th April, 1972 with a view to effectively participate in the proceedings of the Constituent Assembly as an MCA. General M.A.G Osmany. p.s.c MCA. resigned his appointment as C-in-C. Bangladesh Forces and his resignation having been accepted by the president, he vacated the temporary appointment of C-in-C. Bangladesh Forces with effect from 7th April 1972 (forenoon). Accordingly, he is reverted to the pension list from the same date No. 01-31-33/72-110(3) DEF/SECY-7th April 1972 with the vacation of the appointment of temporary C-in-C. Bangladesh Forces. The combined command of Bangladesh Forces has been abolished with effect from 7th April 1972 (forenoon) and replaced by three separate commands for the Bangladesh Army, Navy and Air Force with the following Acting Chiefs of staff with immediate effect and until further orders.

---

সূত্রঃ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ প্রণেতা- জনাব অলি আহাদ, প্রকাশকাল ১৯৮২ চতুর্থ সংস্করণঃ জুলাই ২০০২ প্রকাশকঃ খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার ঢাকা।



www.amarboi.org
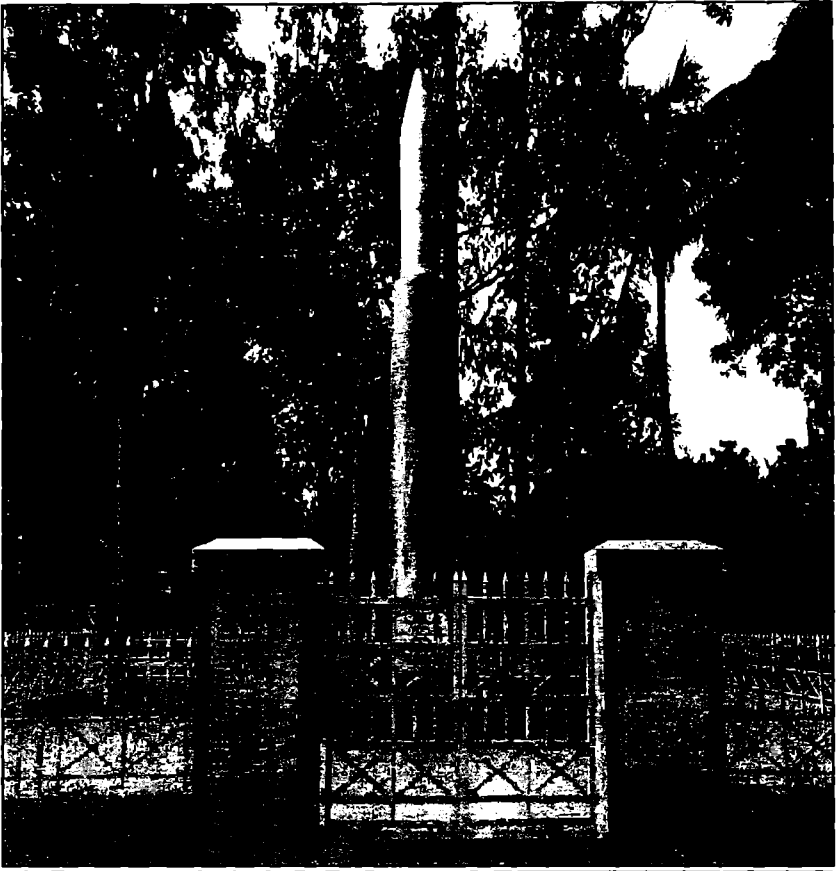
# যুদ্ধ স্তম্ভ

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম স্থান হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ভূমিতে জাতীয় উদ্যানের পশ্চিম দিকে উদ্যান থেকে ৩ কি:মি: দূরে অবস্থিত ওয়ার মেমোরিয়াল/যুদ্ধ স্তম্ভ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি সংরক্ষণ করে স্থাপিত হয়েছে মিনারটি। এখানে ৪ এপ্রিল' ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রান্ত অভিমুখী সামরিক অফিসারগণ মিলিত হয়ে বঙ্গবীর কর্ণেল এম এ জি ওসমানীকে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে ভূষিত করণ কল্পে একটি প্রস্তাব করেন তৎকালীন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী যাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মিনারের গায়ে এপিটাপ হিসাবে পাথরে খোদাই করা আছে কবি শামছুর রহমানের "স্বাধীনতা তুমি" কবিতাটি।



www.amarboi.org

বিগত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১০ইং বৃহস্পতিবার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্টার ফজলুর রহমান কর্তৃক প্রণীত নিবন্ধ **'যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিয়ে কালক্ষেপন ঠিক হবে না- বিচার দেখে যেতে চান বীর সেক্টর কমান্ডাররা"** শিরোনাম দিয়ে লেখাটিতে কিছু তথ্যগত ভুল লক্ষ্য করেছি। সেখানে লেখা হয়েছে যে, ৬ জন সেক্টর কমান্ডার জীবিত আছেন। সেই ৬ জনের মধ্যে এ কে খন্দকার এবং আবু ওসমান চৌধুরীর নাম দেওয়া হয়েছে। একে খন্দকার কশ্মিন কালেও সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না। তিনি ছিলেন থিয়েটার রোডের ক্রমানুসারে ৩ নম্বর অফিসার।

উপরোল্লেখিত ছবিতে সেটি স্পষ্ট করা হয়েছে। তিনি ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের তার নিঃসঙ্গ কামরাটি আর কল্যানীতে তার বাসাবাড়ি ছাড়া কোথায়ও যান নাই বললেই চলে। কোনো সেক্টরে কখনও গিয়েছেন বলে শোনা যায় নাই। আর সেক্টর কমান্ডারতো অনেক দূরের ব্যাপার। অবশ্য বিমান বাহিনীর কতিপয় বিমান চালক, পিআই এর ৩ জন আর ক্ষেত খামারে কীট-পতঙ্গ মারার একজন



www.amarboi.org

বিমান চালক মাঝে মধ্যে তাকে সঙ্গ দিত। তিনি তাদের সবাইকে বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক খেতাব দিয়ে ঋণ শোধ করেছেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ভারত ২৮ সেপ্টেম্বর '৭১ মেঘালয় রাজ্যের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় পি এস পি সীট (Perforaed Steel Sheet) দ্বারা নির্মিত একটি পরিত্যক্ত এয়ার স্ট্রিপ ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং মান্ধাতার আমলের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নির্মিত) একটি ডিসি-৩, একটি সিঙ্গল ইঞ্জিন অটার ও একটি অ্যালুয়েট কপ্টার মোট এই তিনটি অকেজো মেশিন দেয়। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতীয় শক্তিশালী বিমান আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর আকাশে ওঠার চেষ্টা চালায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশী দক্ষ টেকনিশিয়ান বিমান সেনারা অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ মেশিনগুলিকে মোটামুটি উড়াল যোগ্য করে তোলে। তবে কোনক্রমেই যুদ্ধযোগ্য নয়। ঐ সব মেশিনের নির্মাতারা এ গুলি নির্মানের সময় ঘুণাক্ষরেও এ সব দিয়ে যুদ্ধ করার কথা কল্পনা করেনি। তাছাড়া এসব মেশিন দিয়ে কোন সুস্থ মানুষ যুদ্ধ করার কথা ভাবতেও পারেনা। এত সব প্রতিকুলতার বিপরীতে বাংলাদেশের বিমান চালকগণের এবং বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ান বিমান সেনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সমূহ প্রশংসার দাবি রাখে।

আবু ওসমান চৌধুরীকে সেক্টর কমান্ডার ধরা হয়েছে। আবু ওসমান চৌধুরী, যশোরের এসডিও এবং এসপি যশোর ট্রেজারী, ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অর্থ লুট করে রেলের ওয়াগনে ভরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। সেই অর্থ প্রবাসী সরকারের তহবিলে জমা না দিয়ে মেজর আবু ওসমান কলকাতার উপকণ্ঠে তার ভাড়া বাড়ীর একটি কামড়ায় তালাবন্ধ করে রাখে। যে সব সৈনিকেরা ঐ অর্থ রেলের ওয়াগনে বহন করে এনে ভরেছিল তারা তাদের আহার ও বাসস্থানের জন্য কিছু অর্থ চাইলে মেজর আবু ওসমানের বেগম সাহেব তাদের কোন অর্থ না দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাড়িয়ে দেন। এটা জানাজানি হলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এম এ জি ওসমানী মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে ১লা জুলাই '৭১ এ তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করেন। দেড় মাস কাল ৮ নং সেক্টরটি কমান্ডার বিহীন ছিল। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা অফিসারদের মধ্য থেকে মেজর মঞ্জুরকে ১৫ আগষ্ট ৮ নং সেক্টরের কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয়। ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ সনে কর্ণেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকেরা "সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই, জেসিওর উপরে অফিসার নাই" এই স্লোগান দিয়ে ৭ নভেম্বর সকালে যে



www.amarboi.org

হত্যাযজ্ঞ চালায় তাতে কর্ণেল আবু ওসমান চৌধুরীর সহধর্মিনীই একমাত্র মহিলা যাকে ঐ সব বঞ্চিত সৈনিকেরা তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে হত্যা করে। ১ জুলাই '৭১ এ বরখাস্ত হওয়ার পরে আবু ওসমান চৌধুরীকে আর কোন ভাবে প্রবাসী সরকার পদায়ন করে নাই।

যুগান্তরের রিপোর্টারের কাছে বোধকরি সেক্টর কমান্ডারগণের সঠিক তালিকা নাই। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত **বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল পত্রে** ৬৪৪ পৃষ্ঠায় মেজর আবু তাহেরের ১০.০৬.১৯৭৫ এ প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি লিখেছেন- .... "তখন সময় সকাল ৯টা। গুলির আঘাতে আমি গুরুতররূপে আহত হই। আমার একটি পা' নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। .....বাংলাদেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি সেক্টরে ফিরে যেতে পারি নি। আমার অনুপস্থিতিতে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ সেক্টরের দায়িত্ব হাতে নেন।" ....মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি রচিত **"একটি ফুল কে বাঁচাবো বলে"** বইয়ের ৯৮ পৃষ্ঠায় পরিস্কার লেখা আছে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ নভেম্বরে মেজর আবু তাহের গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার পর এই সেক্টরের দায়িত্ব নেন।

আওয়ামী ঘরানার লেখক মূসা সাদিক রচিত **'মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম'** বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাতে লিখেছেন (১১ নং সেক্টর তুরা, ঃ ১ মেজর আবু তাহের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত ঃ ২ ফ্লাইট লেফ্টেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ্ ৩রা নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

এ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জীবিত সেক্টর কমান্ডারদের তালিকায় (মীর শওকতের জীবিতাবস্থায়) ৭ জনের মধ্যে ৫ নম্বরে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খানের নাম রহিয়াছে। ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনের সময় আই এস পি আর এর বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ভাবে সেক্টর কমান্ডারদের তালিকায়ও তাঁর নাম যথারীতি স্বীকৃত আছে।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২২ এবং ২৩ দুই দিনে জেড ফোর্স ৩য় বেঙ্গলের অধিনায়ক কর্ণেল সাফায়াত জামিল, জনকণ্ঠে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। নিবন্ধটি ছিল যুদ্ধ কালীন ফটো সাংবাদিক হারুন হাবিবের "জিয়া তাহের ও তারামন" শীর্ষক একটি নিবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ লেখা। সেখানে তিনি লিখেছেন "১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান ৪ মাসেরও অধিক সময়ে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তাহের ছিলেন ১ মাস ৪ দিন (সঠিক হিসেবে ১০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২৩ দিন হয়।) এম হামিদুল্লাহ খান



www.amarboi.org

ছিলেন ১ মাস ১৪ দিন।" আরো অনেক দলিল পত্র আছে সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করছি। তবে হামিদুল্লাহ খানের কমান্ডে ১১ নম্বর সেক্টরের ২২০০০ এর অধিক মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধশেষে প্রদত্ত সমস্ত সনদ পত্রে ডানদিকে কর্ণেল ওসমানীর স্বাক্ষর এবং বাঁ দিকে হামিদুল্লাহ খানের স্বাক্ষর রহিয়াছে।

www.amarboi.org
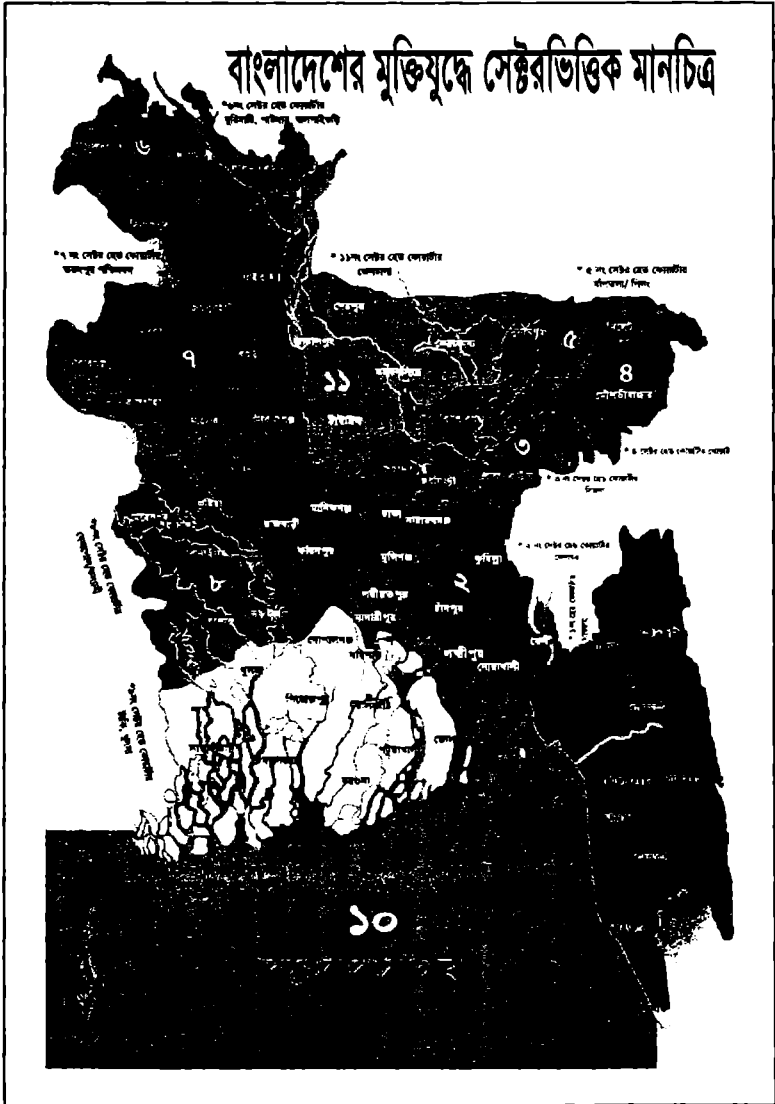
বস্তুত পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে যে সব সেক্টর কমান্ডার রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছেন তারা হলেন-

১। মেজর জিয়াউর রহমান ২। মেজর খালেদ মোশাররফ ৩। স্কোয়াড্রন লীডার এম হামিদুল্লাহ্ খান ৪। মেজর জলিল ৫। মেজর আবু তাহের। অন্য সেক্টর কমান্ডারদের যুদ্ধে অবদান সম্পর্কে কিছু বলা রুচিশুদ্ধ নয়।

বিগত ১৬ ডিসেম্বর ২০১০ এ প্রকাশিত আমাদের সময় দৈনিকের প্রথম পাতায় মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়ার লিখিত প্রবন্ধ 'স্বাধীনতার পর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গ্যাল্যান্ট্রী এ্যাওয়ার্ড বিতরণ নিয়ে বানরের পিঠা ভাগ হয়েছে- সফিউল্লাহ কোনো ফ্রন্টে যুদ্ধ না করেই পদক নিয়েছেন"। আমি এ কে খন্দকারের কথা বলেছি। কর্ণেল রব অসুস্থ থাকায় তিনি পদক বিতরণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এ সুযোগটি লুফে নিয়ে তিনি নিজেকে নিজে একটি বীর উত্তম পদক উপহার দেন এবং সর্বাধিনায়ক ওসমানী ও সেনাপ্রধান রবকেও ঐ পদক দিতে চান। তারা উভয়েই খন্দকার সাহেবের পদক হালাল করার মানষে করা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং বলেন- স্টাফ অফিসারগণ রণাঙ্গনে বীরত্ব সূচক পদক পেতে পারেন না। খন্দকার সাহেব মেজর তাহেরের অনুনয় বিনয়ে কাবু হয়ে তার ৪ ভাই যথা- আবু ইউসুফ, ওয়ারেসাত, বাহার ও বেলালকে পদক দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এই ৪ জন আমার সেক্টরে তাহেরের স্ত্রী, মা, ভাই-বোনদের সাথে বসবাস করেছে ঠিকই কিন্তু কোন যুদ্ধ মোটেও করেছে এমন রেকর্ড নাই। বস্তুতপক্ষে পদক বিতরণে সেক্টর কমান্ডারদের সাইটেশনের কোন মূল্যায়নই করা হয় নাই। তিনি শুধু তার নিজের এবং তার সঙ্গি ও অনুসারীদের পদক বিতরণে সমূহ ব্যস্ত ছিলেন। আর বিভিন্ন সেক্টরের যে মুষ্ঠিমেয় ক'জন পদক পেয়েছেন তা' তার স্বকপোলকল্পিত। ত না হলে বিশ্ময়কর চিলমারী অভিযানের যিনি নায়ক তাকে একটি বীর প্রতীক দিয়েই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। মেজর সফিউল্লাহ'র কথা বলা হয়েছে। মেজর সি আর দত্ত ২০০৯ সালে প্রেস ক্লাবে একটি গোল টেবিল বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেছেন, " কর্ণেল ওসমানী তাকে বলেছিলেন, দত্ত তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না তোমার কাজ এফএফ দের দিয়ে তুমি ডাউকি সড়কের পূর্ব পার্শ্বের চা বাগানগুলি থেকে পাকিস্তানীরা যাতে চা নিয়ে রপ্তানী করতে না পারে সেটা দেখা, তাই আমি সিলেটে অঞ্চলে না থেকে ত্রিপুরার খোয়াইতেই অবস্থান করেছি।"

মেজর জিয়া ২৫ মার্চ '৭১ এ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে প্রথম ১৫ দিন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তারপর ১ মাস ২০ দিন সাব্রুমে অবস্থিত ১নম্বর



www.amarboi.org

সেক্টর এরপর ১০ অক্টোবর '৭১ পর্যন্ত ১১ নম্বর সেক্টরে ৪ মাস যুদ্ধ করেছেন। জুলাই থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি যুগপৎ ভাবে জেড ফোর্স কমান্ডার ও ১১ নম্বর সেক্টর কামান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ১০ অক্টোবর তিনি তৃতীয় বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল শাফায়াত জামিল মারফত ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব মেজর তাহেরকে বুঝিয়ে দিয়ে সেক্টর হেডকোয়ার্টার তেলঢালা থেকে মহেন্দ্রগঞ্জে স্থানান্তর করেন এবং স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খানকে মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার সার্বিক দয়িত্ব দিয়ে যান। জিয়া ১০অক্টোবর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু জেড ফোর্স এবং সিলেটের বিপরীতে ভারতের মেঘালয় আসাম অক্ষে নিয়োজিত ৪ নং এবং ৫ নং সেক্টর এফ এফদের নিয়ে মিত্র বাহিনীর কয়েকটি ব্রিগেড সহ অনেক ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে যুদ্ধ করে যান। উপরের বাংলাদেশের সেক্টরভিত্তিক মানচিত্রে সেক্টর কমান্ডারগণের অবস্থান দায়িত্বকালের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

ক্র: নং- ১ **সেক্টর-১,** হেড কোয়ার্টার সাব্রুম ত্রিপুরা, সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান ১০ এপ্রিল থেকে ১০ জুন। ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ১০ এপ্রিল থেকে ১৬ডিসেম্বর।

ক্র: নং- ২ **সেক্টর-২,** হেড কোয়ার্টার মেলাঘর, আগরতলা, যুগপৎ ভাবে সেক্টর ও কে ফোর্স কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ

ক্র: নং- ৩ **সেক্টর-৩,** হেড কোয়ার্টার সিম্‌না, সেক্টর কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহ এপ্রিল থেকে মধ্য জুলাই পর্যন্ত এবং এস ফোর্স কমান্ডার ১৭ জুলাই থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেজর আনম নূরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডার ১৭ জুলাই থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ক্র: নং-৪ **সেক্টর-৪,** হেড কোয়ার্টার খোয়াই, ত্রিপুরা, সেক্টর কমান্ডার মেজর সি আর দত্ত এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ক্র: নং-৫ **সেক্টর-৫,** হেড কোয়ার্টার বাঁশতলা/শিলং, সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ক্র: নং-৬ **সেক্টর-১১,** হেড কোয়ার্টার তেলাঢালা, মেঘালয়, সেক্টর কমান্ডার এবং যুগপৎ ভাবে জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া ১০ জুন থেকে ১০অক্টোবর পর্যন্ত এবং শুধু জেড ফোর্স কমান্ডার ১০ অক্টোবর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত মেজর তাহের, ৩ নভেম্বর থেকে বিজয়ার্জন পর্যন্ত স্কোয়াড্রন লীডার এম হামিদুল্লাহ খান।


www.amarboi.org

ক্র: নং-৭ **সেক্টর-৬,** হেড কোয়ার্টার বুড়িমারী, পাটগ্রাম, সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার এম কে বাশার জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ক্র: নং-৮ **সেক্টর-৭,** হেড কোয়ার্টার তরঙ্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হক/ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল নূরুজ্জামান ।

ক্র: নং-৯ **সেক্টর-৮,** হেড কোয়ার্টার বেনাপোল/কল্যানী সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর। (জুলাই'র পূর্বে সেক্টর কমান্ডার ছিল মেজর ওসমান। তিনি অর্থ কেলেংকারীতে ১ জুলাই চাকুরীচ্যুত হন।)

ক্র: নং-১০ **সেক্টর-৯,** হেড কোয়ার্টার টাকি, খুলনা, সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ক্র: নং-১১ **সেক্টর-১০,** এই সেক্টরটি বঙ্গোপ সাগরে বিধায় এ সেক্টরটিকে সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এম এ জি ওসমানী নিজ কমান্ডে রাখেন। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী নৌ-কমান্ডো (ফ্রগম্যান) দের বিভিন্ন সেক্টরে সম্পৃক্ত করতেন।

সিলেট সীমান্ত যখন বিপজ্জনক ভাবে অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল ; মেজর মীর শওকত এবং মেজর সি আর দত্ত' র কাছ থেকে সেপ্টেম্ববরের শেষ সপ্তাহ থেকেই কর্ণেল ওসমানী ঘন ঘন আর্ত বার্তা পেয়ে সিলেটের নিকটবর্তী 'এস' এবং 'কে' ফোর্স কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন তারা তখনও তাদের ফোর্স গঠন করতেই পারেন নাই, ব্যাট্‌ল রেডি ত দূরের কথা। এমতবস্থায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত 'জেড' ফোর্সের উপর অশান্ত সিলেট সীমান্ত সামাল দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। জিয়া তাঁর বিশাল মুক্তাঞ্চল ছেড়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ময়মনসিংহ-ঢাকা রুটে সর্বাগ্রে ঢাকা যাওয়ার আশা ভঙ্গ হওয়ার আশংকাও আঁচ করতে পেরে তিনি খুশিমনে রাজি হন নাই। এমতাবস্থায় কর্ণেল ওসমানী স্বয়ং অক্টোবরের ৫ তারিখে তেলঢালা এসে হাজির হন এবং ১০ অক্টোবরের মধ্যে পুরো ব্রিগেড প্যাক আপ করে তৃতীয় বেঙ্গলের সিও মেজর শাফায়েত জামিল মারফত ১১ নম্বর সেক্টরের ভার মেজর তাহেরের হাতে ন্যস্ত করে মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এবং এর জন্য একটি সুসজ্জিত প্লাটুন আমার অধীনে দিয়ে ৫৯টি বড় বড় লরি এবং প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক বাহন, ভারি অস্ত্রবাহী যান ইত্যাদি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে জিয়া এবং ওসমানী সিলেটের উত্তপ্ত রণাঙ্গন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সিলেটের অসংখ্য যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের অনন্দ বেদনার অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে অবশেষে ১৫ ডিসেম্বর বিজয় উল্লাসে



www.amarboi.org

অবগাহন করে সবাই সিলেটের এম.সি. কলেজে পুনরায় একত্রিত হলেন। যুদ্ধের ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যে সব সতীর্থ ও বন্ধুদের হারিয়ে এলেন তাঁদের স্মৃতি মনকে আবার ভারাক্রান্ত করে তুল্ল। ঐ সব যুদ্ধের বিবরণ পরের অধ্যায় সমূহে দেওয়া হল।

আজ যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ শক্তি বলে আর্ত চিৎকার করছে তাদেরকে বলি, গায়ের জোরে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে বেশিক্ষণ আড়াল করা যায় না। স্বাধিকার আন্দোলনের অনলবর্ষী নেতা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অন্যতম নেতা মরহুম শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ৭ মার্চ ভাষণের পূর্বেই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আন্দোলনের সুফল নিয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণের যে আকাশচুম্বি প্রত্যাশা জন্মে গেছে তার সাথে ৬ দফার সম্ভাব্য প্রাপ্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতেও তা নগন্য। তাই ২৫ মার্চ পর্যন্ত যখন স্থূল গর্দান হামবড়া পাকিস্তানী শাসকদের বোধোদয় হল না তখন বিব্রত নেতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাঁর বিবেচনায় তাঁর প্রাণপ্রিয় নিরীহ দেশবাসীর জীবন রক্ষার তাগিদে নিজে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করলেন। নেতৃত্ববিহীন দেশের মহা শূন্যতায় জ্বলে উঠলেন মেজর জিয়াউর রহমান। ২৫ মার্চ ৮ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন নিয়ে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা, ৯ মাস প্রবাসী সরকারের রাজনৈতিক ব্যাবস্থাপনায় সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়। পরের ইতিহাস সবারই জানা। ২৫ মার্চ যে সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাড়ে সাত কোটি সরল প্রাণ দেশবাসীকে হিংস্র হায়েনার মুখে ফেলে নিজেদের প্রাণ রক্ষার তাগিদে প্রথমে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে পরে কলকাতা আর আগরতলায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং রণাঙ্গনে না গিয়ে প্রবাসে নিশ্চিন্ত আয়েসি জীবন কাটিয়েছে তারাই দেখ্ছি এখন সব ইয়া বড়া মুক্তিযোদ্ধা। তারা আদতে বাংলাদেশের শত্রু, তারা সব ভারতের দালাল। ১২০০ মাইল দূরের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রাণান্তকর, ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তানের দালাল হওয়ার কারো কোনো সুযোগ আছে কি? 'পাকিস্তানের দালাল' বুলিটি ভারতের দালালরা তাদের কুৎসিত দেশদ্রোহী চেহারাটা আড়াল করার উদ্দেশ্যে সারাক্ষণ আওড়াতে থাকে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার খাতিরে ভারতের নব্য দালালদের রুখে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি।

বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় (১লা ডিসেম্বর বুধবার) তার 'স্বায়ত্বশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার ডাক' শীর্ষক লেখাটি শুরু করেছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কেন পশ্চিম পাকিস্তানের উপর তিক্ত ও ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল এবং স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে



www.amarboi.org

সোচ্চার হয় তার কারণ দর্শিয়ে। তিনি লিখেছেন ' 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বছর না যেতেই রাজস্ব করের ভাগাভাগি, ভাষার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের কথাবার্তা ও আচরণে এক অসহ্য শ্রেয়ম্মন্যতা লক্ষ্য করে পূর্ববঙ্গের মানুষ তিক্ত হয়ে ওঠে এবং স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্যে সোচ্চার হয়।'
বিচারপতি হাবিবুর রহমান ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন। সেই টার্মেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। তিনি আওয়ামী ঘেঁষা বুদ্ধিজীবী হিসাবেই সমাজে সুপরিচিত। এই সত্য একটি পঙ্ক্তির কারণে তিনি ২/১ জন অতি আওয়ামী কলাম লেখকের রোষানলে পড়েছেন। xenophobia সমস্যাটা আমরা যারা পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলাম তাদের বেশিরভাগই কমবেশী টের পেয়েছি। যুদ্ধের সময় ওনাদের দাদাগিরি থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম না। এখন স্বাধীনতা লাভের পরও কি আমরা ঐ নূতন মুরুব্বিদের কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছি? আমরা যে বেড়াজালে আট্‌কা পড়েছি তা থেকে মুক্ত হতে স্বাধীনতাপ্রেমী দেশবাসীর সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন সমূহ দেখে আমাদের শংকিত না হয়ে উপায় নাই।

২৮ ডিসেম্বর ২০১০ দৈনিক নয়া দিগন্তের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা রালফ পিটারের 'এশিয়া ২০২৫' প্রতিবেদনে ২০১২ সালে পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনের আলোকে ভারতের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'আউটলুক' ম্যাগাজিনে ২০০০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হরিশ মেহতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত বিজয়ের তিনটি দৃশ্যপট নির্মাণ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ভারতের এ বিজয়ের মাধ্যমে 'ভারতমাতা'র রূপ পূর্ণাঙ্গতা পাবে বলেও বলা হয়। প্রথম দিকে এটিকে ভারতীয় প্রোপাগান্ডা বলে মনে হলেও সাম্প্রতিককালের ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির পর অনেকে এটি নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন।

রালফ পিটার তথা পেন্টাগন প্রণীত 'এশিয়া ২০২৫ পূর্ণাঙ্গরূপে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আউটলুক ছাড়াও ওয়াশিংটন পোস্ট (১৭ মার্চ ২০০০) ও সিঙ্গাপুরের প্রভাবশালী দৈনিক স্ট্রেইট টাইমসের ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ মন্তব্যধর্মী সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ ভারতের আউটলুক এই মহাপরিকল্পনা নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।


www.amarboi.org

ওয়াশিংটন পোস্টের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, "গত বছর গ্রীষ্মকালে পেন্টাগনের ঝানু ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা আন্দ্রে মার্শালের নেতৃত্বে রোড (Rhode) আইল্যান্ডের নৌবাহিনী কলেজে এক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আলোচনা পরে সহকারী প্রতিরক্ষা সচিবের গ্রীষ্মকালীন প্রতিবেদন 'এশিয়া ২০২৫' হিসেবে প্রণয়ন করা হয়।" স্ট্রেইট টাইমসের মতে, পেন্টাগনের কর্তাব্যক্তি মার্শাল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চীনকে সামনে রেখে এশিয়ার পাঁচটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দৃশ্য তুলে ধরেন। তার মধ্যে একটি চিত্র হতে পারে এ রকম- ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা মধ্যপ্রাচ্য ও ইন্দোনেশিয়ার জোগানদাতাদের শক্তিশালী করবে এবং ইরান, মধ্য এশিয়া, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ওপর বিশেষ দৃষ্টি পড়বে।

আমেরিকার শীর্ষ ১৫ নীতিনির্ধারকের অন্যতম র‍্যান্ড করপোরেশনের অ্যাশ্‌লে টেলিস ওই প্রতিবেদন সম্পর্কে আউটলুক কে বলেন, এগুলো হলো সুদূরপ্রসারী সমীক্ষা। এগুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতের বিকল্পগুলোর ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের চিন্তার খোরাক দেয়া।

ব্যাংককে একজন এশিয়ান কুটনীতিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণীতে ভারত প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে।

আউটলুটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তান ভাঙার কাজ শুরু হচ্ছে ২০১০ সালেই। 'এশিয়া ২০২৫'-এর বরাত দিয়ে আউটলুক লিখেছে, পাকিস্তান ২০১২ সালের দিকে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে এবং তার ভৌগলিক অখন্ডতা হারাবে। প্রতিবেদনের কিছু অংশ এ রকম- '২০১২ সালের দিকে পাকিস্তান পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে এবং ইসলামি উগ্রবাদীদের কাছে দেশটি তার নিয়ন্ত্রণ হারাবে আর উগ্রবাদীরা অনুপ্রবেশ করবে কাশ্মীরে। ভারত চাইবে পাকিস্তান তার ইসলামি জঙ্গিবাদীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করুক। পাকিস্তান তা করতে ব্যর্থ হলে ভারতীয় বাহিনী আজাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করবে। জবাবে পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের হুমকি দেবে। চীন পাকিস্তানের সাথে সুর মিলিয়ে নেপাল ও ভুটানের মাঝখানে তার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে ভারতের মিজোরাম-নাগাল্যান্ড-আসাম-সিকিম সীমানাকে হুমকিতে ফেলে দেবে। জবাবে যুক্তরাষ্ট্র সংযম প্রদর্শনের আহবান জানাবে এবং অন্যান্য উত্তপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে বঙ্গোপসাগরে নৌবাহিনী পাঠাবে এবং চীনকে হুশিয়ার করে দেবে। পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে এ ভয়ে ভারত



www.amarboi.org

পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর প্রচলিত অস্ত্র দিয়েই হামলা চালালেও তা তেমন-সফল হবে না। জবাবে পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীর ওপর মরিয়া হয়ে পরমাণু হামলা চালাবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অতিরঞ্জিত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি পূর্ণ মাপের পরমাণু শক্তির মোকাবেলাকে ত্বরান্বিত করা। যুক্তরাষ্ট্র বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে গভীর লক্ষ্যভেদী ওয়ারহেডের সাহায্যে পাকিস্তানের অবশিষ্ট পারমাণবিক শক্তিও ধ্বংস করে দেবে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মৈত্রীর বাস্তব অবস্থা দেখে চীন ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে পিছু হটবে। পাকিস্তানের ওপর আঘাত করেই যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। পাকিস্তানে সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে। ভারতীয় বাহিনী সেখানে শৃঙখলার জন্য ঢুকে পড়বে। দেশটি বিভাজিত হয়ে পড়লে পাকিস্তানের অঞ্চলগুলো ধীরে ধীরে ভারতে একীভূত হয়ে যাবে। সিন্ধু, বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশের পার্লামেন্ট ভারতের নেতৃত্বাধীন কনফেডারেশনে যোগদানের পক্ষে ভোট দেবে। ভারতীয় কনফেডারেশন তৈরি হওয়ার ফলে পাঞ্জাব একাকী টিকতে না পেরে একীভূত হয়ে যাবে এবং ভারতীয় পাঞ্জাবের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ পাঞ্জাব রাজ্য তৈরি করবে।

মজার ব্যাপার হলো, পাকিস্তান অখন্ডতা হারাবে বা আমেরিকা-ভারত যুদ্ধ করে পাকিস্তান দখল করবে, কিন্তু বাংলাদেশ কিভাবে ভারতের মানচিত্রের সাথে একীভূত হলো তা বলা হয়নি। কিন্তু প্রচ্ছদে দেখা যায়, বাংলাদেশও ভারতের সাথে একীভূত হচ্ছে। ধারণাটা এ রকম- পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তান একীভূত হলে বাংলাদেশ তো এমনিতেই চলে যাবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০ সালে পাকিস্তান ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা সম্পন্ন হবে ২০২১ সাল নাগাদ।

আউটলুকের ওই প্রতিবেদনে এশিয়াতে আরো কয়েকটি সম্ভাব্য দৃশ্যের অবতারণার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন প্রভাবশালী সাময়িকী মাসিক 'আটলান্টিক' সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় পাকিস্তানের ওপর পেন্টাগনের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা রবার্ট কাপলানের একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, 'পাকিস্তান সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার মতো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।' ১৮ নভেম্বর ২০০০ নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদভাষ্যে বলা হয়- 'সেই পাঁচ বছর আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পারভেজ মোশাররফ সরকারের সাথে পাকিস্তানের পরমাণু শক্তিকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে গোপনে সহযোগিতা করছে।'



www.amarboi.org

উল্লেখ্য, রবার্ট কাপলান হচ্ছেন বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর পেন্টাগনের অন্যতম পরামর্শক। কয়েক দিন আগে তার একটি বই প্রকাশিত হয়। আগামীতে ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্র কেমন হতে পারে তার একটি রূপরেখা দিয়েছেন তার এ বইয়ে।
'এশিয়া ২০২৫ পরিকল্পনা সম্পর্কে ইসলামাবাদ ভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের চেয়ারম্যান ও মুসলিম বিশ্বের অন্যতম চিন্তাবিদ অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ মাসিক তর্জুমানুল কুরআন পত্রিকায় লিখেছেন- 'আমরা পাকিস্তানের জনগণ ও মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত যে ষড়যন্ত্র করছে, তার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকতে আহবান জানাই। 'এশিয়া ২০২৫ ও এর সমগোত্রীয় ষড়যন্ত্রগুলো আমরা নিছক উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাই না।"
বিষয়টি নিয়ে ইন্টানেটে প্রোপাগান্ডাও চলছে বেশ জোরেশোরে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর সাবেক কর্তাব্যক্তিদের দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে নব্য গোয়েবলসীয় সংস্করণ 'স্যাগ'। এটি মূলত বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অখন্ডতার বিরুদ্ধে ইন্টারনেটভিত্তিক প্রোপাগান্ডা ফোরাম হিসেবে কাজ করছে। সেখানেও খোলা হয়েছেন নতুন ফ্রন্ট। সৈয়দ জামালউদ্দিন ওই ভিডিও ও বই প্রকাশ করেছেন। এর শিরোনাম: পাকিস্তানকে খন্ড বিখন্ড করে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসঙ্ঘের প্রতি আহবান। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ইন্টারনেটেও পাকিস্তানের যে ছিন্নভিন্ন মানচিত্র দেখানো হয়েছে, তার সাথে রালফ ও 'এশিয়া ২০২৫-এর অনেকটাই মিল রয়েছে।
সাম্প্রতিককালে কিছু ঘটনা প্রমাণ করে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আর জনগণকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। এক-এগারোর ঘটনা, রূপগঞ্জ, খালেদা জিয়ার বাড়ি নিয়ে বিরোধী দল বনাম সেনাবাহিনীর মধ্য মারমুখী অবস্থান কি আমাদের সেই অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে? এ প্রশ্ন করা হয়েছে এ-সংক্রান্ত একটি ব্লগে। তাৎপর্যের ব্যাপার হলো- অখন্ড ভারত- 'ভারতমাতা' গঠনের ডেটলাইন হচ্ছে ২০২৫ সাল। বাংলাদেশে ২০২১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কথা বলছে। ব্লগে একজন প্রশ্ন করেছেন- তাহলে ২০২১ আর ২০২৫ এর মধ্যে কী আছে। উপমহাদেশে কী হবে?
আউটলুকের ওই প্রতিবেদনে দ্বিতীয় আরেকটি বিকল্প রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তাতে 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' স্লোগানটি নতুন করে শোনানো হয়েছে। এ রূপরেখাটি ইন্দোনেশিয়াকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদ নিয়েই ভারত



www.amarboi.org

ও চীন মিলে ইন্দোনেশিয়াকে ভাগাভাগি করে নেবে বলে উল্লেখ করা হয়। তৃতীয় আরেকটি রূপরেখায় মিয়ানমারকে ভারত ও চীনের মধ্যে ভাগাভাগির কথা বলা হয়েছে।"

এই প্রতিবেদনটিতে আমেরিকার ইসলাম ভীতি আর ভারতের মুসলিম বিদ্বেষের জুজুর ভয় কাজ করেছে বলে মনে হয়। আমেরিকা-ইসরাইলি-ভারত লবি পাকিস্তানকে খন্ড খন্ড করার নানামুখি পদক্ষেপ নেওয়া তখন থেকেই শুরু করেছে। যুক্তরাস্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থা আইএমএফ বিগত বছরে পাকিস্তানকে ১১০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল কঠিন শর্ত বাস্তবায়নের অঙ্গিকারের ভিত্তিতে। এখন পাকিস্তান সরকার দেশের অস্তিত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও ব্যাপক ভাবে বিক্রয় কর আরেপ করা থেকে সরে আসায় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে শেখ হাসিনার ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার অভিলাষ, ডঃ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা ও বিষোদ্গার, টিআইবি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা বিলোপের পাঁয়তারা, সংসদ ও উচ্চ আদালতের মুখোমুখি অবস্থান ৯৬'র মত শেয়ার বাজারে ধস, বাজিকরদের হাতে দেশ, সিন্ডিকেটের কবলে বাজার, বিনা টেন্ডারে বিদ্যুৎ খাত ছেড়ে দিয়ে আবার তা' নিস্কন্টক করার জন্য পার্লামেন্টে ইনডেমনিটি বিল পাশ করানো ইত্যাদি ঐ সব মহা দুর্যোগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে না কি? ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির সময় কংগ্রেস নেতা সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল হুঙ্কার দিয়েছিল, বৃটিশদের হটাতে ভারত বিভক্তি মেনে নিয়েছি, তবে নিকট ভবিষ্যতে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় আমাদের ১০ মিনিটের অভিযানই যথেষ্ঠ।....বাংলাদেশের দেশ প্রেমিক প্রায় ১৬ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থেকে এই মহাবিপদ সংকেতকে মোকাবেলা করতে হবে।

অবশ্য ১৪/০১/২০১১ নয়া দিগন্তে প্রকাশিত ভারতের প্রখ্যাত লেখক/সাংবাদিক এম জে আকবরের 'টিন্ডারবক্স- দি পাস্ট এন্ড ফিউচার অব পাকিস্তান' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গত বুধবার ১২/০১/২০১১ তারিখে মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র নেতা ও ভারতের সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদভানী আবারো জিন্নাহকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করেছেন। (টিন্ডারবক্স শব্দটির আভিধানিক অর্থ, ভয়ংকর এবং নিয়ন্ত্রনের বাইরের মত অবস্থা যেখানে যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে) টিন্ডাবক্সের শাব্দিক অর্থ আগের দিনে আগুন জ্বালানোর জন্য বাক্স, চকমকির বাক্স।



www.amarboi.org

পাঁচ বছর আগে জিন্নাহর নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রশংসা করায় তোপের মুখে পড়েছিলেন আদভানী। বুধবার তিনি আগের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, জিন্নাহ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চেয়েছিলেন বলে যে মন্তব্য আমি করেছিলাম, তা ছিল আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন।

২০০৫ পাকিস্তান সফরকালে আগের সেই মন্তব্যের কারণে আদভানীকে বিজেডপ'র সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। আরএসএস এবং বিজেডপ'র বেশ ক'জন নেতা প্রকাশ্যে তার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তবে পরে আরএসএস ও বিজেডপ আদভানীর ব্যাপারে তাদের অবস্থান নমনীয় করে এবং ২০০৭ সালের নভেম্বরে তাকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার সময় তিনি আগের পদ লাভ করেন।

বুধবার আদভানি আবারো জিন্নাহকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে অভিহিত করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ও সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হককে দায়ী করেন ।

আকবরের গ্রন্থের মূল সুর অনুরণন করে আদভানি বলেন, পাকিস্তানের জাতির পিতা জিন্নাহ'র সন্তানরা গডফাদার মওদুদীর আদর্শিক উত্তরাধিকারদের পরাজিত করতে পারলে পাকিস্তান একটি স্থিতিশীল, আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে।

জাতীয় পরিষদে জিন্নাহর প্রথম ভাষণের কথা উল্লেখ করে আদভানি বলেন, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে জিন্নাহ চেয়েছিলেন পাকিস্তান একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোক। পাকিস্তানের অস্থিতিশীলতা ভারতের জন্য উদ্বেগের বিষয় বলে স্বীকার করেও আদভানি দেশটির ভেঙে পড়ার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন, পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে এটি মনে করা ঠিক নয়। দেশটি ধ্বংস হতে যাচ্ছে না ।

এম জে আকবর তার গ্রন্থে পাকিস্তানকে জেলি স্টেট হিসাবে অভিহিত করে বলেন, এটি স্থিতিশীল হবে না, ভেঙেও পড়বে না। আমাদের শঙ্কা পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে কি যাবে না সেটা পাকিস্তান ভালভাবেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। আমরা চিন্তিত, ভারতের যে চিন্তাধারা, অর্থাৎ পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে বাংলাদেশ এমনিতেই ভারতভুক্ত হয়ে যাবে সেটাকে রোধ করা।

শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সফর করে 'দি ইকনমিষ্টের' রিপোর্ট মতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য যে বস্তা বস্তা টাকা ও



www.amarboi.org

অঢেল পরামর্শ গ্রহণ করার ঋণ শোধ করে অর্ধ শতাধিক দফা সম্বলিত যে দাস চুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছেন তারই আলোকে ঃ

১. বাংলাদেশের সব সীমান্ত দিয়ে ভারতের পশ্চিম অংশ থেকে বিশেষ করে ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্ব ভারতের যে কোন গন্তব্যে নদীপথ, সড়ক পথ এবং চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে বিনা শুল্ক বা মাসুল এবং কোন রকম কাস্টম চেকিং ছাড়া সব ধরণের পণ্য বহনকারী যানবাহন চলাচল করিবে। আশুগঞ্জ থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন এর জন্য বাংলাদেশের অর্থায়নে ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। করিডোর দিলে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর এর মত বিত্তশালী হয়ে যাবে; সে ফানুস কবেই ফুটো হয়ে গেছে।

২. কানেকটিভিটির নামে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভারতের টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের মাটির নিচ দিয়ে ভারতীয় ফাইবার-অপটিক ক্যাবল স্থাপনের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

৩. অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে তিস্তার পানিবন্টন এবং ভারতকে করিডোর প্রদানের চুক্তি স্বাক্ষার করার জন্য ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী মনমোহন শিং বাংলাদেশ সফর করে এক মর্মন্তুদ নাটক করে গেলেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর যোগসাজসে তিস্তা চুক্তি ভেস্তে গেল আর ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় ভারত করিডোর নিয়ে গেল।

৪. এ সব কর্মকান্ড দেখে মনে হয় আমেরিকা-ইসরাইল-ভারত অক্ষের অভিন্ন লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়নে তারা একাত্ম। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের জানুয়ারীতে দিল্লী গিয়ে ভারতের সাথে যে ৫২ অথবা ৫৫ দফার দাস চুক্তি সই করে এসেছেন সেই চুক্তিগুলির বিবরণ ত দূরের কথা, সংখ্যাও দেশের মানুষকে জানতে দেওয়া হয় নাই। ভবিষ্যতেও যাতে মানুষ জানতে না পারে সে জন্য সংবিধানে নতুন বিধান করা হয়েছে। এমত অবস্থায় সিকিমের এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী লেন্দুপ দর্জির কর্মকান্ড স্মর্তব্য। সে পার্লামেন্টে পাস করেই দেশটিকে চিরদিনের জন্য ভারতভুক্ত করে দিয়েছিল।



www.amarboi.org

# যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'জেড ফোর্স' এর ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারবৃন্দ

লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমান
(জেড ফোর্স কমান্ডার)

মেজর আ জ ম আমিনুল হক
অধিনায়ক ৮ম বেঙ্গল

মেজর শাফায়াত জামিল
অধিনায়ক ৩য় বেঙ্গল

মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ
অধিনায়ক ১ম বেঙ্গল



www.amarboi.org

## ১১ নং সেক্টরের কমান্ডারবৃন্দের নাম ও ছবি

মেজর জিয়াউর রহমান
১১ নং সেক্টর এবং যুগপৎ ভাবে জেড ফোর্স ব্রিগেড কমান্ডার
১০ জুন থেকে ১০ অক্টোবর '৭১

মেজর আবু তাহের
১০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর '৭১
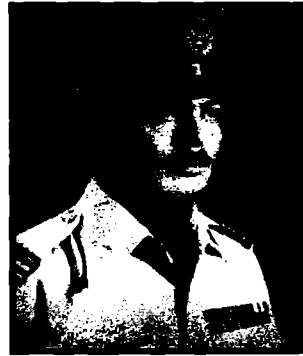
স্কোয়াড্রন লীডার এম. হামিদুল্লাহ খান
৩ নভেম্বর '৭১ থেকে বিজয়ার্জন পর্যন্ত



www.amarboi.org

## ১১ নম্বরের পাক চৌকি/মুক্তি বাহিনীর সাবসেক্টর সমূহের নামসহ অবস্থান

| ভারতীয় ভুখন্ডে সাবসেক্টর সদর দপ্তর | বিপরীতে অবস্থিত পাকিস্তানী চৌকি | সাব-সেক্টর কমান্ডারদের নাম |
|---|---|---|
| (ক) মানকাচর | বড়াইবাড়ী | স্কোয়াড্রন লীড়ার হামিদুল্লাহ্/ লেঃ আসাদ/ ইঞ্জিনীয়ার রহমতুল্লাহ |
| (খ) মহেন্দ্রগঞ্জ | কামালপুর | মেজর তাহের/লেঃ মান্নান |
| (গ) পুরকাসিয়া | তাই কচুয়া | লেঃ আসাদ |
| (ঘ) ডালু | চৌকিদার টিলা | লেঃ হাশমি/লেঃ তাহের |
| (ঙ) শিববাড়ি | ঘোষগাঁও | লেঃ শাহ আলম |
| (চ) বাগমারা | বিজয়পুর | লেঃ সৈয়দ কামালুদ্দিন |
| (ছ) রংড়া | লেঙ্গুরা | ক্যাঃ মতিউর রহমান/লেঃ মিজান |
| (জ) মহেশখোলা | অভ্যন্তরীন সাব সেক্টর | লেঃ মইনুল ইসলাম / ডাঃ মাহমুদ/জেসিও |



www.amarboi.org

# বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

এপ্রিল থেকে ৩ ডিসেম্বর, '৭১ পর্যন্ত মুক্তি বাহিনী বিরামহীন ভাবে গেরিলা যুদ্ধ করে পাকবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ন রূপে পর্যুদস্ত করে। এই মানচিত্রটি সেই ভাবেই কম্পোজ করা হয়েছে।৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত পাক ভারত যুদ্ধের মানচিত্র আলাদা ভাবে আছে। বিস্তারিত অপর পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হল।

১৯৭১

www.amarboi.org
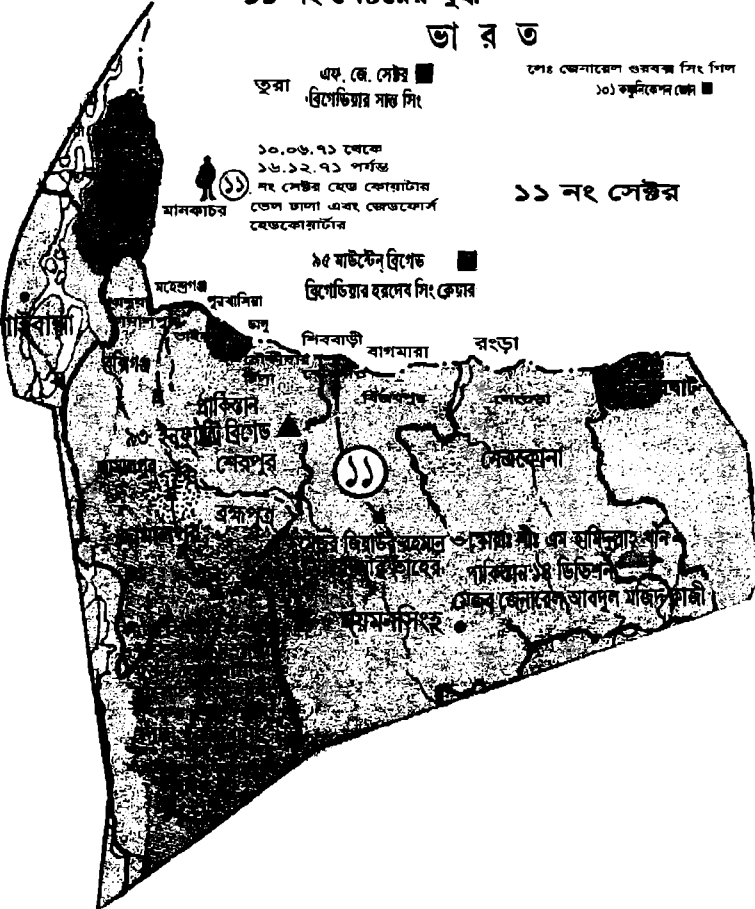
# জিয়াউর রহমানের ১১ নম্বর সেক্টর এবং 'জেড ফোর্স' গঠন ও যুদ্ধ সমূহের বিবরণ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড হচ্ছে 'জেড ফোর্স'। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেনানিবাসের বাইরে ষোলশহরে থাকায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জিয়াউর রহমান সম্যক অবহিত ছিলেন। সারাদেশ তখন বিদ্রোহের ক্রোধাগ্নিতে বিস্ফোরণ্ উন্মুখ ছিল। জনসাধারণের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার/সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, চাকুরিজীবী তথা সর্বস্তরের মানুষ এ সংগ্রামে স্বতঃস্ফুর্তভাবে শরীক ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রথম আঘাত সশস্ত্র সংগঠিত বাহিনীর উপর পড়বে একথা সর্বজনবিদিত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীকার আন্দোলন/সংগ্রামের নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মজিবর রহমান ২৫ মার্চ শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নেতাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজ সিদ্ধান্তে পাক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেলেন। বর্বর এবং হামবড়া পাক বাহিনীর বুলেটের শিকার হল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণসহ আপামর জনতা। সারা মার্চ ব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তানী পদস্থ সেনা অফিসারদের ঘন ঘন যাতায়াত এবং ফিসফাস কথাবার্তার প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে অবস্থিত বাঙালি সৈন্য ও অফিসারগণ নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে শুরু করেন। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর-উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়া ইবিআরসিতে (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার) কর্মরত কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে প্রথম বিদ্রোহের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বস্তুতপক্ষে কর্ণেল চৌধুরিই প্রথম বিদ্রোহের সংকল্প উচ্চারণ করেণ। অত্যধিক স্নায়বিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই ভয়াল রাতেই সি এম এইচ এ ভর্তি অবস্থায় তিনি প্রথম গুলির শিকার হন। ২৫ মার্চ রাতে ৮ ইস্ট বেঙ্গল এর সিও লেঃ কর্ণেল রশিদ জানজুয়া মেজর জিয়াউর রহমানকে নেভির একটি ডজ গাড়িতে একজন পাক নৌ অফিসার এবং ৮জন পাক নৌসেনা সাথে ৪ জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যসহ চট্টগ্রাম পোর্ট এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়। পথিমধ্যে শক্ত ব্যারিকেড থাকায় জিয়া যখন রাস্তার সোল্ডার ধরে পায়চারি করছিলেন তখন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান একটি ডজ নিয়ে তাঁর কাছে এসে জানালেন এরই মধ্যে পাক বাহিনী প্রায় ১০০০ এর মত ঘুমন্ত অবস্থায় বাঙালি



www.amarboi.org

রিক্রুট এবং সেনা হত্যা করে ফেলেছে। মেজর জিয়া ক্ষণিক চিন্তা করেই `we revolt' বাক্যটি উচ্চারণ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেণ। ২৬ মার্চ ভোরে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল পদবীর সশস্ত্র সৈনিক পটিয়ায় একত্রিত হন।

www.amarboi.org

মেজর জিয়া ৮ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন নিয়ে কালুরঘাটে অবস্থান নিলেন। এরই মধ্যে কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, রামগড়, বরকল ইত্যাদি সীমান্ত এলাকা থেকে আগত ইপিআর সৈনিকেরা কালুরঘাটে মেজর জিয়ার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা রাজনীতিবিদগণ স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর মেজর জিয়ার কাছে এসে ঘোষণায় শেখ মুজিবের নাম না থাকায় তাদের অসুবিধার ব্যাপারটি খুলে বলেন। জিয়া তাদের কে তাদের সুবিধামত একটি খসড়া আনতে বললেন। ২৭ মার্চ থেকে ২ দিন জনাব এ কে খান কর্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত সেই ঘোষণাটি প্রচার করা হয় যাতে মূল ঘোষণার সাথে 'শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে' লাইনটি যুক্ত করা হয় মাত্র। ২৫ মার্চ রাত্রিতে বিদ্রোহ ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ করে জিয়াউর রহমান ১৫ দিন পরে ত্রিপুরার সাব্রুমে তার ঘাঁটি স্থাপন করেন। তখন সেক্টর ছিল না তবে সেক্টরের আদলে একটি সংগঠিত গ্রুপ হিসেবে সাবরুম থেকে যুদ্ধ পরিচালনার কয়েকদিনের মধ্যেই একজন জুনিয়ার অফিসার এবং প্রবাসী সরকারের কতিপয় নেতার প্রচন্ড চাপের মুখে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এমএজি ওসমানী ১০ মে অর্থাৎ ঘাঁটি বিন্যাস প্রক্রিয়া সমাপ্তির অব্যবহিত পরই সাব্রুমস্থিত ১ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর জিয়াউর রহমানকে বদলি করেন। জিয়াউর রহমান তাৎক্ষণিক অনীহা কাটিয়ে তাঁর রেজিমেন্ট, যানবাহন, লোকবল, হাতিয়ার, গোলাবারুদ এবং যাবতীয় সাজ সরঞ্জামসহ তাঁর নতুন কর্মস্থল মেঘালয় রাজ্যের তুরা পাহাড়ের তেলঢালায় ১০ জুন ঘাঁটি স্থাপন করেন। এটি পরে ১১নম্বর সেক্টর হিসাবে পরিগণিত হয়। জুনের শেষার্ধে ৪টি সেক্টরের নামকরণ করা হয় যথা- ১নং সেক্টর সাব্রুম, ত্রিপুরা; ২নং সেক্টর, মেলাঘর, ত্রিপুরা; ৩নং সেক্টর সিমনা ত্রিপুরা, ও ৪নং সেক্টর খোয়াই, ত্রিপুরা । অল্প কিছুদিন পরে বাকি ৭টি সেক্টরের নাম স্থান নির্ধারণ করে সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরের আওতায় আনা হয়। বঙ্গপোসাগরে নির্ধারিত ১০নং সেক্টরটি যেহেতু বঙ্গোপসাগরে সে কারণে সর্বাধিনায়ক ঐ সেক্টরটি নিজের অধীনে রেখে নৌকমান্ডোদের প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন সেক্টরে ডিপ্লয় করেন। নৌ সেনারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিখুঁত ভাবে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে শত্রুর অসংখ্য জলযান ধ্বংস করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়কে তরান্বিত করেছে।

১৭ জুলাই জেড ফোর্স গঠনকল্পে ১ ও ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তেলঢালায় মুভ করা হয়। জেড ফোর্সের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সেক্টর বাহিনী, ইপিআর, আনসার এবং গেরিলাযোদ্ধাদেরকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাটালিয়ন ৩টি গড়ে তোলা হয়। এভাবে সেনাবহিনীর ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে



www.amarboi.org

১৭ জুলাই জেড ফোর্স গঠন প্রক্রিয়া ত্বরিত গতিতে শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নিয়মিত ব্রিগেডটির সংকেতিক নাম দেয়া হয় ১ আর্টিলারি ব্রিগেড। ব্রিগেড গঠনের পর জুলাই মাসেই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি হিসাবে সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়।

ব্রিগেডে নতুন সদস্য নিয়োগের পর এদেরকে প্রথাগত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ৪-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধ সমান তালে চলতে থাকে। ব্যাটালিয়ন ৩ টিকে সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রথাগত যুদ্ধের শিক্ষাও দেয়া হয়।

নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করার পর মেজর জিয়া যুগপৎভাবে ব্রিগেড কমান্ডার ও ১১ নং সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করে যান। তেলঢালা পৌঁছেই তিনি কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলার বিপরীতে ৮টি সাব সেক্টর গঠন করে পূর্ণোদ্যমে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন এবং রৌমারী-রাজীবপুরের প্রায় ৭০০ বর্গ মাইলের স্বাধীন ভূখন্ড গঠনের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল। এরই মধ্যে তিনি লেঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ এডজুটেন্ট ও কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন, ব্রিগেড সিগন্যাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম। ১ বেঙ্গল এর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর মঈনুল হোসেন। ৩১ জুলাই কামালপুর বি.ও.পি আক্রমণ বিপর্যয়ের পরে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানি মেজর মঈনুলকে 'এস' ফোর্সের অধীন ২বেঙ্গলে ফেরৎ পাঠান। কামালপুর বিওপি'র ব্যর্থ অভিযানে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ সহ মোট ২৮ জন বীর নিয়মিত সেনা শাহাদাৎ বরণ করেণ এবং ৬৬ জন আহত হন। এ যুদ্ধে কোন মুক্তিযোদ্ধা (এফ এফ) অংশ গ্রহণ করে নাই। মেজর জিয়াউদ্দিনকে ১ বেঙ্গলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার হন মেজর শাফায়াত জামিল এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল এর দায়িত্ব পান মেজর আমিনুল হক। এ ছাড়া ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারি, ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, লেফটেন্যান্ট আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মহসীন উদ্দিন আহমেদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, ক্যাপ্টেন মহসিন উদ্দিন, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট মোদাচ্ছের, লেফটেন্যান্ট মাহবুব-উল-আলমসহ আরও কয়েকজন অফিসার, জেসিও, এনসিও ও ট্রুপস্ এই ফোর্সে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে।



www.amarboi.org

অক্টোবর মাসে জেড ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত হয় ২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি (রওশন আরা ব্যাটারি) এবং একটি সিগন্যাল কোম্পানি। ক্যাপ্টেন খন্দকার আব্দুর রশীদ আর্টিলারি রেজিমেন্টের দায়িত্ব পান এবং সিগন্যাল কোম্পানির কমান্ডার হন ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম।

www.amarboi.org

১১ নম্বর সেক্টর এবং জেড ফোর্সের কমান্ড এরিয়া হিসেবে নির্ধারিত হয় রংপুরের গাইবান্ধা জেলা, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী, উলিপুর এবং প্রায় ৭০০ বর্গমাইলের রৌমারী - রাজিবপুর এই দু'টি উপজেলা এবং অন্যান্য দ্বীপাঞ্চল নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ মুক্তাঞ্চলসহ পুরো বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা। ব্রিগেড গঠনের পর ব্রিগেড কমান্ডার জিয়া তাঁর ৩টি ব্যাটালিয়নের এসিড টেস্ট হিসেবে ৩টি আক্রমণাভিযান পরিচালনা করেন। তার মধ্যে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কামালপুর বিওপি আক্রমণ ৩১ জুলাই, (যা সফলতা লাভ করে নাই।) ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নক্‌শি বিওপি আক্রমণ (এটিও বিফল হয়) এবং ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সীমান্ত হতে ২০/২৫ মাইল দেশের ভিতরে দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট এবং দেওয়নগঞ্জ সুগার মিল রেস্ট হাউজের পাক ঘাঁটি ধ্বংসের অভিযান। (অসম সাহসী বীর যোদ্ধা মেজর শফায়াত জামিলের এই আক্রমণ সম্পূর্ণ সফল হয়)। ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মেজর জিয়া এছাড়া জুন থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ১১ নম্বর সেক্টরের সমগ্র যুদ্ধ এলাকায় অসংখ্য দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে দেওয়ানগঞ্জ গরিলা অপারেশন, উলিপুর-কুড়িগ্রাম গেরিলা অভিযান (৩১ আগষ্ট), বক্‌শীগঞ্জে গেরিলা আক্রমণ (২১ সেপ্টেম্বর), কোদালকাটি প্রথম অপারেশন ৬ আগস্ট আংশিক সফলতা পায়। কোদালকাটি মুক্তকরণ ২য় অভিযান ২ অক্টোবর পূর্ণ সফলতা পেয়ে রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল থেকে পাক বাহিনীকে চিরতরে বিতারিত করা হয়। ফলে রৌমারী এবং রাজিবপুর উপজেলা দু'টির প্রায় ৭০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বাংলাদেশের বহু আকাঙ্খিত মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয় কৌশলগত দিক থেকেও এ মুক্তাঞ্চলটি ছিল শত্রুর জন্যও দুর্ভেদ্য। অন্য সবাই যেখানে সফল হতে পারে নাই ; বিদ্রোহ ঘোষণা, স্বাধীনতা ঘোষণার মত মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনিই একমাত্র সমরনায়ক যিনি জ্বলে উঠতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ বিজয়ের পরও তিনিই কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার থাকা কালীন প্রথম বিজয় শৌধ নির্মাণ করেন।

## 'জেড ফোর্স'- এর সাংগঠনিক কাঠামো

### ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আদি সিনিয়র মেজর জিয়াউদ্দীন আহমেদ কে ৩১ জুলাই কামালপুর পাক বিওপি বিপর্যয়ের পরে পহেলা জুলাই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এডজুটেন্ট ও কোয়ার্টার মাস্টার নিযুক্ত হন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খান



www.amarboi.org

| | | |
|---|---|---|
| 'এ' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান |
| 'বি' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ |
| 'সি' " " | : | ক্যাপ্টেন সালাহ্ উদ্দিন মমতাজ |

এছাড়া ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার, কোম্পানি অফিসার এবং প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমান এবং ওয়াকার হাসান বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন।

## ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

| | | |
|---|---|---|
| অধিনায়ক | : | মেজর শাফায়াত জামিল |
| উপ-অধিনায়ক | : | ক্যাপ্টেন মহসীন উদ্দিন আহমেদ |
| এ্যাডজুটেন্ট | : | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফুল আলম |
| মেডিক্যাল অফিসার | : | ডা. ওয়াছি উদ্দিন |

## ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানি ছিল-

| | | |
|---|---|---|
| 'এ' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন |
| 'বি' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন |
| 'সি' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন মহসীন উদ্দিন আহমেদ |

এছাড়া ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার, কোম্পানি অফিসার এবং প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ফজলে হোসেন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফুল আলম ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনজুর আহমদ বিভিন্ন যুদ্ধে পারদর্শিতা প্রদর্শণ করেন।

## ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

| | | |
|---|---|---|
| অধিনায়ক | : | মেজর আবু জাফর মোহাম্মদ আমিনুল হক |
| উপ-অধিনায়ক | : | ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী |
| রেজিমেন্টাল এম.ও. | : | ডা. বেলায়েত হোসেন |

## ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪টি কোম্পানি ছিল-

| | | |
|---|---|---|
| 'এ' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী |
| 'বি' কম্পানি কমান্ডার | : | ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন |
| 'সি' কম্পানি কমান্ডার | : | লেফটেন্যান্ট মোদাস্সের হোসেন |
| 'ডি' কম্পানি কমান্ডার | : | লেফটেন্যান্ট মাহবুবুর রহমান |

এছাড়া ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমাভার, কোম্পানি অফিসার এবং প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এমদাদুল হক, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মুনিবুর রহমান, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আবু বকর বিভিন্ন যুদ্ধে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন।



www.amarboi.org

## ২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি (রওশন আরা ব্যাটারি)

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ছয়টি ১০৫ এম এম গান (হাউইটজার) আসামের মাসিমপুরে অবস্থিত ভারতীয় 'ইকো' সেক্টর থেকে পাওয়া যায়। এ ছয়টি গান নিয়ে সিলেটের বিপরীত দিকে ভারতের কৈলাশ শহরে ২ ফিল্ড ব্যাটারি গঠন করা হয়। মেজর খন্দকার আব্দুর রশীদ এই ব্যাটারির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন এ এম রাশেদ চৌধুরী ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কাজী সাজ্জাদ আলী জহির এই ব্যাটারির অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই ব্যাটারিকে 'রওশন আরা ব্যাটারি' নামে ডাকা হতো। অক্টোবরের পর থেকে এ ব্যাটারি 'জেড ফোর্স' ব্রিগেডকে সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন যুদ্ধে ফায়ার কাভার এবং সাপোর্ট দিয়ে সহায়তা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সমরাস্ত্রসমূহ চা বাগানের ট্রাক্টরে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মুভ করা হতো।

## সিগন্যাল কোম্পানি

যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতা অনেকাংশে সঠিক সংকেতের ওপর নির্ভর করে। এটা বিবেচনা করে নিয়মিত ফোর্স গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই ফোর্সে একটি সিগন্যাল কোম্পানি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম সিগন্যাল কোম্পানি। প্রথমে সিগন্যাল কোম্পানি গঠন করতে সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ তখন কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির খুব অভাব ছিল। তাছাড়া প্রয়োজনীয় লোকবলেরও অভাব ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক রণক্ষেত্র থেকে অপরপ্রান্তে সংবাদ পৌঁছাতে গাড়ির অভাব ছিল। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সিগন্যাল কোম্পানি গঠন করা হয়। ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম এই কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অক্টোবর মাস থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ও ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সিগন্যাল কোম্পানি 'জেড ফোর্স'- এর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে সংকেত আদান প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। তার মধ্যে সিলেট জেলার বড়লেখা, ফুলতলা, আদমটিলা, বিয়ানীবাজার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## 'জেড ফোর্স;- এর সংক্ষিপ্ত কাঠামো ও যুদ্ধ এলাকা

১১ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা ৮ নং থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে সেক্টর কমান্ডার এবং যুদ্ধরত অন্যান্য কমান্ডারগণের সপ্তাহব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ বঙ্গবীর কর্ণেল এম.এ.জি



www.amarboi.org

ওসমানীর সাথে চিফ অব স্টাফ কর্ণেল এম.এ.রব এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকারও উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জুলাই '৭১ এর সম্মেলনে অন্যান্য যারা যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ: ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার- মেজর জিয়াউর রহমান জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ত্রিপুরার সাব্রুম। সেখান থেকে ১০ জুন' ৭১ তিনি কর্ণেল ওসমানীর আদেশে তেলঢালায় চলে যান এবং ১১নং সেক্টর গঠন করে এর অধিনায়ক হন।

১নং সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন মেজর রফিকুল ইসলাম।
২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার -- মেজর খালেদ মোশাররফ-- সেক্টর হেড কোয়ার্টার মেলাঘর, আগরতলা, ত্রিপুরা।
৩ নম্বর সেক্টর কমান্ডার -- মেজর কে.এম.শফিউল্লাহ -- সেক্টর হেড কোয়ার্টার, সিম্‌না, ত্রিপুরা
৪ নম্বর সেক্টর কমান্ডার -- মেজর সি.আর.দত্ত -- সেক্টর হেড কোয়ার্টার খোয়াই, ত্রিপুরা।

পরবর্তিতে অন্যান্য সেক্টরের পূণর্বিন্যাসকৃত বিভাজন পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।
ঐ সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল ফোর্স এবং সেক্টরসমূহ গঠন প্রক্রিয়া পূর্ণাঙ্গকরণ ও অনুসমর্থন সম্পর্কিত।
এই সম্মেলনের পরে জুলাই মাসে মেজর জিয়া যুগপৎভাবে জেড ফোর্সও গঠন করেন।
'এস' এবং 'কে' ফোর্স ব্রিগেড দুটি সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে গঠিত হয়, যদিও অনেকগুলো সেক্টর অফিসিয়ালি গঠিত হওয়ার আগে থেকেই সেক্টরের আদলে যুদ্ধ করছিল। যুদ্ধের শেষার্ধে পূর্বোক্ত তালিকার প্রায় আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে ফোর্স কমান্ডারগণও অন্তর্ভুক্ত হয়।
মেজর জিয়া তাঁর সমস্ত লোকবল, অস্ত্র, গোলা বারুদ, যানবাহনের বিশাল বহর নিয়ে দুর্গম মেঘালয় রাজ্যের তুরার সন্নিকটে গারো বাজার সংলগ্ন তেলঢালায় ঘাঁটি স্থাপন করেন।
মেজর জিয়াউর রহমান ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার এবং যুগপৎভাবে কমান্ডার, জেড ফোর্স ছিলেন। তিনি এপ্রিল থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার এবং বঙ্গবীর কর্ণেল ওসমানীর ১০ মে'র মৌখিক আদেশে জুন মাসেই উত্তর রণাঙ্গনের বিপরীতে মেঘালয় রাজ্যের দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় বিশাল ১১ নম্বর সেক্টর গঠন করে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডারের পদটিও নিজ হাতে রাখেন। মেজর জিয়া জেড ফোর্স নিয়ে সিলেট যাওয়ার প্রাক্কালে ৩বেঙ্গলের অধিনায়ক মেজর শাফায়েত জামিলের মাধ্যমে ১১ নং সেক্টরের



www.amarboi.org

কমান্ড মেজর তাহেরকে দিয়ে যান। সেক্টর হেড কোয়ার্টার তেলঢালা থেকে মহেন্দ্রগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হয়। হেডকোয়ার্টার চালাবার মত যানবাহন লোকবলও তাহেরকে দেওয়া হয়। মেজর তাহের সেক্টর কমান্ডার থাকাকালীন ১ নভেম্বর শেষ রাতে কামালপুর বিওপি'র উপর যৌথ বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর ২ নম্ভেবর সকাল ৯ টায় ঐ অভিযানের প্রায় সকল কোম্পানী কমান্ডারদের নিয়ে ডি-ব্রিফিং এর সময় মেজর আবু তাহের একটি এন্টি পারসোনেল মাইন বিস্ফোরণে একটি পা' হারান। ফলে তাকে তাৎক্ষণিক ভাবে তুরা এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পুনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি মোট ২২ দিন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ভারতের পুনা থেকে চিকিৎশা শেষে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন জানুয়ারী '৭২ এ। মেজর তাহের মেডিক্যালি বোর্ড আউট হওয়ার কারণে সেক্টরে যোগ দিতে পারেন নাই। স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খান ৩ নভেম্বর থেকে সেক্টর কমান্ডার হন এবং ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহে সেক্টর গুটানো পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন।

১৬ ডিসেম্বর '৭১ বিজয় অর্জনের পর অফিসিয়ালি ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহে অনেক কাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও সেক্টরগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। আমার সেক্টরে কম-বেশি ২২৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। এদের কাছ থেকে হাতিয়ার, গোলাবারুদ সংগ্রহ/উদ্ধার করা, এই বিশালসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় ভেরিফিকেশন এর পরে সার্টিফিকেট প্রদান করা, এদেরকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, শহীদদের নিকট আত্মীয়দেরকে নগণ্য হলেও যৎসামান্য কিছু সম্মানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি অসংখ্য দায়িত্ব অসম্পন্ন রেখেই সেক্টর গুটিয়ে ফেলা হয়।

## ১১নম্বর সেক্টর এবং জেড ফোর্সের সংক্ষিপ্ত কাঠামো ও যুদ্ধ এলাকা

পূর্বোল্লিখিত ১১ থেকে ১৭ জুলাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়াউর রহমান 'জেড ফোর্স' গঠন করেন। তিনি ১০ জুন '৭১ থেকে ১১ নম্বর সেক্টরাধীন কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর এলাকায় যুদ্ধরত থাকেন এবং একই সঙ্গে রৌমারী-রাজীবপুরের মুক্ত এলাকার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। ১০ অক্টোবর থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত জেড ফোর্স ৪ ও ৫ নং সেক্টর (সিলেট-সুনামগঞ্জ-মৌলভীবাজার) এলাকায় বিভিন্ন যুদ্ধে পরম পারদর্শিতা প্রদর্শন করে এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে পাকিস্তানী বাহিনীকে পদানত করে সিলেট মুক্ত করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। ১নম্বর, ১১নম্বর, ৪নম্বর ও ৫ নম্বর সেক্টর এলাকায় 'জেড ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ নিম্নরূপ- কুমিরার যুদ্ধ, কালুরঘাটের যুদ্ধ, পটিয়ার যুদ্ধ



www.amarboi.org

রামগড়ের যুদ্ধ, ছালিয়াপাড়ার ১ম ও ২য় যুদ্ধ কোদালকাটির ২টি যুদ্ধ, কামালপুর যুদ্ধ, নকশী বিওপি, বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশন, দেওয়ানগঞ্জ থানা এবং দেওয়ানগঞ্জ সুগারমিল রেস্টহাউজ পাক আর্মি ঘাঁটি আক্রমণ, হাজীপাড়ার যুদ্ধ, ছোটখেল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা, গোবিন্দগঞ্জ, লামাকাজি, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলই বিওপি, ধলই চা বাগান, ধামাই চা বাগান, জকিগঞ্জ, আলি মর্দান, এমসি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইঘাট, ফুলতলা চা বাগান, বড় লেখা, লাতু, সাগরনাল চা বাগান, ছাতক ও রাধানগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**জেড ফোর্স'- এর যুদ্ধ সমূহ (ক) 'জেড ফোর্স'-এর নিয়ন্ত্রণে রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল** (জুন-অক্টোবর '৭১)

রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী বন্দরের বিপরীতে অবস্থিত। এই মুক্তাঞ্চলের কিছু অংশ জামালপুর মহকুমার দেওয়ানগঞ্জ থানার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং ফুলছড়ি, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা, চিলমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বর ও ভূরুঙ্গামারী থানার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ থানার বাহাদুরাবাদঘাট সংলগ্ন সবুজপুর নৌকাঘাট থেকে উত্তরে ভূরুঙ্গামারীর পূর্বে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ৭০ মাইল এলাকা ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষস্থিত কয়েকশত চর নিয়ে এই অঞ্চলটি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকালীন বরাবরই স্বাধীন ছিল। পাকিস্তানিবাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত রাজীবপুর থানার কোদালকাটি চরটি ৪ আগস্ট ১৯৭১-এ সাময়িকভাবে দখল করে নিয়েছিল। এই চরটি ছাড়া দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল এলাকার চরাঞ্চলের আর কোন অবস্থানই তারা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। মুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণের মুখে ২ অক্টোবর দখলদার বাহিনী তাদের কোদালকাটি অবস্থানটিও ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে চিলমারী নদীবন্দর এলাকায় গিয়ে অবস্থান নিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসকালীন সময়ে আর কোথাও মুক্তাঞ্চল ছিল না। সেদিক থেকে একমাত্র মুক্ত স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে রৌমারীতে প্রচলিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশের প্রথম ক্যান্টনমেন্ট এবং দু'টি সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রৌমারী ও রাজীবপুরের মুক্ত মাটিতেই। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রায় ১৫০০ মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। রৌমারী মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষায় স্থানীয় ও উদ্বাস্তু চরবাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সত্যিকারের সিপাহি-জনতার যুদ্ধের মডেল ছিল। রৌমারী মুক্তাঞ্চলকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এন বি সি টেলিভিশন কর্তৃক



www.amarboi.org

নির্মিত 'দি কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার' এবং 'ডেট লাইন বাংলাদেশ' নামক প্রমাণ্য চিত্র দু'টি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

'জেড ফোর্স' অধিনায়ক মেজর জিয়ার নির্দেশে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রৌমারী কে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ধরে রাখতে এবং বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলকে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেণ। ১০ অক্টোবর থেকে এই মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব একক ভাবে অর্পিত হয় ১১ নং সেক্টরের মানকাচর এর তৎকালীন কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার এম হামিদুল্লাহ খানের উপর।

www.amarboi.org
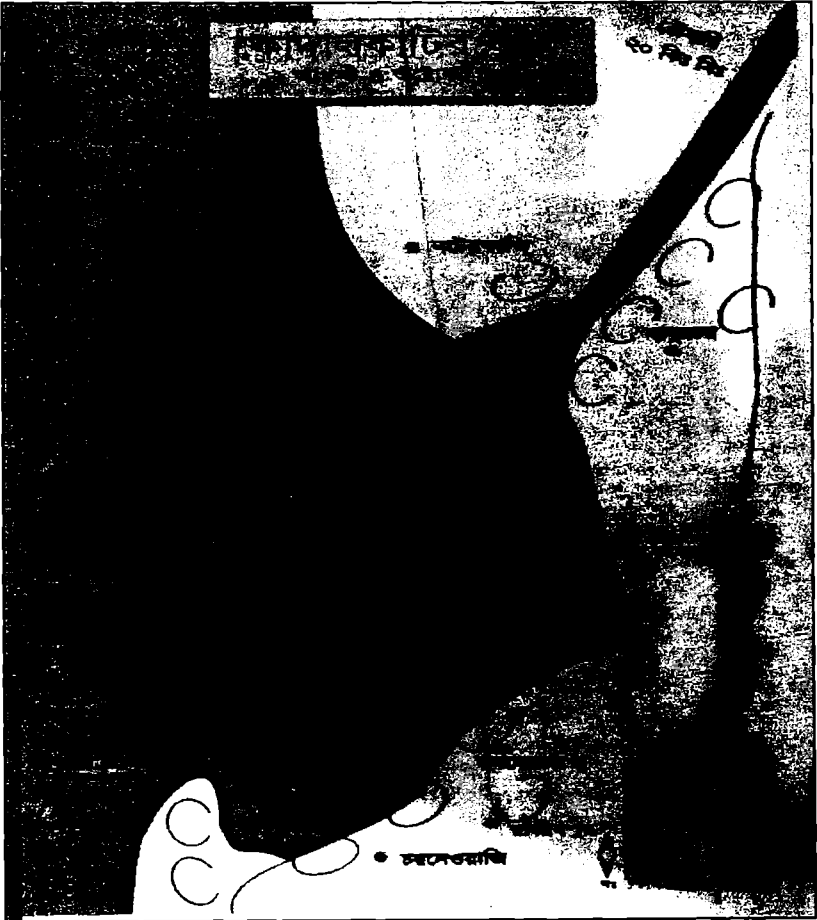
## রৌমারীর-রাজীবপুরের ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব

ভারতীয় সীমান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-প্রশাখা বিধৌত শত শত চর নিয়ে গঠিত আমাদের এই মুক্তাঞ্চল। মানকাচর/রৌমারী হয়েই বাংলার স্বাধীন সুবেদার মীর জুমলা আসামের বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মানকারচরে ছিল থানা হেডকোয়ার্টারের গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসীদের শতকরা ৮০ ভাগই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এই জেলাটিকে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অবৈধভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। এ নিয়ে তখন ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। ২০০১ সালে বরইবাড়িতে বিডিআর এবং বি এস এফ- এর মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল সেই বরইবাড়ি গ্রামটিও রৌমারীর বীর জনতা ভারত বিভাগের ৫০ বছর পরও নিজেদের দখলে রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত এই বরইবাড়ি বাংলাদেশের দখলে রয়েছে। বরইবড়ি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ মতে পূর্ব পাকিস্তানেরই অংশ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সড়কপথে যাতায়াত বিপজ্জনক হওয়ায় রাতের অন্ধকারে নদীপথে শত শত স্বাধীনতাকামী জনতা এবং উদ্বাস্তুগণ দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ভারতে আশ্রয় নিতে যাওয়ার পথেই তারা মুক্তাঞ্চলে থেকে যেত। ছাত্র ও যুবকেরা মুক্তিবাহিনীতে অংশ নিতে মুক্তাঞ্চলের ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিত। উদ্বাস্তুরাও ভারতে দুর্বিসহ জীবনের পরিবর্তে মুক্তাঞ্চলে বসতি স্থাপনে বেশি আগ্রহী ছিল। বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলের উৎপাদিত অর্থকরী ফসল ধান, পাট, মরিচ, সরিষা, আলু, গরু, মুরগী, ছাগল, ডিম, মাছসহ বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী মুক্তাঞ্চলের বাজারগুলোতে আসত একই ভাবে ভারত ও পাকিস্তান থেকেও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রি রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চলের হাট বাজারগুলিতে আসতে শুরু করে। মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে একটি বিনিময় বাণিজ্য কেন্দ্রে। এর ফলে শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশারও লাঘব হয়ে তারা সচ্ছল হয়ে ওঠে। হাজারো চোরাগোপ্তা নদীপথ হয়েই মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাগণ প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিস্তৃত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিদিনই শত শত মুক্তিবাহিনীর সদস্য এখানকার নদীপথ হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ত। আবার বক্ষপুত্রের শাখা নদী জিঞ্জিরাম হয়ে ভাতের ধুবরী, গোয়ালপাড়া অবধি যাতায়াত করত। নদীপথে বাহাদুরাবাদ ঘাট, ফুলছড়িঘাট, সিরাজগঞ্জঘাট, নগরবাড়িঘাট, আরিচাঘাট ও চিলমারী বন্দরের পাকিস্তানি অবস্থানগুলোতে পাহারারত সৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে নৌকাগুলি পূর্বপাকিস্তান- রৌমারী- মানকারচরে যাতায়াত করতো। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা



www.amarboi.org

এবং নদীর বুকে জেগে ওঠা বিভিন্ন চরের গাছ- গাছড়া ও কাশবন থাকায় আমাদের মুক্তিবাহিনীর নিরাপদে চলাফেরার জন্য খুবই উপযুক্ত ছিল। বর্ষার দিনে নদীপথের প্রশস্ততা বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হতো না। সামরিক দিক থেকে রৌমারীর চরাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর শক্ত অবস্থান থাকার অর্থই ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বাহাদুরাবাদঘাট, দেওয়ানগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ফুলছড়িঘাট, গাইবান্ধা, চিলমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম ও ভূরুঙ্গামারীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা।

সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বেই বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষে বৃহত্তর রংপুর জেলার (গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম-উলিপুর মহকুমা) এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিস্তৃত অঞ্চল (জামালপুর মহকুমা, শেরপুর মহকুমা, ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল জেলা ও নেত্রকোনা মহকুমা) নিয়ে গঠিত হয়েছিল ১১ নং সেক্টর। জুন মাসের ১০ থেকে মেজর জিয়াউর রহমান এই সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১০ অক্টোবর 'জেড ফোর্স' সিলেট অঞ্চলে মুভ না করা পর্যন্ত তিনি যুগপৎভাবে ১১নং সেক্টর কমান্ডার এবং জেড ফোর্স কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। মেজর জিয়াউর রহমান এই সেক্টরের কমান্ডার থাকাকালীন সময় থেকে মুক্তিবাহিনী নতুন উদ্যমে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। 'জেড ফোর্স' এবং ১১নম্বর সেক্টর কমান্ডারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মেজর জিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে ফেলেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় মাত্র এক মাসের ব্যবধানেই এই সেক্টরের অন্যুন ১৮,০০০ মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যেকেই পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানগুলোর ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রৌমারী-রাজীবপুরই ছিল একমাত্র ভুখন্ড, যা কোনদিনও পাকিস্তানি বাহিনী দখলে নিতে পারেনি। রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল পাকিস্তানি বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত থাকে। রৌমারী এবং রাজীবপুর প্রশাসনিক থানা, (দেওয়ানগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাঘাটা, গাইবান্ধা, সুন্দরগঞ্জ, চিলমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বর এবং ভুরুঙ্গামারী থানার অংশ বিশেষ নিয়ে) প্রায় ৭০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস শত্রুমুক্ত ছিল। এ কারণে মুক্তাঞ্চলটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ মূল্যায়নের দাবি রাখে।

রৌমারীর মুক্ত মাটিতে আমেরিকার এনবিসি টেলিভিশন টিম কর্তৃক গৃহীত রণাঙ্গনের ছবি, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, বিস্তৃত মুক্তাঞ্চলের স্বাভাবিক



www.amarboi.org

জীবনযাত্রা এবং বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার কার্যক্রম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বহির্বিশ্বে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। ক্যাপ্টেন রবার্ট রজার্সের নেতৃত্বে এন বি সি টেলিভিশন টিম কর্তৃক রৌমারীর মুক্ত মাটিতে ধারণকৃত 'A Country Made for Disaster' এবং 'Dateline Bangladesh' (এ কান্ট্রি মেড ফর ডিসাস্টার এবং ডেটলাইন বাংলাদেশ) নামের প্রামাণ্যচিত্র দুটি একাত্তরের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে প্রদর্শিত হয়েছিল।

## জেড ফোর্স এবং ১১নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার-তেলঢালা

আগেই বলা হয়েছে মেঘালয় রাজ্যের তুরার সন্নিকটে গারো পাহাড় সংলগ্ন তেলঢালার গভীর জঙ্গলে গারো বাজারের কাছে জুন মাসে গঠিত হয় ১১নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার। জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহে এখানেই স্থাপিত হয় বিডিএফ এর সর্বপ্রথম নিয়মিত ব্রিগেড। যশোহর রণাঙ্গন থেকে ১ ইস্ট বেঙ্গল, চট্টগ্রামের ৮ ইস্ট বেঙ্গল এবং দিনাজপুর রণাঙ্গন থেকে ৩ ইস্ট বেঙ্গল এই তিনটি রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয় প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড। প্রাথমিক অবস্থায় ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিল (ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক), ক্যাপ্টেন আনোয়ারের আলফা কোম্পানি ক্যাপ্টেন মহসীন এর ব্রাভো কোম্পানী ও ক্যাপ্টেন আকবরের চার্লি কোম্পানি এবং লেঃ নবি ৩য় বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে যোগ দিয়েছিলেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফও এই ব্যাটালিয়নে ছিলেন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ওয়াহেদ তেলঢালায় ব্যাটালিয়ন মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একমাত্র জীবিত অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজ তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে বনগাঁ বর্ডার এলাকা থেকে তেলঢালায় উপস্থিত হন। কয়েকদিন পরই এই বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। এছাড়া ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং লেফটেন্যান্ট মান্নান এই ব্যাটালিয়নে যোগ দেন।

৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল মেজর জিয়ার নিজস্ব ইউনিট এবং এই রেজিমেন্ট নিয়েই তিনি চট্টগ্রামে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সময় ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন মেজর আমিনুল হক (অধিনায়ক), ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী (উপ-অধিনায়ক), ক্যাপ্টেন সাদেক এবং ক্যাপ্টেন আমিন আহম্মেদ চৌধুরী। কিছুদিন পর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে লেফটেন্যান্ট মোদাচ্ছের হোসেন এবং লেফটেন্যান্ট এমদাদ ৮ ইস্ট বেঙ্গলে যোগদান করেন।



www.amarboi.org

জেড ফোর্স হেডকোয়ার্টারে মেজর জিয়া ছাড়াও ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (এডজুটেন্ট), ডা. হুমায়ুন হাই, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রউফ এবং ক্যাপ্টেন হালিম যোগ দিয়েছিলেন।

মেজর জিয়া তেলঢালায় তিনটি ব্যাটলিয়নকে (১, ৩, ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) এক মাসের মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের কাজ সেরে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্দেশ দেন। পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে এই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ দেড় মাসের ট্রেনিং শেষে তিনটি ব্যাটালিনকে এসিড টেস্ট হিসেবে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দুর্ধর্ষ অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। কামালপুর বিওপির পাকিস্তানি শক্ত ঘাঁটি দখল করার ভার ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর এবং নকশী বিওপির সীমান্ত ঘাঁটি দখল করার ভার ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর বর্তায়। ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে দেশের বিশ মাইল ভেতরে বেস্ বাহাদুরাবাদ ঘাট এবং দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল রেস্ট হাউজ পাক সেনা ঘাঁটি দখল করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

রৌমারী অভিযান তেলঢালায় জেড ফোর্সের অবস্থানের খবর পাকিস্তানিদের কাছে যথারীতি পৌঁছে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী রৌমারীর বিস্তৃত চরগুলো দখল করে নিতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি এবং সময় নির্ধারণের কৌশল গ্রহণ করে। যদিও সে প্রচেষ্টা চিলমারী রেইডের সমর কৌশলের মোকাবেলায় সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। তবে তারা আরিচা, নগরবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট ও চিলমারী বন্দরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে ফেলে। ৩১ জুলাই ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক যথাক্রমে পাকিস্তানি অবস্থান কামালপুর, নকশী ও বাহাদুরাবাদ ঘাট একত্রে আক্রমণ পরিচালনার পর ঐ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর শক্তি-সামর্থ নিয়ে পাকিস্তানিরা নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করে এবং এসব এলাকায় পর্যায়ক্রমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। তারই এক পর্যায়ে ৬ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে পাকিস্তানিরা গানবোটের সাহায্যে ব্যাপক আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করে কোদালকাটির একটি বিচ্ছিন্ন চর দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী কোদালকাটি অবস্থান ছেড়ে কর্তিমারীচর এলাকায় অবস্থান নেয়। সুবেদার আফতাব তেলঢালায় ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে সংবাদটি দেন। ক্যাপ্টেন আনোয়ার ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলকে অবহিত করলে তিনি জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়ার কার্যালয়ে পৌঁছেন। মেজর জিয়া ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের মাধ্যমে নৌবাহিনী সদস্য চীফ পেটি অফিসার কাজিউল ইসলামের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দখলকৃত ২টি লঞ্চ যোগে



www.amarboi.org

রৌমারী পৌঁছে যান। মেজর শাফায়াত জামিল মীর জুমলার মাজার এলাকায় রিয়ার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। সন্ধ্যার মধ্যেই কোদালকাটি চরের অবস্থানকে সামনে রেখে রৌমারী থানা হেডকোয়ার্টারে আসার জন্য সম্ভাব্য নদীপথ ও পায়ে হাঁটা সড়কগুলো অবরোধ করে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সুবেদার করম আলীর প্লাটুনকে হাজীরচর ও ঠাকুরের চরের সংযোগস্থলে সড়ক ও নদীপথ অবরোধের জন্য পাঠান হয়। সুবেদার বদীর প্লাটুনকে রৌমারী লঞ্চঘাট, বাজার এলাকা এবং টাপুরচরহাট পর্যন্ত প্যাট্রোলিং এ রাখা হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ বাঙ্কার তৈরির কাজে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেন। সুবেদার করম আলীকে তার দুটি সেকশন নিয়ে হাজীরচরে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। হাজীরচরটি ছিল রৌমারী প্রতিরক্ষার জন্য খুবই জরুরী কেননা হাজীরচরের পাশেই ছিল পাকিস্তানি সেনাদের কোদালকাটির অবস্থান। নায়েক ইব্রাহিমের সেকশনকে হাজীরচর ও ঠাকুরেরচরের মধ্যবর্তী নদীপথটি দুটি রকেট লাঞ্চার ও একটি মেশিনগানের সাহায্যে কভার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এদিকে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল স্বয়ং এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে রৌমারীতে অবস্থান নেন। এই প্লাটুনটি ছিল সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে। সুবেদার ওহাব তার প্লাটুন নিয়ে কর্তিমারীচরের হাজী আবুল হাশেমের বাড়িতে হেডকোয়ার্টার করে নদীর তীর ধরে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য হাজী হাশেম ছিলেন মুসলিম লীগের লোক এবং এক কালে পাকিস্তান জাতীয় সংসদে চীপ হুইপ ও মন্ত্রী। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান অনন্য প্রশংসার যোগ্য।

৩ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের ব্রেভ হার্ট অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল ১ আগস্ট '৭১ এ বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশনে গিয়ে ৩ দিন পর ফিরে এসে উদ্বিগ্ন ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমান বর্ডার সংলগ্ন হযরত শাহ কামালের মাজারের পাশে তোলা ছবি (লুঙ্গি পরা মেজর শাফায়াত জামিল)। মোট ৩টি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতে এই বিলম্ব হয়েছিল।



www.amarboi.org

৮ আগষ্ট ১৯৭১। ভোরের আগেই রাজীবপুর, কর্তিমারী, হাজীরচর, ঠাকুরেরচর, ফালুয়ারচর  হয়ে সুদূর ঘুঘুমারী পর্যন্ত রৌমারীর বিস্তৃত চরাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তরের কাজ শেষ করা হয়। সুবেদার আফতাবের রাজীবপুর অবস্থানকে ঢেলে সাজিয়ে আরো মজবুত করে তোলার জন্য মেজর শাফায়াত জামিল তাকে ডেকে এনে বুঝিয়ে দেন। এই অবস্থায় কোদালকাটি থেকে নদীপথে গানবোট নিয়ে পাকিস্তানিরা রৌমারী সদর লঞ্চঘাটে যাতে না আসতে পারে তার সব ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুবেদার আফতাবকে নির্দেশ দেয়া হয়। পর্যাপ্ত নৌকার সাহায্যে প্রতিটি অবস্থানের সঙ্গে স্থানীয় গাইডদের মাধ্যমে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক মেজর শাফায়েত জামিল মীরজুমলার মাজার থেকে সিগন্যালের বাকী দুইটি প্লাটুন সহকারে সরাসরি কর্তিমারী পৌঁছবেন। অপর সিগন্যাল সেটের মাধ্যমে সুবেদার আলী নেওয়াজ সার্বক্ষণিক বিস্তারিত সংবাদ অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলকে অবহিত করেন। অধিনায়ক নিশ্চয়তা দেন যে, যদি আজকের দিন পাকিস্তানিদের আক্রমণ ঠেকানো যায় তবে রৌমারী দখলের চিন্তা চিরতরে ওদের মন থেকে উঠে যাবে। এক অস্বস্তিকর অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছিল। বিকাল ৫টায় সময়েই মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত হয় যে পাকিস্তানি সেনাদের হামলার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

## প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুর্ণবিন্যাস

মেজর শাফায়াত জামিল ৮ আগস্ট রাত্রে নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ অবস্থানের উদ্দেশ্যে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সুবেদার বদিকে বাজার ও লঞ্চঘাট-এর পরবর্তে ঘুঘুমারী যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। সুবেদার আলী আকবরের অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে যমুনা নদীর মাঝামাঝি এলাকা পর্যন্ত প্যাট্রোলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর আমিনুল হক রৌমারী দেখতে এসে বিশ্মিত হন এবং বলেন ভারতের গারো পাহাড়ের পরিবর্তে রৌমারী এবং রাজীবপুরেই মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা সম্ভব ।

১০ আগস্ট '৭১ মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পয়েন্ট হাজীরচর ও ঠাকুরেরচরের প্রতিটি বাঙ্কারেই পানি ওঠায় সেখানে অবস্থান কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এ দিনও পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।



www.amarboi.org

## রৌমারীতে জেনারেল গুরবক্স সিংগিল ও জেড ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমানের পরিদর্শন ঃ

১১ আগস্ট ১৯৭১ রৌমারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কর্মকান্ড যথারীতি জেড ফোর্স কমান্ডার ও যুগপৎভাবে ১১ নং সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়ার নির্দেশনায় চলছিল। সমস্ত এলাকায় স্বাভাবিক জীবন যাপন বিরাজমান ছিল।

মিত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল জি. এস. গিল, জেড ফোর্স কমান্ডার কর্ণেল জিয়া এবং বিএসএফ-এর একজন মেজর হঠাৎ করে রৌমারী এসে উপস্থিত হন। হাজার হাজার ছাত্র-যুবক কে দেখে জেনারেল গিল বিস্মিত হন এবং এ সম্মন্ধে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সমস্ত ছাত্র-যুবকেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সাহসী এবং উদ্যোগি। তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাকুল। যদি প্রয়োজনীয় রাইফেল, গ্রেনেড, এ্যাম্যুনিশণ ও এক্সপ্লোসিভ-এর ব্যবস্থা করা যায় তবে রৌমারী-রাজীবপুর ট্রেনিং স্কুল দু'টিতেই তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরও সুবিন্যস্ত করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সকল আয়োজন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে জেনারেল গিল খুবই আনন্দিত হন এবং পুনরায় তার স্ত্রীকে নিয়ে রৌমারী আসবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করে বিদায় নেন। উল্লেখ্য, এই জেনারেলই ১০১ কমিন্যুকেশন জোনের দায়িত্বে ছিলেন এবং মেঘালয় সীমান্তবর্তী এলাকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সহায়ক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

১২ আগস্ট '৭১ বেলা ২টার সময় তেলঢালা থেকে ১৫০টি ৩০৩ রাইফেল, ১২টি সাব- মেশিনগান, ২টি এলএমজি, কয়েক বাক্স এ্যাম্যুনেশন, বেশ কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ২ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার নূরুল হকের একটি দল মানকাচর সাব সেক্টর কমান্ডারের কাছে এসে রিপোর্ট করেন। লঞ্চ ঘাট থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনার ব্যবস্থা করা হল। মেজর শাফায়াত জামিল সুবেদার নূরুল হকের সঙ্গে আরও ৬ জন এনসিও প্রশিক্ষক রৌমাতে প্রেরণ করেন। জেনারেল গিল এবং কর্ণেল জিয়া ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য এগুলো প্রেরণ করেন।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বেই তাঁরা এগুলো পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রথম দফায় ১৫০ জন ছাত্র যুবককে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করা হয়। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জহির সৈনিক বাছাইয়ের কাজে সহায়তা প্রদান করেন। ডা. জহিরকে রৌমারতে ৫০ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিদের্শ প্রদান করা হয়। বাছাইকৃত ১৫০ জনকে রৌমারী হাইস্কুলে থাকার


www.amarboi.org

ব্যবস্থা করা হয়। সুবেদার নূরুল হক এবং সুবেদার আলী নেওয়াজ বাছাইকৃত সৈনিকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ট্রেনিং এর বিষয়বস্তু ছিল:

ক. ক্ষুদ্র অস্ত্র খোলা, জোড়া লাগানো এবং ব্যবহার প্রণালী

খ. ফিল্ড ক্রাফটের ব্যবহার, রেইড, এ্যামবুশ, প্যাট্রোলিং

গ. আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক

ঘ. অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চাদপসরণের বিভিন্ন সতর্কতামূলক বিধি ব্যবস্থা

ঙ. ২ ইঞ্চি মর্টার, ৩৬ হ্যান্ডগ্রেনেড এবং এসএলআর থেকে এনারগা গ্রেনেড নিক্ষেপের বিভিন্ন লক্ষণীয় দিক এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি। ১৩ আগস্ট ৭১ উল্লেখিত অস্ত্র ও কর্ণেল জিয়ার সম্মতিক্রমে প্রকাশ্যে সাইনবোর্ড স্থাপন করে বাংলার মুক্তমাটিতে দেশের প্রথম সেনানিবাসের প্রতিষ্ঠা হয়। রৌমারী ক্যান্টনমেন্টের সাইনবোর্ডগুলি লঞ্চঘাট, বাজার এলাকা, হাইস্কুল এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে সাইনবোর্ড তুলে মুক্তিবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে আর কোথায়ও করা সম্ভব হয় নাই ।

১৩ আগস্ট '৭১ ভোর থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক স্কুলের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। নির্দিষ্ট হয় প্রশিক্ষণরত ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার ফায়ারিং প্র্যাকটিস হবে তাই ৩০০ রাইফেল খোলা-জোড়া দেয়া, পজিশন নেয়া, অস্ত্র ধরা এবং নিশানা কিভাবে ঠিক করতে হয় ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়।

এদিকে চরাঞ্চলের অসংখ্য বাড়িতে নির্মিত ট্রেঞ্চ এবং বাংকার গুলোকে আরও মজবুত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। পাকিস্তানিদের সম্ভাব্য ১৪ আগস্ট এর আক্রমণ ব্যর্থ করে দেবার জন্য রৌমারীর জনগণও প্রস্তুত হয়ে থাকল।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানিদের রৌমারী আক্রমণের হুমকির দিনটি মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা ও প্রতিক্ষায় কাটাচ্ছিল। সকালেই ফায়ার শুরু করে দেয়। বেলা ১২ টা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই ফায়ারিং প্র্যাকটিস সম্পন্ন হয়। সারা দিন অপেক্ষা করার পরও পাকিস্তানিদের কোন হামলা হল না। নিশ্চিত হওয়া গেল যে, হয়ত পাকিস্তানি বাহিনী আর মুক্তাঞ্চল আক্রমণ করবে না। ১৫ আগস্ট সফলভাবে প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং সম্পন্ন হওয়ার পর ডা. জহিরকে নির্দেশ দেয়া হয় দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য ১৫০ জন ছাত্র-যুবক নির্বাচন করা। সুবেদার নূরুল হক তার অক্লান্ত পরিশ্রমে এক সপ্তাহের ট্রেনিং দিয়ে একটি নবীন সৈনিকদের



www.amarboi.org

কোম্পানী তৈরী করতে সক্ষম হন। ১৭ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের সম্মুখ অবস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলকে সঙ্গে নিয়ে রৌমারী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কার্যালয় আসেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫০ জন ছেলেকে ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কর্তিমারী অবস্থানে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ১০০ জনের মধ্যে ৫০জনকে সুবেদার করম আলীর হাজীরচরের অবস্থানে এবং ৫০ জনকে সুবেদার আকবরের ঠাকুরেরচরের অবস্থানে পাঠানো হলো। সেপ্টেম্বর মাসে ১৯ তারিখ পর্যন্ত রৌমারী অবস্থান কালে প্রতিটি ব্যাচ ১৫০ জন করে মোট ১৫টি স্টুডেন্ট কোম্পানি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

## হামলা ও প্রতিঘাত

এর আগে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তিমারীত ক্যাপ্টেন আনোয়ারের অবস্থানের ওপর হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পিছপা হতে বাধ্য হয়েছে। হয়ত ১৪ আগস্টের আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। প্রথম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। দু'টি অবস্থানের সামনের নদীপথে মুক্তিযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে শক্তিশালী টর্চলাইটের মাধ্যমে পাহারা দিত। তাছাড়া, ছোট ছোট নৌকায় সারারাত টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৬ আগস্ট '৭১ সন্ধ্যার পর কোদালকাটি চরের একজন গ্রামবাসী নদী সাঁতরিয়ে সুবেদার আলী আকবরের ঠাকুরের চরের অবস্থানে পৌঁছে। গ্রামবাসীটি পাকিস্তানি সেনাদের অসংখ্য কলাগাছ এবং কাঠের ভেলা তৈরির সংবাদ দেয়। ঐ রাতে পাকিস্তানিরা মুক্তিযোদ্ধাদের হাজীরচর এবং ঠাকুরের চরের দুটি অবস্থানের ওপর আক্রমণ করার সম্ভাবনার কথা সুবেদার আলী আকবরকে জানায়। সুবেদার আলী আকবর হাজীরচরে সুবেদার করম আলীকে পাকিস্তানীদের সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ দুইজন সৈনিক মারফত জানিয়ে দেন।

ক্যাপ্টেন আনোয়ার কর্তিমারীতে এবং সুবেদার আফতাব রাজীবপুরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল। এদিকে সুবেদার বদী খেরুয়ারচর এবং ঘুঘুমারী অবস্থানে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হল। রৌমারী মাদ্রাসা ঘরে অবস্থানরত ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট মোদাচ্ছেরকেও তার কোম্পানি নিয়ে প্রস্তুত রাখা হলো। সুবেদার আলী নেওয়াজকে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলকে পাকিস্তানিদের সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। দুইজন মুক্তিযোদ্ধা মাথায় কচুরীপানা বেঁধে স্রোতের



www.amarboi.org

অনুকূলে সাঁতরিয়ে চরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে উঠে এসে জানাল যে পাকিস্তানি বাহিনীরা আক্রমণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। শত্রুবাহিনী যথারীতি একটানা ৩ ঘন্টা মুক্তিবাহিনীর অবস্থানগুলোর ওপর তাদের ফিল্ড আর্টিলারি মর্টার ও মেশিনগানের গুলি নিক্ষেপ করে। স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমির জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক গোলাই বিস্ফোরিত হচ্ছিল না। রাত ৩টায় পাকিস্তানি সেনারা পুনরায় ভেলায় চড়ে নদী অতিক্রমের চেষ্টা চালায় কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সম্মুখবর্তী অবস্থানের সৈনিকরা ওদের সে প্রচেষ্টা প্রতিহত করে ফেলে। শত্রু রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার আগে এ সংবাদ হাবিলদার কালামকে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হলো কিন্তু কোথাও তার হদিস পাওয়া গেল না ফলে শত্রুর দুটি সুসজ্জিত বড় লঞ্চ সমস্ত পাকসেনাদের নিয়ে নিরাপদে চিরতরে মুক্তাঞ্চল ত্যাগ করে চলে যেতে সক্ষম হলো। পরিতাপের বিষয় ওরা যাওয়ার আগে তাদের সঙ্গি রাজাকারদের লাইন আপ করে মেসিনগানের গুলিতে হত্যা করে ফেলে রেখে গেল। ব্রিগেড কমামন্ডার জিয়া নিজে হাবিলদার কালামের নেতৃত্বে দু'টি মর্টার দু'টি কৌশলগত স্থানে স্থাপন করে সঠিক পদ্ধতিতে অবস্থান ও কাল বিবেচনায় নিয়ে গোলা নিক্ষেপ করার কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কোন রকম গাফিলতি সহ্য করা হবেনা এই হুঁসিয়ারিও দেন। পাকিস্তানীদের দু'টি বড় অস্ত্র সজ্জিত মডিফাইড মোটর লঞ্চ যেন কোন ক্রমেই পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু হাবিলদার কালাম আমরা চলে আসার পর পরই বিনা অনুমতিতে মর্টার দু'টি মূল অবস্থান থেকে অনেক পিছনে টার্গেটের আওতার বাইরে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসে। ফলে যুদ্ধ শেষে পালাবার সময় যথেস্ট সুযোগ পেয়েও হাবিলদার কালামের অবিমৃশ্যকারিতায় দু'টি নিশ্চিত টার্গেট হাত ছাড়া হল। এই ঘটনার পর থেকে ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে কর্তিমারী অবস্থানে এবং এই দুটি অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধারা সব সময়ের জন্য সতর্ক থাকতে শুরু করে। পরের দিন দুপুরে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান হঠাৎ আমার মানকাচর ক্যাম্পে এলেন; সাথে কয়েকজন সেনাও ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাবিলদার কালামকে সাথে তিন জন সেনাসহ নিয়ে আসা হল। এরা সেই পলাতক মর্টার ব্যাটারির সেনা। জিয়া তাদেরকে ঐ অমার্জনীয় অপরাধের জন্য কঠিন সাজা দিলেন।

১৮ আগস্ট '৭১। সুবেদার হাকিমের (ইপিআর সুবেদার) নেতৃত্বে ১৫০ জনের একটি এফ এফ দল মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প থেকে এসে রৌমারীতে সাব সেক্টর কমান্ডারের কাছে রিপোর্ট করে। সুবেদার হাকিমকে ঐদিন ঠাকুরেরচর এবং ঘুঘুমারীর মধ্যবর্তী ফালুয়ারচর, চন্দুয়ারচর এবং তৎসংলগ্ন চরগুলোতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়া হয়।



www.amarboi.org

এদিকে ১৭ আগস্ট রৌমারী সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুলে বি কোম্পানির ১৫০ জনের ট্রেনিং শেষ হলে তাদের ভাগ করে কর্তিমারী, রাজীবপুর, ঠাকুরেরচর ও ফালুয়ারচরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে সামনের অবস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। এভাবে ২০ আগষ্টের মধ্যেই বাহাদুরাবাদ ঘাটের নিকটবর্তী সবুজপুরঘাট থেকে সুদূর ভূরুঙ্গামারীর কাছাকাছি ভারত সীমান্তে যমুনা নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত দীর্ঘ ৮০ থেকে ৮৫ কিলোমিটার লম্বা পুরো এলাকাটি মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন চলে আসে।

এদিকে ২০ আগষ্ট রাতে ৩০/৪০ জন পাকিস্তানি কমান্ডো দল ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কর্তিমারী অবস্থানের সামনের চরে নেমে সারারাত কাশবনে লুকিয়ে থেকে ভোর হতেই আর্টিলারি ফায়ার কভারের মাধ্যমে লাইফবেল্ট ও ভেলার সাহায্যে কর্তিমারী মূল অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু আলফা কোম্পানি নির্ভীক সৈনিকরা ওদের আক্রমণ প্রতিহত করে। সেদিন অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এ রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং নিয়মিত সেনাও হতাহত হয়।

রৌমারী মুক্তাঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার খবর ৮নং থিয়েটার রোডসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ২০ আগস্ট পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জেনারেল গুরবক্স সিং গিল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রৌমারী এলেন। জেনারেল ও তার স্ত্রী ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সব কর্মকান্ড দেখলেন এবং প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থাদি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন জেড ফোর্স কমান্ডার কর্নেল জিয়া সপ্তাহব্যাপী রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ পুনর্বিন্যাস করলেন। কাজিউল ইসলামের দখল করে আনা দু'টি লঞ্চ এবং স্পীড বোটগুলি না থাকলে মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সাংঘাতিকভাবে ব্যহত হত।

২৭ আগস্ট জেড ফোর্স কমান্ডার কর্ণেল জিয়া তেলঢালা ফিরে না গিয়ে রৌমারী ডাক বাংলোতেই থেকে গেলেন। ২৫ আগস্ট থেকে মানকাচর সাবসেক্টর এবং মুক্তাঞ্চলের কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খান রৌমারীতেই অবস্থান করছিলেন। কর্ণেল জিয়া তার সাথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি আবারও অতিরিক্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রদানের আশ্বাস দিলেন। ৩ বেঙ্গলের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির কথাও স্পষ্টতর করলেন। আলোচনায় প্রশিক্ষণ স্কুলের কাজ, যমুনা নদী অতিক্রম করে পাকিস্তানি অবস্থানগুলোর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা, চিলমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, ফুলছড়িঘাট, গাইবান্ধা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা কয়েক জায়গাতেই



www.amarboi.org

এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে কয়েকটি সেতু উড়িয়ে দেয়া, পাকিস্তানিদের চিলমারি, ফুলছড়িঘাট ও উলিপুর অবস্থানের ওপরও আক্রমণ পরিচালনা করার সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা হল।

এ সব অপারেশনের জন্য হাজার/বারশত পাউন্ডের মত এক্সপ্লোসিভ লাগবে বলে আন্দাজ করা হল। ২৮ আগস্ট সকাল ৮টায় কর্ণেল জিয়া পোস্ট অফিস কার্যালয় উদ্বোধনের মাধ্যমেই রৌমারীর মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশের প্রথম বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্বোধন করলেন। পরে ক্রমান্বয়ে থানা হাসপাতাল, প্রাইমারী স্কুল, আদালত ঘর, সার্কেল অফিসার, কাস্টম ও এক্সাইজ অফিস, ট্রেজারি ঘর এবং সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুলের উদ্বোধন করা হবে। সকাল ৭টার মধ্যেই পোস্ট মাস্টার এবং অন্যান্য কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ জানালেন যে, তাদের সকলেই অফিস উদ্বোধনের জন্য, সর্বোতিভাবে প্রস্তুত। পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী কর্ণেল জিয়া ফিতা কেটে বিপুল করতালির মাধ্যমেই রৌমারী পোস্ট অফিস উদ্বোধন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং থানা হাসপাতাল, স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

## জেড ফোর্স এবং ১১নং সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মানকাচর সাবসেক্টর কমান্ডার এবং যুগপৎভাবে রৌমারী-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চলের কমান্ডার স্কোয়াড্রণ লীডার হামিদুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে খন্ড অভিযান

আগস্টের শেষ সপ্তাহের মধ্যে বাহাদুরাবাদ ঘাট সংলগ্ন সবুজপুর ঘাট এবং রাজীবপুর থেকে ভুরুঙ্গামারী সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত দীর্ঘ ৮০/৮৫ কি.মি. এলাকাজুড়ে চরাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ফলে তাদের নিয়ে যমুনা নদীর অপর তীরে সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, গাইবান্ধা, ফুলছড়িঘাট, চিলমারী, উলিপুর ও কুড়িগ্রাম এলাকায় পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর রেইড, এ্যামবুশ, হ্যারাসিং ফায়ার ইত্যাদি ধরণের অপারেশন পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। চিলমারী, কুড়িগ্রাম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় উলিপুর ও কুড়িগ্রামের মাঝের দুর্গাপুর রেল সেতুটি ছিল সবচেয়ে বড় এবং সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্রিজটিও উড়ানোর জন্য ৪টি ডেমোলিশন পার্টি দেয়া হলো লেফটেন্যান্ট মোদাচ্ছেরকে। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই অফিসারকে ৬০ জনের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত করা হলো। স্থানীয় ৪জন গাইডও তাকে দেয়া হলো। যমুনা নদ অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকার ব্যবস্থা করা হলো।



www.amarboi.org

## নেভাল কমান্ডোদের আগমন

২ অক্টোবর '৭১ বিকেলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল ওসমানীর নির্দেশে ১২ জন নেভাল কমান্ডো ফ্রগম্যান ১১ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার হয়ে মানকাচর সাব সেক্টর কমান্ডারের নিকট রিপোর্ট করে। এদের সঙ্গে লিম্পেট মাইনসহ্ সব ধরণের ফ্রগমেন-কিট্ ছিল। নেভাল কমান্ডোদের নিয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি, যোগ্যতা, মোড অব অপারেশন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। বহুদূর থেকে সাঁতরিয়ে শত্রুর জাহাজ, বার্জ বা গানবোটে লিম্পিট মাইন লাগিয়ে দিয়ে আসতে পারলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা এক্সপ্লোড করে ওগুলো ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হবে। ঐ সময়ে রৌমারী মুক্তাঞ্চলের পাশাপাশি চিলমারী বন্দর, ফুলছড়িঘাট, বাহাদুরাবাদ ঘাট এবং সিরাজগঞ্জঘাটে পাকিস্তানি বাহিনীদের অনেক জাহাজ, বার্জ ও গানবোট মোতায়েন ছিল। এই স্থানসমূহে একসঙ্গে অপারেশন পরিচালনার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় গাইডের সহায়তায় নেভাল কামন্ডোগণ অপারেশনের পূর্বে রেকির মাধ্যমে অপারেশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। নেভাল কমান্ডোগণ সফলতার সঙ্গে ১৭ সেপ্টেম্বর চিলমারী ও ফুলছড়িঘাটে একযোগে ২টি পাকিস্তানি জাহাজে বিষ্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। অপরদিকে বাহাদুরাবাদঘাট ও সিরাজগঞ্জে গমনকারী দল শত্রুর প্রহরা ও সকর্তকতার জন্য অপারেশন সফল করতে পারলো না। এ অপারেশনের মাধ্যমে জলে ও স্থলে হামলা শুরু হলো। এ মাসেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সমুদ্র ও নদী বন্দরে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালিত হয়।

## চিলমারীর বিশ্ময়কর অভিযান

প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এমএজি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমাদের একটি মুক্তাঞ্চল অতীব প্রয়োজন। একথা কারো অজানা নয় যে, ভারত আমাদেরকে সহায়তা দিয়েছে তাদের ভৌগলিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক কৌশল কে সামনে রেখে। তাদের আজীবন লালিত অখন্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি এলিমেন্ট হিসাবে। এ ধারণা থেকেই প্রবাসী সরকার একটি মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্যও একটি মুক্তাঞ্চলের প্রয়োজন ছিল। এ জন্য প্রথমে চুয়াডাঙ্গাকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরপর যথারীতি চুয়াডাঙ্গাকে মুক্তাঞ্চলের রাজধানী ঘোষণারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানও চুয়াডাঙ্গায় হবার কথা ছিল। কিন্তু



www.amarboi.org

১৪ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গার পতন ঘটে। আর এর কারণেই ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার সীমান্ত এলাকার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমাকে যে কোনো মূল্যে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু ২ মে রামগড়ের পতন ঘটে। এরপর ফেনীর বিলোনিয়া বাল্‌জকে মুক্তাঞ্চল রাখার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিলোনিয়া বাল্‌জের (সূচিব্যূহ) Bulge প্রতিরক্ষার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩টি নিয়মিত কোম্পানি এবং ২নং সেক্টরের ৪টি এমএফ/এফএফ কোম্পানিকে নিয়োজিত করেও তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ৩ জুন '৭১ থেকে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর বিলোনিয়া বাল্‌জের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে শুরু করে। ফলে ২১ জুন বিলোনিয়া অবস্থানের পতন ঘটে।

এমতাবস্থায় সবার দৃষ্টি মেজর জিয়ার উপর পড়ে। মেজর জিয়া তাদেরকে হতাশ করেণ নাই। তিনি রৌমারী-রাজীবপুরে সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে পর পর ৪ টি যুদ্ধের সফলতায় প্রায় ৭০০ বর্গ মাইলের একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলেন। তবে শত্রুরাও পরাজিত হয়ে চুপচাপ বসে থাকেনি। তারা মুক্তাঞ্চলের বিপরীতে চিলমারী-উলিপুর বেল্টে বিশাল রণ ভান্ডার ও সেনা মোতায়েন শুরু করে দেয়। নদীপথে অস্ত্র গোলাবারুদবাহী বহর এবং ট্রেনযোগে সেনাদল পাঠাতে শুরু করে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুক্তাঞ্চলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে মেজর জিয়ার সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেণ স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খান। অভিযানের ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হয়। মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষা এবং মানকাচর সাব সেক্টরের দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। তিনি তখন সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। পুরো সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ অভিযানের নিখুঁত পরিকল্পনা করা হয়। এরই মধ্যে ১০ অক্টোবর জিয়াকে হঠাৎ সিলেটে মুভ করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর রাতে অভিযানের তারিখ নির্দিষ্ট রয়ে যায়। অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

## ভুয়াপুর অপারেশন

পাক বাহিনী রৌমারি-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল দখলের উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম থেকে একটি অস্ত্রবাহী নৌ বহর পাক শক্ত ঘাঁটি চিলমারী আসার পথে টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরে ইন্টারসেপ্ট করার জন্য আগস্টের ৩ তারিখে ১১নং সেক্টরাধীন টাঙ্গাইল জেলার কোম্পানী কমান্ডার আবুল হাসনাত মুক্তাকে মনোনীত করা হয় সেখানে অবস্থানরত সেক্টরের অন্য কোম্পানীসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য। মুক্তা



www.amarboi.org

টাঙ্গাইল অঞ্চলের ১৫০ জনের একটি কোম্পানী নিয়ে মানকাচর ক্যাম্প থেকে দুই জন গাইড নিয়ে (একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নূরুন্নবি অপর জনের নাম আপাততঃ স্মরণে নাই) ৪টি বড় নৌকা বোঝাই করে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম গোলা বারুদসহ সরাসরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ভূয়াপুরের উদ্দেশ্যে মানকাচর থেকে রওনা হয়। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাহাদুরাবাদ ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পার হয়ে ২ দিন ১ রাত্রি পর ভূয়াপুর পৌঁছে ৬ আগষ্ট ভূয়াপুর কলেজে ক্যাম্প স্থাপন করে। ১ দিন বিশ্রামের পর ভূয়াপুর কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে মানকাচর সাব সেক্টরের যুদ্ধ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়। কোম্পানী কমান্ডার মুক্তা ঐ অঞ্চলে ইতিমধ্যে অবস্থানরত অন্যান্য এফ.এফ. কোম্পানী গুলির সাথেও আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্য সমন্বয়ের প্রয়াস নেয়। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের জহুরুল হক কোম্পানী, আবুল কোম্পানী, সামছুল আলম (ময়মনসিংহ) কোম্পানী, লুৎফর কোম্পানী, বারী মাষ্টার কোম্পানী, লুদা কোম্পানী, আমিনুর রহমান তালুকদার কোম্পানী, বাছেত কোম্পানী, সিরাজুল হক শফি (পুলিশ) কোম্পানী, ফয়জুর মামা প্লাটুন, হারুন প্লাটুন, বাদল প্লাটুন, তোফাজ্জল হোসেন খান প্লাটুন, 'জাহাজমারা হাবিব' গ্রুপ সমূহের বড় ছোট দলগুলি সহ ভাগ হয়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। এর ফলে ভূয়াপুরকে কেন্দ্র করে এক বিশাল এলাকায় ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ভূয়াপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নদী, নালা, খাল, বিল প্রায় সবই বর্ষার মৌসুমে জলমগ্ন থাকে। চলাচলের জন্য হাঁটা এবং নৌকা ছাড়া কোন যানবাহন নাই। ৮ আগষ্ট সংবাদ এল এলেঙ্গা থেকে পাক বাহিনীর একটি বড় নৌ-কন্টিনজেন্ট এগিয়ে আসছে ভূয়াপুর আক্রমণ/চিলমারীর পূর্ব তীরে অবস্থিত মুক্তাঞ্চল আক্রমণের উদ্দেশ্য চিলমারীকে শক্তিশালী করার জন্য। উভয় সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্য এলেঙ্গা ভূয়াপুর রাস্তায় নদীর পাড়ে ডালিম ও ছোব্হান এর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের দু'টি সেকসন পাঠান হয়। ঐদিন দুপুরেই সংবাদ এল পশ্চিম দিক থেকেও পাক সেনা ও অস্ত্রবাহী জাহাজ ভুয়াপুর অভিমুখে আসছে। সংবাদটি যাচাই করে জানা গেল আশে পাশে কোথাও কয়েকটি জাহাজ নোঙ্গর করেছে। তাতে প্রচুর অস্ত্রের চালানসহ পাক সেনা আছে। এরা ভুয়াপুর ক্যাম্পে আক্রমণ করতে পারে এই আশংকায় এলাকায় অবস্থানরত অন্যান্য কমান্ডারদের সাথে শলা পরামর্শ করে একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণের সমর কৌশল (strategy) রচনা করা হয়। প্রথমত বাছাই করা ৫০/৬০ জন হার্ড কোর মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ভুয়াপুর ক্যাম্প থেকে পশ্চিম দিকে পাক সেনাদের অ্যামবুশে ফেলার



www.amarboi.org

পরিকল্পনা নিয়ে মাটিকাটা বাজারে বিকেলের মধ্যে পজিশন নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে জানা গেল বাছেত নামে এক মুক্তিযোদ্ধা তার কোম্পানী নিয়ে বাজারের কাছে গোবিন্দাসীর একটি বাড়ীতে ক্যাম্প করে উত্তর দক্ষিণ লম্বালম্বি বাঁধের দক্ষিণে যথারীতি পজিশন নিয়েছে। ভয় ছিল শত্রুসেনারা যদি সিরাজগঞ্জ থেকে গানবোটে এসে লৌহজং নদীতে প্রবেশ করে ভূয়াপুর আক্রমণ করে তবে ভূয়াপুরের পতন ঠেকানো যাবেনা। বাছেত ১১ নম্বর সেক্টরের তুরা ট্রেইন্ড কোম্পানী কমান্ডার। তাকেও পূর্বাহ্নেই বাংলাদেশের দূর অভ্যন্তরে অবস্থান করে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনগুলিকে সংহত করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠান হয়েছিল। এরা যখন মাটিকাটা বাজারে আলাদা হোটেলে আহারে ব্যস্ত তখনই দূত মারফতে জানা গেল যে মাটিকাটা বাজারের উত্তর দিকের বাঁধে লুৎফর কোম্পানী, বারী মাষ্টার কোম্পানী, লুদা কোম্পানী (কাজীপুর), আলম কোম্পানী (ময়মনসিংহ), আমিনুর রহমান তালুকদার কোম্পানী, সিরাজুল হক শফি (পুলিশ), ফয়জুর রহমান, হারুন, বাদল তোফজ্জল হোসেন খান, 'জাহাজমারা হাবিব' গ্রুপসহ আরও অনেক ছোট বড় কোম্পানী বা গ্রুপ পূর্বাহ্নেই যথাযথ ভাবে এলার্ট রয়েছে। তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সরাসরি ১১ নম্বর সেক্টরের সহযোগি গ্রুপ ছিল। বাছেত কাল বিলম্ব না করে হাতিয়ার নিয়ে সোজা উত্তর দিক ধরে সময় সাশ্রয় করার অভিপ্রায়ে লৌহজং এর পাশে অ্যামবুশের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু জাহাজের হদিস নাই। বাছেত তার কেম্পানী নিয়ে পশ্চিমে ধলেশ্বরীর দিকে রওনা হল। রাস্তা নাই ; কোথাও বুকপানি কোথাও হাঁটু পানি। নালা ডোবা কাশবন আর আমন ধানের ক্ষেত পার হওয়ার পথে জানা গেল জাহাজ পোড়াবাড়ীতে নোঙর করেছে। এই দুর্গম পথে আরও মাইল খানেক দক্ষিণে গিয়ে দেখা গেল এক এলাহি কান্ড। নোঙর করা আছে ২ টি বড় স্টীমার, ২ টি বড় কার্গো, ২ টি মাঝারি আকারের যাত্রিবাহী লঞ্চ এবং একটি স্পীড বোট। রীতিমত একটি নৌ বহর। এরা শত্রুসেনাদের পেছন থেকে আক্রমণ এড়াতে মাটিকাটা-নিকরাইলের রাস্তার বাঁশের সাঁকোগুলি খুলে দিয়ে কয়ড়া গ্রামের পাশে অ্যামবুশ পাতা হল। সবার সাথে সন্ধ্যার আগেই যোগাযোগ করে ভুয়াপুর যাওয়ার নদীর মোহনায় এবং বাঁধে পজিশন নেওয়া হল। মাটিকাটা বাজারের বাঁধে মুক্তার পজিশনের দক্ষিণে বাছেতদের পজিশন। (পরে মুক্তা আমাকে বলেছে এত দলের ভিড়ে বাছেতের সঙ্গে তার পরিচয়ই হয় নাই)। উত্তরে ঐ সকল দলের পজিশন; কোন ভাবেই যেন পাক সেনা পোড়াবাড়িতে নোঙর করা জাহাজ থেকে নেমে ভুয়াপুরে আক্রমণ করতে না পারে এমন কৌশল নিয়ে পজিশনেই রাত শেষ হয়ে গেল।



www.amarboi.org

স্থানীয় কয়ড়া গ্রামের বিত্তশালী লঞ্চ মালিক আজহার মেম্বার বিকালের দিকে পোড়াবাড়ী থেকে ফিরে এসে জানালেন জাহাজ বহরে কমবেশি ২০/২২ কোটি টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম আছে। এগুলি চিলমারী বন্দরে যাবে রৌমারী-রাজীবপুর এর মুক্তাঞ্চল দখল করার জন্য। ৯ আগষ্ট '৭১ইং সকাল বেলা পোড়াবাড়ীতে নোঙ্গর করা জাহাজে রেকি করার জন্য মুক্তা কোম্পানীর মজিবুর ও কাজিপুর থানার সাজনাবাড়ী গ্রামের আমজাদকে কাঁচা বাজার করার উছিলায় মিশনে পাঠানো হলো। ১০টার মধ্যে সংবাদ নিয়ে ফিরে এসে সেও জানাল জাহাজগুলি রংপুরের চিলমারী বন্দরে যাবে। যুদ্ধের রসদ এবং অস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলিতে কিছু পাক সেনা গার্ড আছে। সবার ধারণা হল জাহাজগুলির অস্ত্র পাহারার জন্য ঐ ফোর্স। ততক্ষণে মাটিকাটা বাজারে অধিকাংশ কোম্পানীর ছেলেদের খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষ এমন সময় উত্তর দিক থেকে একটি টহল জাহাজ পানির অবস্থা রেকি করে পোড়াবাড়ির জাহাজগুলির সঙ্গে মিলিত হয়েই আবার সবগুলো জাহাজ সরব হয়ে উজানে উত্তর দিকে রওয়ানা হওয়ার উপক্রম। ইতিমধ্যে আজহার মিয়ার বাড়ীতে মুক্তা, সেচ্ছাসেবক বাহিনীর শেঠ হাসান, হাবিব প্রমুখ সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল হাতিয়ার কম হলেও আক্রমণ করা হবে। মুহুর্তের মধ্যেই জাহাজ আক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হল। এরই মধ্যে আরও একটি লঞ্চ সিরাজগঞ্জ থেকে এসে ভিড়ল। এই বোটটি পুরো বহর কে গাইড করে উত্তর দিকে রওনা হল। এতগুলি নৌযান একত্রে ঢেউ তুলে যান্ত্রিক ছন্দানুসরণে এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্ট্রাইকিং বাহিনীও সুসজ্জিত অবস্থায় যুৎসই লোকেশনের উদ্দেশ্যে সিরাজকান্দির দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। দুইদলে বিভক্ত হয়ে মাটিকাটা বাজার থেকে পশ্চিমে যমুনা নদীর বাঁকে সিরাজকান্দি গ্রামে একদম নদীর তীর ঘেঁষে কলাগাছ ও কুঁড়েঘরের আড়ালে ২৫/৩০ জনের একটি দল পজিশন নিতে নিতেই টহলযানসহ তিনটি জাহাজ চলে যায়। আরও কয়েকটি জাহাজ উজানে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের থেকে তখনও ৮/৯ শত গজ দূরে এমন সময় সম্রাটের দল ২/৩ শত গজ দূরে অন্য একটি জায়গায় পজিশন নেয়। বায়নোকুলার দিয়ে শত্রু জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছিল। সাথী সিরাজুল হক (বাশার), আমজাদ, সোমনাথ, গামা, মজিবর, জাকির হোসেন, আব্দুল কাদের, দেলোয়ার, লুৎফর, আজিজ, সামছুল মোল্লা, এদের নিকট থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, এস. এম. জি. এবং এস. এল. আর. সহ গ্রেনেড সজ্জিত হয়ে টার্গেট ফায়ারিং রেঞ্জের আওতায় আসার জন্য সবাই অধির অপেক্ষায় ছিল। ৫০ গজের মধ্যে পি.এল-৭ এবং এলসি-৪,জাহাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অস্ত্রই একসাথে নীশানা মোতাবেক গুলি চালায়। জাহাজের



www.amarboi.org

প্রহরিরাও পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধদের পজিশন হাই গ্রাউন্ডে হওয়ায় প্রহরিদের গুলি মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। ১০/১৫ মিনিট এভাবে গোলাগুলি চলে অবারিত অবস্থায় থাকার কারণে বেশ কিছু পাক সেনা হতাহত হয়ে নদীতে পড়ে যায় এবং বাকিরা স্পীডবোটে চড়ে ভাটিতে জাহাজে গিয়ে উঠে। এ রকম আক্রমণের মুখে জাহাজে থাকার প্রশ্নই উঠেনা। গোলাবারুদ আর বিস্ফোরক বোঝাই জাহাজ যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তবুও কিছুক্ষণ পর পর বাছেত, মুক্তা এবং সম্রাটের দল জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। জাহাজ থেকে আর কোন গোলাগুলির প্রতিউত্তর না আসায় ধারণা করা হল পাক সেনা জাহাজের ভিতর খোলে লুকিয়ে আছে। ৪টা-৫টার দিকে আবার একদফা গুলি চালিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল পাক বাহিনী জাহাজে নেই। এই সময় রেজাউল করিম, সুরুজ সহ ৫/৬ জন নৌকা নিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল। জাহাজে তখন একজন বয়োবৃদ্ধ বাবুর্চি ছাড়া কেউই নাই। শুধুমাত্র প্রচুর অস্ত্র গোলা-বারুদের বাক্স বোঝাই। এরই মধ্যে সকলেই জাহাজে উঠে জাহাজের অস্ত্র গোলা-বারুদের বাক্স নামানোর জন্য অধির হয়ে উঠল। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী ছেলেদের উৎসাহ যেন আর ধরে না। প্রথমেই রেজাউল করিম ও সুরুজ অস্ত্র ভর্তি নৌকা নিয়ে বিজয় বার্তাসহ গোবিন্দাসী ক্যাম্পের দিকে চলে গেল। ক্রমান্বয়ে ১১০টি অস্ত্র বোঝাই নৌকা গোবিন্দাসী ক্যাম্পের দিকে পাঠানো হয়। সন্ধ্যায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া সারেং ওয়াছিউর রহমানকে ভাটি থেকে তুলে আনা হয়। সারেং এর নিকট থেকে জাহাজ ও পাকসেনা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয় গেল। সে বলল ঐ জাহাজ বহর ভূয়াপুর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসে নাই। তারা বিশাল অস্ত্র ভান্ডার নিয়ে চিলমারি যাচ্ছিল রৌমারি-রাজীবপুর মুক্তাঞ্চল দখল করার জন্য। মাল-সামান পাহারার জন্য অল্প সেনা জাহাজ বহরে ছিল। মূল সৈন্য শক্তি রেল পথে চিলমারী যাচ্ছে। এদিকে শত শত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলেরা চারদিক থেকে অনেক নৌকা জোগাড় করে অস্ত্র গোলাবারুদ এর বাক্স নামিয়ে নদী পথে বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে লাগল। রাত দু'টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে অস্ত্র নামান হল। এত অস্ত্র নেবার পরেও দেখা গেল জাহাজের সামান্যতম অস্ত্র গোলা-বারুদের বাক্সও বুঝি খালাস করা সম্ভব হল না। তখন সিদ্ধান্ত হল জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। জাহাজে পেট্রোল ও ডিজেল ভর্তি বেশ কিছু ড্রাম ছিল। দুটো ড্রামের মুখ খুলে জাহাজের ভিতর ফেলে দেওয়া হয়। নৌকা থেকে কাপড়ের টুকরা পেট্রোলে ভিজিয়ে আগুন লাগিয়ে জাহাজে নিক্ষেপ করা মাত্রই দাও দাও করে আগুন সমস্ত জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে গোলাবারুদের বিস্ফোরণ শুরু



www.amarboi.org

হয়ে গেল। ক্রমেই বিস্ফোরণের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল। অবস্থার এহেন মোড় দেখে মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলি জাহাজ থেকে দূরে সরে এল। জাহাজের বিস্ফোরণের কারণে অস্ত্র বোঝাই সব নৌকা সরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এলাকা গরু-বাছুর ও সাধারণ মানুষের চিৎকারে একাকার হয়ে গেল। সে যেন এক মহা প্রলয় কান্ড। গগনভেদি বজ্রনিনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা আর রংধনুর ছটায় আকাশ লাল হয়ে গেছে। নদির পানি সমুদ্রঝড়ের ঢেউয়ের মত দলিত মথিত হয়ে আছড়ে পড়ছে। অগুণিত শেল গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে পড়তে লাগল। যে যা পেরেছে নিয়েছে। নদীতে খালে অস্ত্র গোলাবারুদ বোঝাই বহু নৌকা ফেলে অন্যেরা চলে গেছে; নেওয়া সম্ভব নয়। উপায়ন্তর না দেখে অনেকের নৌকা বিভিন্ন জায়গাতে ডুবিয়ে দিতে হল। সকাল বেলা স্বেচ্ছাসেবক, ছাত্র ও জনগণের সাহায্য নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র গোলাবারুদ লুকানোর ব্যবস্থা করা হল। সম্রাটের দলকে মাটিকাটা বাঁধেই পজিশন দেওয়া হল। যাতে করে নদী থেকে পাক সেনা নেমে বাকিদের আক্রমণ করতে না পারে। এই সময় হাবিব এবং ছোহরাব (ইপিআর এর সদস্য) ৮/৯ জন স্বেচ্ছা-সেবক নিয়ে সম্রাটের সাথে সাহায্য সহযোগিতা করে অস্ত্র গোলাবারুদ লুকানোর ব্যবস্থা করে। উত্তর দক্ষিণে বাঁধের পজিশনে এফ.এফ. দলগুলো রাত্রিতে পিছু হটে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। অস্ত্র গোলা-বারুদ লুকাতে সমস্ত দিন ও রাত শেষ হয়ে গেল। সকাল হতে না হতেই পাক বিমান বাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টার ভূয়াপুর কলেজ ক্যাম্পকে আক্রমণের টার্গেট করল। জাহাজ ধ্বংসের এলাকাতে ব্যাপকভাবে বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে বম্বিং এবং স্ট্র্যাফিং চালাতে থাকে। এফ.এফ. দলগুলি এমতাবস্থায় ভুয়াপুর না গিয়ে ফলদহের দিকে রওনা হয়ে পুনরায় সবাই একত্রিত হয়। সম্রাটের দল মাটিকাটাতে, ডালিম সোবহানের দল এলেঙ্গাতে থাকায় এদের কারো সাথে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না। ভূয়াপুরে এমন প্রলয়ংকরি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা আপাতত ঐ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটা সমীচীন মনে করে ওরা সবাই কাজীপুর হয়ে মাদারগঞ্জ চলে আসে। কয়েকদিনের মধ্যে কাদের সিদ্দিকী ওর লোকজন নিয়ে নদী থেকে যতদূর পারল অস্ত্র তুলে নিয়ে গেল। বেওয়ারিশ মাল যে যা পারল নিয়ে গেল।

সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাগণ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মানকাচর সাব সেক্টর হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করে।



www.amarboi.org

## ঐতিহাসিক উলিপুর কাট অফ পার্টি অপারেশন (কুড়িগ্রাম)

অতি উচ্চাভিলাশী এবং ঐতিহাসিক চিলমারী রেইডের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাঙ্ক ছিল এই উলিপুর কাট অফ অপারেশন। পুরো অভিযানের নিরাপত্তা এই অপারেশনের সফলতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। যোগ্য এবং অভিজ্ঞ গেরিলা কোম্পানী কমান্ডার খায়রুল আলমের ওরফে নজরুল ইসলাম এর (বর্তমান ফ্যাশন অপটিক্স এর চেয়ারম্যান) উপর এই অপারেশনের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতেই মূল চিলমারী রেইড অপারেশনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। অক্টোবরের ১৫ তারিখের আগেই আলমকে নির্দেশ দেয়া হয় উলিপুরের স্থানীয় গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্য থেকে ১৪০ জনের একটি কোম্পানী গঠন করার জন্য। ঐতিহাসিক চিলমারী রেইডের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছিল। মুভমেন্টের ঠিক আগ মুহূর্তে আলমকে অবগত করা হয় এবং দায়িত্ব দেয়া হয় উলিপুর কাট অফ পার্টির নেতৃত্ব দিতে। ১৫ অক্টোবর সকালে ১০৮ জনের (তাৎক্ষণিক ভাবে প্রস্তুত) এই কোম্পানী নিয়ে চিলমারী কুড়িগ্রাম রেল লাইনের ২০ মাইল দূরত্বে উলিপুর থানা থেকে কুড়িগ্রামের দিকে রেল লাইনের পূর্ব পাড়ে ৫ মাইল ব্যাপী জায়গা নিয়ে সরাসরি পাক বাহিনীর মুখোমুখি ডিফেন্স রচনা করার প্ল্যান হয়। প্রতি প্লাটুনে ৩৫ জন করে তিনটি প্লাটুন এর অবস্থান নির্ধারণ ছিল বকশির হাট, মোঘলগাছা ও দূর্গাপুর ফ্ল্যাঙ্ক। অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার ছিল সানন্দ বাড়ী। এই প্লাটুন সমূহের দায়িত্বে ছিল যথাক্রমে লাল মিয়া, চান মিয়া ও রাজু। ১৭ অক্টোবর ভোর ৪টায় চিলমারী রেইডের মূল অপারেশন এক্টিভেট হওয়ার ১২ ঘন্টা আগে অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর বিকাল ৪ টা থেকে ডিফেন্স লাইনের আওতায় রেল লাইন সড়ক ব্যবস্থা ও টেলিফোন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে যাতে মূল অভিযান চলাকালীন সময় কুড়িগ্রাম থেকে পাকবাহিনী চিলমারীর পাকসেনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে এবং চিলমারী অপারেশনের কারণে পলায়নপর শত্রু সেনারা কুড়িগ্রামের দিকে যেতে না পারে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে উলিপুরের সামগ্রিক অপারেশনের বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথমে উলিপুর থেকে মাইল খানিক দূরে কুড়িগ্রামের দিকে সড়কের উপর ২টি কংক্রিট ব্রীজ ও তিনটি কালভার্ট প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বসানোর দায়িত্ব ছিল ডেমোলিশনে ট্রেনিং প্রাপ্ত কুড়িগ্রাম কলেজের ছাত্র শহীদুল আলমের উপর।

১৫অক্টোবর সীমিত গোলাবারুদ নিয়ে আলম কোম্পানী উলিপুরের দিকে রওনা হল। উলিপুর থানার দেড় মাইলের মধ্যে রেল লাইনের পাশে রাত কাটানোর



www.amarboi.org

জন্য আস্তানা গাড়লো। উলিপুর থানায় তখন মাত্র এক প্লাটুন পাক সেনা। খায়রুল কোম্পানী যেহেতু মাত্র ১০৮ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রওনা হয়েছিল, সে কারণে পরের দিন আরও ১ প্লাটুন + মুক্তিযোদ্ধকে খায়রুল আলম কোম্পানিকে রি-ইনফোর্স করার নির্দেশ ছিল তারা যেন উলিপুরে কোম্পানী কমান্ডার খায়রুল এর কাছে রিপোর্ট করে। কোম্পানি কমান্ডার খায়রুল আলম মুক্তিযোদ্ধা নওয়াব আলী, আবুল কাশেম কাচু, হিতেন্দ্র নাথ, মমতাজ আলী এবং গুলজার আলী এবং আবু বকর সিদ্দিক এই ৬ জনকে অগ্রবর্তি অবস্থানে ক্যাম্প পাহারার দায়িত্বে রেখেছিল। দুর্ভাগ্য ওদের সে রাতেই কুড়িগ্রাম থেকে ১ কোম্পানী কমান্ডোসহ রাজাকার মিলিশিয়ার ৪০০ জনের এক ঝটিকা বাহিনী নাগেশ্বর থানায় অপারেশন চালাবার উদ্দেশ্যে উলিপুর থানায় যাত্রা বিরতি করে। নিকটেই খায়রুল কোম্পানীর উপস্থিতি টের পেয়ে রাত সাড়ে তিনটায় মুক্তিবাহিনীর কোম্পানিটিকে ঘিরে ফেলে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ঐ পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে পাক সেনাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং নিজেদের কোম্পানীর বাকি ছেলেদেরকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। সেখান থেকে ফায়ার কাভার দিয়ে যেন পরে এই পাঁচ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সব কাজই প্ল্যান মোতাবেক হয় কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে মূল কোম্পানীর ফায়ার কাভারে এই পাঁচটি তরুণ বেরিয়ে আসতে পারলো না। পাক সেনা ও রাজাকারেরা এদেরকে সাময়িক ট্রেঞ্চের মধ্যেই অতি নির্মমভাবে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে। পাক বাহিনীর নাগেশ্বর থানা অপারেশনের আগাম খবর ৬নং সেক্টরের ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নিকট পূর্বাহ্নেই পৌঁছে যাওয়ায় তিনি এই ঝটিকা বাহিনীকে স্বাগত জানাবার জন্য যথাযথ অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। অ্যামবুশে পরে ঝটিকা বাহিনী বিধ্বস্থ হয়ে যায়।

১৬ তারিখ সকালেই ঐ ছয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রাম বাসিদের সহায়তায় যথাযথ ভাবে সমাধিস্ত করা হয়। ১৭ তারিখ সকালে ১ সেকশন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আলমের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ফ্লাইট সার্জেন্ট শফিক উল্লাকে আগেই ব্রীফ করা ছিল । সেই মতে ফ্লাইট সার্জেন্ট শফিক উল্লাহ ১৭ তারিখ সকালে উলিপুরের দিকে রওনা হয়। দুর্ভাগ্যবশত সে তার সেকশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুর নজরে পরে যায়। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে সে নদীর তীরে পালিয়ে এসে নদীর পূর্ব পারে স্বাধীন এলাকা ঘুঘুমারির পার্শ্ববর্তী পাখি বসার চরে চলে আসে। এসব এলাকা সুবেদার হাকিমের প্রতিরক্ষা বেষ্টনির আওতাধীন ছিল। এখানে সে রঞ্জুর সাক্ষাৎ পায়। তারা সুবেদার হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা আর মানকাচর বা রৌমারীতে ফিরে যায় নাই।



www.amarboi.org

চিলমারী অপারেশনের পূর্ব রাত্রে স্থানীয় জনসাধারণ ব্যাপক হারে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সাথে যারা জড়িয়ে পড়ে তাদের সংখ্যা ছিল ২২০ জনের মত। স্থানীয় সাহসী স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের সংগঠন ও নেতৃত্বে ছিলেন সানন্দ বাড়ীর প্রভাবশালী নেতা ডাঃ মনসুর। মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিসেনাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য তিনি এলাকায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন জাতি এটাই আশা করে। ১৬ অক্টোবর ভোর রাতের আগেই আলমের পুরো কোম্পানী এবং সহযোগী স্বপ্রণোদিত গ্রাম বাসীগণ একত্রিত হয়ে রেললাইন ও সড়কের উপর সমবেত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে রেল লাইনটিকে ছোট ছোট অংশে কেটে ফেলা হয়। পরে সবাই মিলে এগুলোকে নিকটবর্তী ঝিলে ফেলে দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে কোদালের সাহায্যে রেল লাইনের মাটিও কেটে ফেলা হয়। ভোর হওয়া পর্যন্ত প্রায় ৫০/৬০ হাত রেল লাইনের মাটি কেটে জমিন বরাবর সমান করে ফেলা হয়। রেল লাইনের ২টি কালভার্ট প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। সড়ক পথ এমনিতেই এবরো- থেবরো ছিল, তার উপর ২টি সেতু ও ৩টি কালভার্ট উড়িয়ে দেওয়ায় সড়ক পথও সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। পূর্ব ব্রিফিং অনুযায়ী ১৬ই অক্টোবর ভোর ৪ টায় চিলমারীর আমি গাজির চরে অবস্থানরত অবস্থায় ব্যারি পিস্তলের মাধ্যমে সবুজ সংকেত আকাশের দিকে ফায়ার করে যুগপৎ পুরো অপারেশন এক্টিভেট করি। উলিপুর থেকেও সবাই তা স্পষ্ট দেখতে পায়। যেহেতু উলিপুরের অপারেশন ১২ ঘণ্টা আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তাই আলমের তিনটি প্লাটুনকে তিনটি নির্বাচিত স্থানে অ্যামবুশ রচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। চান মিয়া (খায়রুল কোম্পানীর) তার প্লাটুনসহ রেল লাইনের পশ্চিম পাশে অবস্থান নেয়। রেল লাইনের পূর্ব পাশে লাল মিয়া তার প্লাটুন নিয়ে অ্যামবুশে থাকে। এই দুইটি প্লাটুন কুড়িগ্রাম থেকে চিলমারীর দিকে সম্ভাব্য আগমনকারী পাক রি-ইনফোর্সমেন্টকে বিধ্বস্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং অনুরূপভাবে চিলমারী থেকে পলায়নপর পাকসেনা, ইপিক্যাপ, রাজাকার ইত্যাদিকে বন্দি করার দায়িত্ব এদের উপর অর্পণ করা হয়। প্লাটুন কমান্ডার রাজুকে সবচেয়ে ঝঁকিপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে এই দুই প্লাটুনের অগ্রভাগে প্রায় আধা মাইল দূরত্বে কুড়িগ্রামের দিকে নিয়োজিত করা হয়। অর্থাৎ যে কোন আক্রমণের প্রথম ধাক্কা রাজুর উপর পড়ার ঝুঁকি ন্যস্ত হয়। রাজু প্লাটুন নিয়ে তার অ্যামবুশ পজিশনের আওতায় রেল লাইনের নীচে এন্টিট্র্যাংক মাইন বসিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে চিলমারীর অপারেশন শুরু হয়ে যাওয়ার ব্যারি পিস্টলের সবুজ আলোর সংকেত ছেলেরা দেখতে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে



www.amarboi.org

ওঠে। প্রচন্ড গোলাগুলির আওয়াজও উলিপুরে আসতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সবার মুখ আশার আলোয় জ্বলে উঠে। সর্বস্তরের এলাকাবাসীর উদ্যম ও শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। হঠাৎ সমস্ত ভয়ভীতি যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। বেলা সাড়ে বারটায় কুড়িগ্রাম থেকে পাক রি-ইনফোর্সমেন্ট, রসদ ও হাতিয়ার বোঝাই ট্রেন এন্টি ট্র্যাংক মাইনের উপর উঠার সাথে সাথেই প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। একটি বগিসহ ট্রেনের ইঞ্জিন তৎক্ষণাৎ উল্টে পড়ে গেল। পেছনের বগির পাক সেনারা ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে সামনের বগির আহতদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো রাজুর প্লাটুনের সাথে সামনা সামনি লড়াই। দুই কোম্পানী পাক বাহিনীর সাথে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাজু খুবই কঠিন অবস্থায় পতিত হলো। ত্বরিত সিদ্ধান্তে তাৎক্ষণিক ভাবে লাল মিয়া ও চান মিয়াকে অ্যামবুশ থেকে তুলে রাজুর সাহায্যে আনা হল। অনেক উন্নত অস্ত্র সজ্জিত দুই কোম্পানী পাক সেনার বিরুদ্ধে নিম্ন মানের অস্ত্র নিয়ে এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাদের অসম লড়াই চলতে থাকে। কাভারের খোঁজে মুক্তিযোদ্ধারা অনেকে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। আহত এবং গুলি বিহীন অবস্থায় ও বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আত্মগোপন করে জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়। উঁচু ভূমি থেকে আক্রমণ করার কারণে পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিকাল সাড়ে চারটার দিকে কুড়িগ্রাম থেকে একটি রেসকিউ ট্রেন এসে বিরামহীন ফায়ার কাভারের আড়ালে মৃত এবং আহত পাক সেনাদের নিয়ে কুড়িগ্রাম ফিরে যায়। ক্রমাগত দুই দিনের বিরামহীন যুদ্ধ ময়দানে অবস্থান এবং যুদ্ধ করায় আলম কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধারা কোন রকম আহার ও বিশ্রামের ফুরসত পায়নি। শত্রু পশ্চাদপসরণ করায় এরাও দারুনভাবে ক্লান্ত,অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থাতেই তাদেরকে সানন্দবাড়ী হেডকোয়ার্টারে উইথ্‌ড্র করা হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসা, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। উলিপুরের এই দুর্ধর্ষ অপারেশনে পূর্বে বর্ণিত ৬ জন শহীদ ছাড়াও যারা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে যুদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে, চান মিয়া, লাল মিয়া, রাজু, মকবুল হোসেন, সাইফুল আলম, সেলিম মিয়া, মোক্তার, মালেক, বাচ্চু মিয়া, রহমান মিয়া, নুরুজ্জামান, গোলাম মোস্তফা, খালেক মিয়া, শাহাবুদ্দীন, আবদুর রশিদ, বাতেন, ইউসুফ আলী, ছোট আবদুর রশিদ এর নাম এই জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। এদের মধ্যে অনেকেই এই যুদ্ধে আহত হয়েছিল। মুক্তির সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান চিরস্মরণীয়।


www.amarboi.org

# চিলমারীর অভিযানের স্কেচ

www.amarboi.org

## মূল অভিযান

নরম্যান্ডি ল্যান্ডিংয়ের সামগ্রিক বিশালতার সাথে চিলমারী ল্যান্ডিংয়ের তুলনা করাটা বালখিল্যতার পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হতেই পারে। তবু অনেক সমরবিদদের মতে চিলমারী ল্যান্ডিং এর অপারেশনাল হ্যাজার্ড বেশী ঝুঁকিপূর্ণ এবং সামরিক বিবেচনায় একটি অকল্পনীয় অভিযান ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দু'মাসের মধ্যেই রৌমারী থানা, বর্তমান রাজিবপুর থানা এবং এ থানাসমূহের অন্তর্গত অসংখ্য চরাঞ্চল নিয়ে আমাদের প্রায় ৭০০ বর্গমাইল আয়তনের একটি স্বাধীন এলাকা গঠিত হয়ে গিয়েছিল। এই চরাঞ্চল গুলো ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব কুল ঘেঁসে। আরও পূর্বে ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্য। চিলমারীর অবস্থান ছিল এ মুক্তাঞ্চল থেকে সরাসরি ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে অর্থাৎ প্রবল প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদ এ চরাঞ্চলকে হানাদার বাহিনীর জন্য এমন একটি দূরতিক্রম্য শত্রু অবস্থান ছিল যা তাদের গলায় ফাঁসা কাঁটার মত। ঠিক অনুরূপ ভাবে মুক্তি বাহিনীর পক্ষে ও ঐ প্রবল স্রোতস্বী নদের স্থানে স্থানে দশ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত উত্তাল ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে চিলমারীর মত সুরক্ষিত ঘাঁটির উপর কোন আক্রমণ পরিচালনা করা বাস্তবেই একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক, কারণ এতে গেরিলা যুদ্ধের প্রায় কোন এলিমেন্টই ছিল না। তার উপরে আমাদের না ছিল কোন গানবোট, ল্যান্ডিং ক্র্যাফট, পেট্রোলবোট ইত্যাদি যা নদী পথে যে কোন অপারেশনের জন্য নিতান্তই অপরিহার্য। আমাদের ছিলনা পশ্চাদ ভূমি থেকে ফায়ার কাভারের কোন ব্যবস্থা। যুদ্ধাভিযানের ২ দিন পূর্বে ৯৫তম মাউন্টেন ব্রিগেড এ অভাবটি পূরণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছিল। বস্তুতপক্ষে আমাদের কি ছিলনা সে বর্ণনা না দিয়ে বরং আমাদের কি ছিল সেটুকু বললেই এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের বাস্তবতা সহজ ভাবে উপলব্ধি করা যাবে। চিলমারী ল্যান্ডিং এ ছিল আমাদের অসীম মনোবল কিছু হালকা হাতিয়ার আর জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। এ অভিযানের জন্য বিভিন্ন টার্গেটের এবং সময়ে সময়ে যতগুলো দেশী নৌকার ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল তাই করা হয়েছিল। শত্রু বাহিনীর উপরে গেরিলা আক্রমণ করা ছাড়াও আরও একটি বিপজ্জনক সম্ভাবনা আমাদেরকে এই অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য করে। হানাদার বাহিনীর কাছে তৎকালীন পূর্ব পাস্তিানের অভ্যন্তরে এমন একটি সুরক্ষিত এবং দূর্ভেদ্য মুক্তাঞ্চলের অস্তিত্বই অগ্রহণযোগ্য ছিল। তাই তারা চিলমারীতে অল্প সময়ের মধ্যে ৬টি সু-রক্ষিত ঘাঁটি নির্মাণ শুরু করে। সামরিক নৌযান চলাচলের জন্য একটি সুদৃঢ় ল্যান্ডিং বেস তৈরী করে। এবং ইতিমধ্যেই রংপুর থেকে ট্রেন যোগে ও চট্টগ্রাম থেকে



www.amarboi.org

নৌপথে ভারি কামান, গোলা বারুদ ও রসদ আসতে থাকে। আমরা এমনিতেই একাধিক সংকট কবলিত ছিলাম। কেননা আমাদের স্বাধীন অঞ্চলটি মিত্রবাহিনীর কাছেও কিছুটা আপত্তিকর ছিল। আমরা মুক্তাঞ্চলে ট্রেনিং দেওয়া গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য কিছু হাতিয়ার, গোলাবারুদ এবং রসদ সামগ্রি জেনারেল জি.এস. গিলের সৌজন্যে পেয়েছিলাম। ১০১ কম্যুনিকেশন জোন এর জিওসি লেঃ জেঃ গিল খুব উৎসাহ নিয়ে এ স্বাধীন অঞ্চল পরিদর্শনের সময় এই উদারতা দেখিয়েছিলেন। তিনি অতিশয় যোগ্য এবং করিৎকর্মা জেনারেল ছিলেন। এ ছাড়াও খন্ডযুদ্ধ, ছোট বড় অ্যামবুশ ও রেইডের মাধ্যমে যে হাতিয়ার সংগ্রহ করা হয়েছিল লোকাল ট্রেইন্ড ছেলেদের ঐ সব অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে বাস্তবতার নীরিখে চিলমারী রেইডের পুরো পরিকল্পনা জিয়াউর রহমানের দিকনির্দেশনা এবং ওয়ার প্ল্যান মতে ছককাটা ও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিনক্ষণও সেভাবে ১৬/১৭ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়। দুঃখের বিষয় সিলেট অঞ্চলের ৪নং ও ৫নং সেক্টর দু'টির নাজুক অবস্থা সামাল দিতে কর্ণেল ওসমানী স্বয়ং অক্টোবরের ৫ তারিখে তেলঢালা এসে জেড ফোর্সকে তাৎক্ষণিক সিলেট মুভ করার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় মেজর জিয়া তেলঢালা জেড ফোর্স এবং ১১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার গুটিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন। ১ এবং ৮বেঙ্গল সরাসরি মুভমেন্ট শুরু করে। মেজর জিয়ার নির্দেশে ৩ বেঙ্গলের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর শাফায়াত জামিল ১০অক্টোবর ১১নং সেক্টরের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম মহেন্দ্রগঞ্জের সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহেরের কাছে হস্তান্তর করে এবং সেদিনই সিলেট অভিমুখে যাত্রা করেন। মেজর জিয়া নিজেই মুক্তাঞ্চলের পূর্ণ দায়িত্ব স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লার উপর ন্যস্ত করে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক চিলমারী অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে জেড ফোর্স নিয়ে সিলেট মুভ করেন। কর্ণেল ওসমানীও সঙ্গে যান।

অসীম রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও আমাদের কাছে এই অপারেশন ছিল জীবন মরণ সমস্যার মতো। হয় যুদ্ধ করে জয়ী হতে হবে অথবা মরতে হবে নয়তো বিনা যুদ্ধে এই স্বাধীন এলাকা ত্যাগ করে পুরো অঞ্চলের জনবসতি এবং এখানে নিরাপদ ভেবে যে হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে হানাদারদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে মেঘালয়ে আশ্রয় নিতে হবে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে আমরা সবেধন নিলমনি একমাত্র মুক্তাঞ্চল হারিয়ে এতিম হয়ে যেতাম। তাই জিয়াউর রহমানের দিকনির্দেশনা এবং ওয়ার প্ল্যান মতে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিখুঁত করা হয়। মিত্র বাহিনীর সহায়ক সেক্টর (এফ. জে. সেক্টর) তাদের গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে আমাদের প্রস্তুতি



www.amarboi.org

সম্পর্কে অবগত হয়। ঐ সেক্টরের মেজর মুখার্জি এবং অপর আর একটি অফিসারসহ আমার মানকাচর ক্যাম্পে আসে এবং আমাদের এ অভিযান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শে আমার বিচলিত হওয়ার কোন কারণ ছিলনা বরং এ রকম পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক জেনেই আমরা এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং সত্যিকার অর্থে স্বাধীন জাতি হিসাবে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে হলে নিজেদেরকেই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে। প্রবাসী সরকারের সঙ্গে সমঝোতার শর্তে মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে আমরা কোন প্রকার ভারী অস্ত্র, ম্যাপ এবং সিগন্যালের সরঞ্জামাদী পেতাম না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা সন্তোষজনকই ছিল বলা যায়। থানা পর্যায়ে আমাদের একটি প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল ফলে একটি রাজস্ব আয় ব্যয় এর ব্যবস্থা থানা প্রসাশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। মুক্তি যোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যয়ও এই তহবিল হতেই করা হত। মূলতঃ হাট, ঘাট,বাজার, জলমহাল ইত্যাদি ছিল রাজস্ব আয়ের উৎস। এই অপারেশনে ব্যবহারিক ব্যয় এই আয় থেকে সংকুলান করা হয়েছিল। সুতরাং আমারা যুদ্ধ পরিকল্পনায় এ পয়েন্টটির যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলাম। বিশাল মুক্ত এলাকাটি আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। ঐ যুদ্ধের গেরিলা বাছাই করেছিলাম আনুপাতিক হারে চিলমারী, উলিপুর এবং মুক্ত এলাকার ছেলেদের সমন্বয়ে। সব কোম্পানী কমান্ডার এবং অধিকাংশ প্লাটুন কমান্ডার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষকদের মধ্য হতে নেওয়া হয়েছিল। আরো নিয়েছিলাম সাহসী কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তরুণ যারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং যারা আমার সেক্টরে এসেছিল বিভিন্ন সেক্টর থেকে পালিয়ে। কেননা তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল বৃহত্তর ঢাকা ও বিক্রমপুরের ছেলে এবং তাদের অনেকে আবার বিভিন্ন সমাজবাদী রাজনীতির ছাত্র/যুবসংগঠনের সদস্য হিসাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় নিজেদের বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য। বিশেষ করে এই এলাকার তরুণ যোদ্ধারাও ট্রেনিং নেওয়ার পরে কোন অপারেশনের সুযোগ না পেয়ে অত্যাধিক অসহিষ্ণু হয়ে পরে। তাদের এই অসহিষ্ণু মনোভাব এবং যেনতেন প্রকারে যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ ও উদ্যম আমাদেরকে এ যুদ্ধে শক্তি যোগায়। ওদের ঐ রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনের অবস্থা আমাকে বিকল্প ভাবনার কোন অবকাশই দেয়নি। এ অভিযান পরিচালনায় যত না অভাব ছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশী সম্পদ ছিল যুদ্ধের জন্য ক্ষুধার্ত ঐ সব তরুণের প্রবল ইচ্ছা। প্রবাদ আছে যে, অসাধ্য সাধন করতে ইচ্ছাটাই বড় শক্তি। আমার আরও কতগুলো সুবিধা ছিল যেমন আমার সুবিস্তৃত এই যুদ্ধ অভিযানের আওতাভুক্ত এলাকায় গোপনে



www.amarboi.org

সহায়তা দানকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংগঠিত হয়েছিল যারা আমাদের টার্গেট সমূহের নিকটবর্তী এলাকার ছেলে। এরা গোপনে আমাদের যুদ্ধকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ, আহতদের অপসারণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মুক্তি যোদ্ধাদের আশ্রয়দান ইত্যাদি সহায়তা করার দায়িত্ব নিয়েছিল। সর্বোপরি জিয়াউর রহমানের যুদ্ধকৌশল,সার্বক্ষণিক কমান্ড এবং কন্ট্রোলই ছিল আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। আগেই বলেছি ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তাঞ্চল ছিল বিশাল বিস্তৃত। এটি ছিল চিলমারী বন্দরের ঠিক বিপরীতে ব্রহ্মপুত্র - যমুনার চরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। পূর্বে ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্ত। রৌমারী এবং রাজিবপুর থানা দুটি এই মুক্তাঞ্চলেরই অংশ ছিল। এ ছাড়া কালাসোনারচর, মোল্লারচর, পেয়ারেরচর, কর্তিমারী, ঘুঘুমারী, ঠাকুরেরচর, চরসৌলমারী, গোয়ালেরচর, বোয়ালমারী, ছালিয়াপাড়া, হাজিরচর, কোদালকাটি, গাজীরচর, রাণীগঞ্জ, চরসাজাই, কামারজানি, হরিপুর, অনন্তপুর ইত্যাদি মুক্তাঞ্চলের অংশ ছিল। গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য মেজর জিয়া এই মুক্তাঞ্চলের রৌমারী ও রাজিবপুরে দু'টি বিশাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। জিয়াউর রহমান ১০ অক্টোবর '৭১ তার ব্রিগেড (জেড ফোর্স) নিয়ে তেলঢালা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ড নিজ হাতে রেখেছিলেন এবং সমস্ত নির্দেশাবলী তাঁর কাছ থেকেই আসত। হঠাৎ করে একদিন এফ.জে. সেক্টর থেকে একটি পত্র পেলাম যে এখন থেকে মুক্তিযোদ্ধাগণ অপারেশনের সময় সপ্তাহে মাথাপিছু ৭টি করে গুলি পাবে, নতুন করে কোন হাতিয়ার পাবেনা। এমন হঠকারিতাও সময়ে আমাদেরকে হজম করতে হয়েছে। এ বিষয়ে আমি মোটেও কোন উচ্চবাচ্চ করলাম না। তবে আমার জন্য নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারে লেঃ জেনারেল জি.এস. গিল এর বদান্যতা, জিয়াউর রহমনের দৃঢ় নেতৃত্ব এবং ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের সমূহ সক্রিয় সম্পৃক্ততা আমাকে নিশ্চিত করেছিল যে এই অপারেশনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার গোলাবারুদ নিয়ে আমাকে ভাবতে হবেনা।। বাস্তবেও আমার কোন সমস্যা হয় নাই। আক্রমণ অভিযানের ফরমুলা অনুয়ায়ী আমি মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা শত্রু সংখ্যার তিনগুন নির্ধারণ করি এর প্রতিটি সেক্টর ট্রেইন্ড কোম্পানীর ২৫ ভাগ যোদ্ধাকে শুধু গ্রেনেড সজ্জিত করি এবং বাকিদেরকে হালকা হাতিয়ার এবং কমান্ডারকে একটি এলএমজি/ কারবাইন/অটোমেটিক রাইফেল সজ্জিত করি। এই বাহিনীগুলোকে শত্রুর মূল ঘাঁটির আশে পাশে ছোট ছোট চৌকি লোকাল মিলেশিয়া / রাজাকার / আলবদর নিয়োজিত প্লাটুন এবং ইপি ক্যাপদের ঘাঁটি আক্রমণের জন্য নিখুঁত ব্রিফিং করা হয়। জেড ফোর্স কমান্ডার চলে যাওয়ার সময় তিনি আমার কাছে ৩ বেঙ্গলের একটি সুসজ্জিত



www.amarboi.org

রেগুলার প্লাটুন রেখে গিয়েছিলেন  নায়েব সুবেদার মান্নানের চার্জে। মুক্তাঞ্চলে ৩য় বেঙ্গলের একটি ৩ ইঞ্চি মর্টার ব্যাটারিও রেখে গিয়ে ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে লেঃ জেনারেল জি.এস. গিল তার রৌমারী পরিদর্শনের সময় এই লোকাল ট্রেইন্ড ছেলেদের উৎসাহ উদ্দিপনা দেখে তাদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও গোলা বারুদের সিংহভাগ মিটিয়েছিলেন। এমনকি ৫০ টাকা করে মাসিক ভাতারও ব্যবস্থা করেছিলেন। বাকি প্রয়োজন ৯৫তম ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডীয়ার জেনারেল এইস.এস. ক্লেয়ার মিটিয়েছিলেন। আমি এই যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রারম্ভেই প্রায় ৮ টার মতো কোম্পানীকে এল. এম.জি, এস.এল.আর, প্রপেল্ড গ্রেনেড, ২ ইঞ্চি মর্টার সজ্জিত অবস্থায় রেখেছিলাম। এদের দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছিল চিলমারী এলাকার ৬ টি সুরক্ষিত শত্রু ঘাঁটি যথা (১) রাজারভিটা মাদ্রাসা- ফিল্ড কমান্ডার নজরুল ইসলাম আলো (২) বালাবাড়ী রেলস্টেশন- ফিল্ড কমান্ডার রবিউস সামাদ (৩) বালাবাড়ী রেলওয়ে সংলগ্ন ব্রীজ - ফিল্ড কমান্ডার আব্দুল জোব্বার (৪) থানাহাট স্থিত পুলিশ স্টেশন- ফিল্ড কমান্ডার সোলায়মান (৫) জোড়গাছ স্কুল - ফিল্ড কমান্ডার এ.টি.এম. খালেদ দুলু (৬) চিলমারী ওয়াপদা বাংকার - নায়েব সুবেদার আব্দুল মান্নান। ওয়াপদার পাকা ভবনটিকে কেন্দ্রে রেখে চতুর্পার্শ্বে নির্মিত কংক্রিটের বাংকার নির্মাণ করে পাক বাহিনী মিডিয়াম রেঞ্জ গান এবং চতুর্দিক ঘিরে হেভি মেশিন গান, লাইট মেশিন গানসহ বিবিধ অস্ত্রের সমাহারে ঘাঁটিটিকে একটি দূর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল বলে সংবাদ ছিল। আমাদের অপারেশনের সময় কুড়িগ্রাম থেকে যাতে পাক রিইনফোর্সমেন্ট আসা প্রতিহত করার জন্য একটি কোম্পানিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল চিলমারী থেকে ১০ মাইল উত্তরে উলিপুরে। উলিপুরে তাদের মিশন ছিল রেল লাইন, রোড ব্রিজ, কালভার্ট, টেলিকম্যু-নিকেশন লাইন ইত্যাদি ধ্বংস করা যাতে করে শত্রু সহসা আমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসতে না পারে। এদেরকে অপারেশনের দু'দিন আগে পাঠানো হয়। আমরা যেমন চিলমারী এলাকার শত্রু ঘাঁটিসমূহ ধ্বংসের পরিকল্পনা করছিলাম; শত্রু বাহিনীর তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এবং আমার মুক্তাঞ্চল দখলের জন্য সেনা ও অস্ত্র মজুদ বাড়িয়ে চলছিল। সে কথা আগেই বলেছি। ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে বিধায় আমাদেরকে আক্রমণ করা এবং আমরা তাদের আক্রমণ করা উভয়ের পক্ষেই সমপরিমাণ ঝুঁকি ছিল। এর আগে জেড ফোর্স ছালিয়াপাড়া ও কোদালকাটির দুটি যুদ্ধ অভিযানে শত্রুপক্ষকে যথাযথভাবে পরাস্ত করে এবং তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। '৭১ এর ৪ অক্টোবর কোদালকাটির দ্বিতীয় যুদ্ধে তারা এমন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাভূত হয় যে পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া



www.amarboi.org

পুনরায় আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার সুক্ষ্ম সামরিক কৌশলটি এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই রচনা করেছিলাম। শত্রুবাহিনীর পক্ষে একথা ভাবা প্রায় অসম্ভব ছিল যে অসংখ্য ছোট বড় চরবেষ্টিত প্রায় ৬/৭ মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদ দেশী নৌকায় অতিক্রম করে চিলমারী ল্যান্ডিং-এর মতো একটি অপারেশন পরিকল্পনা করতে পারে মুক্তিসেনারা।

মুক্তাঞ্চল দখলের পরিকল্পনা হিসাবে তারা চিলমারীর ঘাঁটিগুলির শক্তি বৃদ্ধিকল্পে রংপুর থেকে ট্রেনযোগে এবং চট্টগ্রাম থেকে নৌবহরের মাধ্যমে প্রচুর গোলাবারুদ হাতিয়ার সৈন্য এবং রসদের আনা নেয়া শুরু করে দিয়েছিল। আমাদের অনুসন্ধানী দলগুলোর সর্বশেষ খবর থেকে এ ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়। চিলমারীর শত্রু বাহিনীর প্রধান ঘাঁটিটি ছিল চিলমারী ওয়াপদা ভবনে। ইতিমধ্যে তারা মুক্তাঞ্চল তাক করে কয়েকটি পয়েন্টে ভারী কামান মোতায়েন করে। এ ছাড়া ওয়াপদা ভবনের অভ্যন্তরে বড় আকারে দূর্ভেদ্য কংক্রিট বাংকার নির্মাণ করে এবং এখানে দীর্ঘদিন প্রতিরোধের জন্য রসদ ও গোলাবারুদ মজুদ করে। ওয়াপদা ঘাঁটিটির চারপাশ দিয়ে উঁচু বালুর বস্তা দিয়ে সুরক্ষিত করে। এ সব খবর আমরা আমাদের রেকি পার্টির মারফত প্রতিনিয়ত পেতে থাকি। এ ছাড়া অন্যান্য ৫টি ঘাঁটি যথা রাজারভিটা মাদ্রাসা, থানাহাটে চিলমারী পুলিশ স্টেশন, বালাবাড়ী রেল স্টেশন, জোড়গাছ স্কুল, এবং রেলওয়ে ব্রিজের প্রতিরক্ষা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছিল। এ সাথে চিলমারী বন্দরে দ্রুতগামী গানবোট এবং চরে অবতরণযোগ্য ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্টও মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর আসে। এ সব কাঁচা ইন্টেলিজেন্সের উপর শত ভাগ নির্ভর করা যায় না। তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে শত্রুর রৌমারী দখল অভিযান সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের কাছে তখন আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। আক্রমণের ঝুঁকির সম্ভাব্য পরিণতির খারাপ দিক বিবেচনা করলে আমাদের বিচলিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। আমাদের পরিকল্পনার খবর মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে গোপন করার সুযোগ ছিল না এবং এফ.জে. সেক্টর প্রথম থেকেই এ পরিকল্পনার বিপক্ষে ছিল। তারা আগেই প্রকাশ করেছিল যে স্বাধীনভাবে আমরা সংগঠিত হই কিংবা আমরা সুরক্ষিত মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করি এটা তাদের সামরিক কৌশলের আওতাভুক্ত ছিল না। বস্তুতঃ তারা হয়ত এর বিরোধী ছিল। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে একজন মিত্রবাহিনীর অফিসার আমার ক্যাম্পে আসেন এবং একখানি নিমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেন। আমি নিমন্ত্রণ পত্রটি খুলে বেশ অবাক হই। নিমন্ত্রণ পত্রটি একটি ডিনারের, বেশ কেতাদুরস্ত



www.amarboi.org

ভাবে সাজানো। মেঘালয় রাজ্যের দুর্গম বন-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে সভ্যতার কোন আলামতই নেই, সেখানে এই ডিনারের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে আমি হতবাকই হলাম। নিমন্ত্রণ পত্রটি এসেছে ৯৫তম মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডিং অফিসার জেনারেল হরদেব সিং ক্লেয়ারের তরফ থেকে। আমি অফিসারকে প্রশ্ন করলাম তোমাদের ঘাঁটিতে যাওয়ার ব্যবস্থা কি ? অফিসারটি বিনয়ের সাথে বলল যাতায়াতের এস্কর্ট ব্যবস্থা তারা করেছে। নির্ধারিত দিনে সেখানে গেলাম। গভীর জঙ্গলের ভিতরে বিশাল বিশাল তাবু ফেলে শক্তিশালী জেনারেটরের সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করে যথাসম্ভব নিখুঁত একটি আর্মি গ্যারিসন। আমার কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় কর্ণেল ব্রার (পরে স্বর্ণ মন্দির আক্রমণ খ্যাত) লেঃ কর্ণেল কুলকার্ণি, এবং আরো বেশ কয়েকজন মিডল র‌্যাংক অফিসারের সংগে। পরিচয় পর্ব শেষে জেনারেল ক্লেয়ার কিছুটা নিভৃতে আমাকে পাশে নিয়ে বসলেন। আগে থেকেই বোধহয় ঐ রকম ব্যবস্থা ছিল। তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন যে, জানো না তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি কত উদগ্রীব ছিলাম। আমি জেনারেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝার চেষ্টা করলাম, এটা কি পোশাকী ভদ্রতা না কোন কুটকৌশল। তিনি কোন রকম ভনিতার অবতরণা না করেই আমাকে বললেন আমিসহ আমার ব্রিগেডের অফিসারগণ মনে করে তুমি যে অভিযানের পরিকল্পনাটি করেছ সে রকম অভিযান বাস্তবায়ন আসলেই দূরূহ। তার কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল নিশ্চয়ই এটা এফ.জে.সেক্টরের দাশ/মুখার্জিদের আমাকে চিলমারী অপারেশন থেকে বিরত রাখার কুটচাল। পরক্ষণেই আমার ভুল ভাঙ্গল। যখন তিনি বললেন, তোমার সংগে এ ব্যাপারে আলাপ করে আমরা সবাই জান্‌তে আগ্রহী যে কি শক্তির উপর ভিত্তি করে তুমি এটি করেছ এবং তোমাকে আমাদের আগ্রহের কথাটাও জানাতে চাচ্ছি। আমরা তোমার এ অভিযানে শরীক হব। উত্তরে আমি বলেছিলাম তোমাদের আগ্রহ আমার জন্য আশীর্বাদ তবে আমার ছোট ২টি প্রশ্ন আছে প্রথমত আজ অবধি যতগুলি অপারেশন করেছি তার কোনটাতেই মিত্রবাহিনী অংশী হয় নাই ; বলতে পারো এটা আমার অজ্ঞতা যে গেরিলা অপারেশনে মিত্রবাহিনীকে অংশিদার হিসাবে পেতে পারি। দ্বিতীয়তঃ তেমরা কি ইতিমধ্যে কোন মুক্তিবাহিনীর গেরিলা অপারেশনে অংশ নিয়েছ? তিনি হেসে বললেন কেন মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের কামালপুর এর প্রায় প্রতিটি আক্রমণে আমরা অংশ নেই। তবে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার প্রয়োজন তেমন একটা হয়না। তোমার ক্ষেত্রে সীমান্ত অতিক্রম এর ব্যাপার আছে। আমি সহজ ভাবে এ সুযোগে বললাম ভারত সরকারের জন্য এ রকম অংশ গ্রহণ যে



www.amarboi.org

বিব্রতকর হতে পারে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দি হলে যে বিরূপ পাবলিসিটি হবে তার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের উভয়ের উপরই বর্তাবে। তার চেয়ে বেশী ভাল হয় তোমরা যদি কামালপুর স্টাইলে নদীর ঐ পাড়ের সর্ব নিকটবর্তী মুক্তাঞ্চলের সুবিধা জনক চরসমূহ থেকে আর্টিলারী সাপোর্টের ব্যবস্থা কর এবং আমরা যুদ্ধে জয়ী হওয়ামাত্র তোমরা যান্ত্রিক নৌযানে সদলবলে চিলমারীতে পদার্পণ করতে পারবে। জেনারেল ক্লেয়ার একমত হলেন। এবং ১৫ অক্টোবরেই তিনি ধুবরী বেইস্‌ড ফ্লোটিলা থেকে যুদ্ধ উপযোগি যান্ত্রিক জলযান তার ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে মানকারচর তীরবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদে নোঙর করে রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সমঝোতা অনুযায়ী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতার আলোকে আমি এই প্রস্তাবটি দেই। জেনারেল ক্লেয়ার একজন খাঁটি প্রফেশনাল এবং উদারমনা যোদ্ধা ছিলেন। তিনি আমার যুক্তির প্রতি ঐক্যমত পোষণ করে তাতে রাজি হলেন। নির্বাহী অফিসার পর্যায়ে ভারী অস্ত্র মোতায়নের খুঁটিনাটি এবং কো-অর্ডিনেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অয়্যারলেস সেট সরবরাহের ব্যবস্থা হল। ছালিয়াপাড়া এবং গাঙ্কির চরে দুইটি ভারী কামান ও চারটি মর্টার, অপারেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে পজিশন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো। ঐ গুলো আমাদের নিজস্ব ৩ ইঞ্চি মর্টারের অতিরিক্ত। এটাও ঐক্যমত হল যুদ্ধ জয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের তৎপরতা আমার স্বাধীন এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কোন ক্রমেই মূল ভূ-খন্ডের মধ্যে অর্থাৎ শত্রু অধিকৃত এলাকায় যাওয়া যাবে না।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে চিলমারী ল্যান্ডিং-এর খুঁটিনাটি বিষয়সহ মূল পরিকল্পনার সিংহভাগ কাজ শেষ করা হয়। আমার অভিযান কালের সার্পোটিং কার্যবলীরও খুঁটিনাটি মোটামুটি একটি আলাদা পরিকল্পনার আওতায় চূড়ান্ত করি। এসবের মধ্যে যুদ্ধাহতদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট, গজ ব্যান্ডেজ, স্টেরিলাইজড করা গামছা, ধুতি কাপড় এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বাজার থেকে সংগ্রহ করি। যদিও কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে বিদেশ থেকে যুদ্ধাহতদের চিকিৎশার জন্য সার্জারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধসহ অন্যান্য উপকরণ প্রচুর এসেছিল বলে শুনতাম। আমাদের সেক্টর ডাক্তার অমিয়বাবু আমার কাছে অনুনয় করে বলে যে সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান এবং তার নিজেরও অমন (ক্রিটিকাল ওয়ার জোন ফিল্ড ক্যাম্প হসপিটাল) Critical war zone field camp hospital এ কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও মনোবল নাই। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সমস্যা না



www.amarboi.org

বাড়িয়ে আমি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সাজুকে টিম ইনচার্জ নিয়োজিত করলাম। টিমে মেডিক্যাল ছাত্র মতিউর রহমানও ছিল। (বর্তমানে দুইজনই ডাক্তার) মেডিক্যাল টিমে বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এরা আমাদের সাথে যুদ্ধাভিযানে যোগ দেয়। জরুরী রেশন হিসাবে ৩ বস্তা চাউল, ৩ বস্তা চিড়া, ২ বস্তা চিনি এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিস্কুটের বাক্স মজুদ করা হয়। রাতের আঁধারে নিঃশব্দে ল্যান্ডিং পর্ব সফল করার জন্য ৫০/৬০টির মতো দেশী বড় বড় নৌকা এবং দক্ষ মাঝিমাল্লাসহ যারা আঁধারে ৫/৬ মাইল প্রশস্ত নদী বিক্ষিপ্ত চরাঞ্চলের অভ্যন্তর দিয়ে সময় মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম সে রকম আয়োজন করা হয়। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য ৩৫ ভাগ ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অস্ত্র সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধা, ৪০ ভাগ বাংলাদেশে ১১ নম্বর সেক্টরের ট্রেনিং ক্যাম্পসমূহে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং পূর্ববর্তী আক্রমণসমূহে দখল করা শত্রু পক্ষের হাতিয়ার এবং প্রচুর পরিমাণে ৩৬ H.E এইচ.ই গ্রেনেড সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধা, বাকি ২৫ ভাগ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা পূর্বাহ্নেই এলাকা ভিত্তিক নিজস্ব সংগ্রহের বন্দুক, পিস্তল এবং আমাদের দেয়া গ্রেনেডসহ অবস্থান নেয়ার পরিকল্পনা করা হল। এ ছাড়াও নায়েব সুবেদার মান্নানের নেতৃত্বেও চাইনিজ অস্ত্রসজ্জিত একটি প্লাটুন ওয়াপদা এবং জরুরী উইথড্রয়ালের কাভারের জন্য নির্ধারিত করা হল এবং এটাও নির্ধারণ করা হল যে আমাদের ল্যান্ডি-এর নির্দিষ্ট সময়ে ছালিয়াপাড়া ও গান্ধির চরে পূর্ব নির্ধারিত লোকেশনে কামান ও মর্টার স্থাপিত হবে। ১৬ অক্টোবর ১৯৭১, অপরাহ্নে মূল অভিযান শুরু করে ১৭ অক্টোবর ভোর রাত ২টা ৩০ মিনিটে ল্যান্ডিংয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হল। এ উদ্দেশ্যে আগেই আমাদের ল্যান্ডিং স্পট গাজীর চরে নিরাপদ এলাকা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আমাদের রাত্রিকালীন সংকেতের মাধ্যমে ল্যান্ডিং নিরাপদ হবে এর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ১১ অক্টোবর থেকে আমাদের অভিযান এর প্রাথমিক কার্য পরিক্রমা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৫ অক্টোবর খায়রুল আলমের (আসল নাম ঃ নজরুল ইসলাম) নেতৃত্বে একটি কোম্পানী ডেমোলিশন এবং এক্সপ্লোসিভে একটি দক্ষ প্লাটুনসহ উলিপুরে সড়ক এবং রেল যোগাযোগ ধ্বংস করে যে কোন Reinforcement (রি-ইনফোর্সমেন্ট) প্রচেষ্টা অ্যামবুশ করার দায়িত্ব দিয়ে উলিপুরে পাঠিয়ে দেয়া হল। আলমের কোম্পানীর ঐ অপারেশনের পূর্ণ বিবরণ আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে উলিপুরের ব্যাপক অপারেশনের অংশ বিশেষ এখানে পুনরুক্ত হল মাত্র। ১৬ অক্টোবর রাতের চিলমারী রি-ইনফোর্সমেন্টের জন্য কুড়িগ্রাম থেকে আগমনরত হানাদার বাহিনীর একটি



www.amarboi.org

ট্রেনের ওয়ার্নিং বগি এন্টি ট্যাংক মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। সেই ট্রেনে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও কমব্যাট ফোর্স ছিল। শত্রু সেনারা সাথে সাথে তাদের উন্নতমানের অস্ত্রের সাহায্যে আলম কোম্পানীর ওপর আক্রমণ চালায়। পালটা পালটি তুমুল আক্রমণ চলে । এরই মধ্যে জানা গেল কুড়িগ্রাম থেকে একটি রেসকিউ ট্রেন শত্রু সেনাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। তারা উন্নত ফায়ার কাভারের আড়ালে হতাহতদের নিয়ে কুড়িগ্রাম ফিরে যায়।

এদিকে মূল রণক্ষেত্র চিলমারীর ৬টি টার্গেটের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপগুলোকে আমাদের প্রত্যেকটি টার্গেট নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে ছড়ানো (ডিসপার্সড) অবস্থায় মোতায়েন রাখা হয়েছিল। নায়েব সুবেদার মান্নানের দায়িত্ব আগেই নির্ধারিত থাকায় সে নিকটবর্তী দ্বীপে অবস্থান নিয়েছিল। রাত ৪টার আগেই সে ওয়াপদার শক্তিশালী শত্রু ঘাটির চারপাশে কৌশলগত অবস্থান দৃঢ় করে। ১৬ অক্টোবর দুপুরের পর থেকেই আমাদের মূল Assault কোম্পানীগুলো ছালিয়াপাড়া অভিমুখে পৃথক পৃথক ভাবে যাত্রা শুরু করে। সন্ধ্যার আগেই আমরা আমাদের টার্গেট এরিয়ার সর্ব নিকটবর্তী দ্বীপ গান্ধীরচরে অবস্থান নেই। পূর্বের স্থিরকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী সকাল থেকেই বড় বড় দেশী নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। নৌকার মাঝি-মাল্লাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং এদের নদীপথে নেভিগেশনের দক্ষতা যাচাই করে নেয়া হয়। আমরা রাত ৮ টার কিছু পরে ব্রহ্মপুত্র যখন গাঁঢ় আঁধারে নিমজ্জিত, তখন আমাদের (লঞ্চিং) Launching ঘাঁটি গান্ধীরচর থেকে সবার ঘড়ির কাটা মিলিয়ে ল্যান্ডিং স্পট গাজীরচরের দিকে রওয়ানা হই। গান্ধীরচরের অবস্থান ছিল চিলমারীর পূর্বে অর্থাৎ রৌমারীর নিকটস্থ সর্ব পশ্চিম প্রান্তে মুক্তাঞ্চলের একটি দ্বীপ। ১৫ তারিখেই আমাদের গাইডের সহায়তায় ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের সৈন্যরা ক্যাপ্টেন সিঁধু সিং এর তত্ত্বাবধানে এই দ্বীপের অপেক্ষাকৃত শক্ত প্লাটফর্মে কামান ও মর্টার স্থাপনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে দেখে আমি ও সিঁধু উভয়েই সন্তুস্ট হই। প্রধান এ্যসল্ট কমান্ড সমূহ থেকে প্রতিটি টার্গেটের বিপরীতে এলাকা সুপরিচিত এমন ৫জন করে ছোট ছোট টীম নিয়ে, কমান্ডার এম এ জোব্বার আমার সাথে পরামর্শ করে সকালের দিকে ছালিয়াপাড়া থেকেই চিলমারী গিয়ে আক্রমণের কৌশলগত পয়েন্টগুলি নির্দিষ্ট করে রাখে যাতে মূল ফোর্স রাতের আঁধারে গাজির চর RV-তে (মিলনস্থল) পৌছার সাথে সাথে সব গ্রুপকে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারে।

অপরদিকে রৌমারীর ক্যাম্পের আবুল কাশেম চাঁদ বেলা ১টা নাগাদ কিছূ সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একটি নৌকা যোগে উত্তরে ঠাকুরের চরের দিকে



www.amarboi.org

রওয়ানা হয়ে গেছে বলে পরে আমাকে জানান হয়। ২টি এডভান্স পার্টি আলাদাভাবে চিলমারীতে অবস্থান নেওয়াটা মূল অপারেশনের জন্য সুবিবেচ্য ছিল। চাঁদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় ওর সাথে ঘড়ির কাটা মিলান হয় নাই এবং অপারেশন জিরো আওয়ার যে ১৭ তারিখ ভোররাত ৪ টায় তাও সে জানতে পারে নাই। সে ৪টার আক্রমণের সময়কে ৫টায় ধরে ঠাকুরের চর থেকে রওয়ানা হয়েছিল বলে পরে অনেককে বলেছে। (সব যুদ্ধই রাত ৩/৪ টার মধ্যে শুরু করা নিয়মসুদ্ধ; কেননা ঐ সময় শত্রু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার কথা। ৫ টায় ভোরের আলো ফোটে; পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হয় তখন থেকেই যুদ্ধ স্তিমিত হতে থাকে)। চাঁদ ঠাকুরের চর থেকে রাত সাড়ে এগার/বারটার সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ১০ মাইল অভ্যন্তরে রানীগঞ্জ ইউনিয়নের বনগাঁও পৌঁছে। সে যুদ্ধ শুরুর সংকেত দেখতে পায় নাই, তবে বনগাঁও ওর আত্মীয়ের বাড়িতে পৌছেই ছেলেদেরকে চিলমারী পাঠিয়ে দিয়ে সে তার আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে যায়। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে সে মানকাচরে আমার কাছে রিপোর্ট করে।

যাইহোক পূর্ণ অস্ত্র সজ্জিত মূল এ্যসল্ট কমান্ড নিয়ে আমি অভিযানের সর্ব প্রস্তুতিসহ প্রায় ৫০ টি বড় নৌকায় নায়েব সুবেদার মান্নানের ফোর্স ব্যতিত বাকি ৫টি টার্গেটের যোদ্ধা, হাতিয়ার পত্র, রসদ, মেডিক্যাল টিমসহ ঠিক রাত ৮ টায় যাত্রা শুরু করলাম। প্রথমে উজানে অর্থাৎ উত্তর দিকে উলিপুর অভিমুখে প্রায় ১ঘন্টা অগ্রসর হয়ে নৌকার বহরটিকে ডান দিকে পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ উজানে কোনাকুনি বরাবরে এ মাঝিগণ নদী পারের যাত্রা শুরু করল। স্রোতস্বী ব্রহ্মপুত্রকে বাগে রেখে গন্তব্যে পৌছার এটাই লাগসই প্রযুক্তি। আমার নৌকাটিতে এডজুটেন্ট এবং এই যুদ্ধের জোড়গাছ স্কুল আক্রমণের অন্যতম কমান্ডার কাজিউল ইসলাম এবং মিত্রবাহিনীর ক্যাপ্টেন সিধুঁ সিং তার শক্তিশালী সিগনাল ইক্যুপমেন্ট সহ আমার সাথে ছিল। মর্টার এবং কামানের কন্ট্রোলও ওর দায়িত্বে ছিল। ৯৫তম মাউন্টেন ব্রিগেডের সাথেও সে যোগাযোগ রক্ষা করছিল। এই ধরনের সামরিক অভিযানে একজন কম্যান্ডারের মানসিক অবস্থা যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হয় আমার ও তাই হয়েছিল। বিশাল ঝুঁকি, শত শত তরুণ গেরিলা যোদ্ধা, হাজার হাজার গ্রামবাসীর জীবনের নিরাপত্তা, প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম এবং সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায় বিপদেরসমূহ সম্ভাবনার মধ্যে শত্রুর মূল ভূ-খন্ডে অ্যামবুশ হওয়ার পূর্ণ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যাত্রা করলাম। আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল আমার সঙ্গি মুক্তিযোদ্ধাগণ, অসংখ্য মাঝি-মাল্লা, স্বেচ্ছাসেবক এবং অসম সাহসী গ্রামবাসীগণ। অশান্ত ব্রহ্মপুত্র রাতের আঁধারে কি ভয়ালরূপ



www.amarboi.org

ধারণ করে তা শুধু ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারে। শত্রুসেনাদের গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যকলাপও আমাদের চিন্তার ভিতরে রাখতে হয়েছে। আমাদের নৌকার বহর রওয়ানা হওয়ার আগেই হঠাৎ এক দফা মর্টার এবং কামানের গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হলাম যা আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছালিয়া পাড়ার দিকে তাক করা হয়েছিল বলে মনে হল। আগেই বলেছি জেড ফোর্স ছালিয়াপাড়া শত্রু মুক্ত করেছিলো। তবু রণ-কৌশলের নিরিখে শত্রু সেনারা ছালিয়াপাড়া ও কোদালকাটির দিকে প্রায় প্রত্যহই গোলাবর্ষণ করত। মিত্র বাহিনীর কাছ থেকে আমাদের যে কয়টি ভারী কামান ও মর্টার মোতায়েন ছিল, তাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, আমরা যুদ্ধ শুরু করার আগে শত্রুসেনাদের কামানের গোলাগুলির কোন প্রতি উত্তর দেয়া হবে না। সবচেয়ে খুশির বিষয় এটাই যে, সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারা যত তাড়াতাড়ি নদী পাড় হয়ে যুদ্ধ শুরু করতে পারে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাদের উৎসাহ আমাকে সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়ে বলিয়ান করেছিল। আমাদের আধুনিক নেভিগেশনাল এইড ছিল না, শুধুমাত্র মাঝি-মাল্লাদের দিক নির্ণয়ের উপর ভরসা করে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে চলছিলাম। গাজীরচর, ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত। আর বেশী দূরে নেই। মাঝে মাঝেই রঙ্গিন ফুলঝুড়ির মত মেশিন গানের গুলির ঝাঁক আমাদের আশপাশে এবং মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে চলে গেল। এ গুলি আমাদের উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া হয়নি। এ এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ফায়ারিং। আমরা ঠিক সারে ছয় ঘন্টায় অর্থাৎ রাত আড়াইটায় তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই নদীর মোহনায় গাজীরচরে অবতরণের উদ্যোগ নিলাম। নদীর তীর থেকে যতদূর দেখা যায় শুধু কাশবন আর কাশবন। নদীতে স্বাভাবিক ও হালকা কুয়াশাও ছিল। আমি চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকালাম। একে আঁধার রাত তার উপর কুয়াশার জন্য বায়নোকুলারও কাজ করছিলনা। প্রচন্ড স্রোতের ঘুর্ণাবর্তের মুখে নৌকাগুলো নদীর তীরে যেন আছ্‌রে পড়ল। মাঝি-মাল্লারা নিশ্চুপ থাকলেও নৌকার বৈঠা, লগি পরস্পরের আঘাতে যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ হচ্ছিল এবং এ একটা ভীতির কারণও বটে। তীরে অবতরণ করলাম। নদী পূর্ণ শীতের রাতের মত আড়ষ্ট, আমার জন্য সম্পূর্ণ অপিরিচিত স্থান। আশেপাশেই শত্রুর অ্যামবুশ পাতা থাকলেও থাকতে পারত। এসব নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। আমরা দ্রুত গতিতে গন্তব্য অবস্থানের কথাই ভাবছিলাম। গাজীরচর সম্পূর্ণটি ৬/৭ ফুট উঁচু কাশবনে আচ্ছাদিত থাকায় কোন ঘর বাড়ী দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অধীর প্রতিক্ষায় বাকী নৌকাগুলির কথা ভাবছিলাম। আমাদের পরম সৌভাগ্য ও মাঝি-মাল্লাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দেশপ্রেম এবং নৌকা চালনার দক্ষতার জন্য



www.amarboi.org

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাকি নৌকাগুলো গাজীরচরে এসে ভিড়ল। তারুণ্যে উদ্বেল মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের পূর্ব মূহুর্তে নিয়ন্ত্রণে রাখা কি দুরুহ ব্যাপার তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। এমনিতেই নৌকার ঠোকাঠুকির শব্দ এই নিঝুম রাতে বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়ার কথা এবং শত্রুকে সজাগ করার জন্য এই শব্দ যথেষ্ট মনে হচ্ছিল সে অবস্থায় দামাল ছেলেদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য কমান্ড, হুইগেল বা টর্চ কোনটারই সাহায্য নেয়া সম্ভব ছিল না। অবতরণের পর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যে ছেলেগুলোর সাথে আমি মূল ঘাঁটিতে পরিচিত হয়েছিলাম এবং আমাদের কে যারা অভ্যর্থনা জানাবে এবং পথ দেখাবে, তাদের কাউকেই দৃষ্ট গোচর হলনা। কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটা আশংকাবোধ আমাকে হানা দিচ্ছিল। অবশ্য একটু পরেই ঐ পাঁচ ছয়টি ছেলে কাশবন থেকে বেরিয়ে এলো। লাজুক হাসি দিয়ে বলল, অপেক্ষা করতে করতে একটু তন্দ্রা এসেছিল। নৌকার শব্দে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসেছি। তারা তাৎক্ষণিকভাবে ইশারায় একটি সরু পথ দিয়ে কাশবন আচ্ছাদিত পথে অগ্রসর হলো। আমরা ওদেরকে অনুসরণ করলাম। অল্প পরেই প্রচুর কলাগাছ এবং অন্যান্য বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত দুটি ছোট কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌছলাম। বেশ প্রশস্ত আঙ্গিনা। গাছের ছায়ায় ঢাকা চারিদিকে আর কোন লোকালয় নেই, শুধু কাশবন। বাড়ীতে একটি বৃদ্ধ দম্পতি তাদের দুই সন্তান এবং একজনের নববধূ ছাড়া আর কেহ ছিল না। আমাদের আগমণের সাড়া পেয়ে তারা হুরমুর করে বিছানা ছেড়ে উঠে এলো। মজ্জাগত ঐতিহ্যের তাড়নায় যৌবনোত্তীর্ণ দম্পতি আমাদেরকে আপ্যায়নের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমি অতিকষ্টে বুঝালাম যে, আমরা শত শত লোক। এত লোকের আপ্যায়নের কথা অযথা ভাববেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে ঘুমান। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের হাতের হাতিয়ারপত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি দেখে কারো পক্ষেই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবার চিন্তা করা সম্ভব নয়। শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে তারা আমাদেরকে চা পান করার বিনীত অনুরোধ জানাল। বললাম আমরা এখানে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ রান্নার কথা ভাববেন না। আগুন জ্বেলে রান্না করা যাবে না। কারণ ধোঁয়া হলে শত্রুপক্ষ আমাদের অবস্থান টার্গেট করবে। আপনারাই আমাদের মেহমান হউন। আমাদের সাথে শুকনো খাবার আছে। যদি সময় পাই আমরা আপনাদের নিয়ে সে সব খাবার খাব। তাদের তরুণ ছেলে দুটিও আমাদের কোম্পানীগুলোকে পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট স্থলে পজিশন নেয়ার জন্য সাহায্য করল। এদের সাহায্য ছাড়া ঘন কাশবনের মধ্য দিয়ে সরু সরু অসংখ্য রাস্তা আমার কাছে গোলক ধাঁধার মতই মনে হচ্ছিল। আমাদের অয়্যারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে শুধুমাত্র সময়ের



www.amarboi.org

হিসেব করে ধরে নিতে হয় যে পৌনে চারটার মধ্যে সবগুলো পয়েন্টেই পজিশন নেয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক ভোর চারটায় জিরো আওয়ারে ২৬ মি.মি. সংকেত পিস্তলে সবুজ গুলি আকাশের দিকে ফায়ারের মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা দিলাম। পিস্তলের আওয়াজ ও বিচ্ছুরিত সবুজ রং উলিপুরে অবস্থানরত আলম ও তার কোম্পানীর ছেলেরাও দেখে। মুহূর্তেই প্রলয় কান্ড শুরু হয়ে গেল। গোলাগুলিতে সমগ্র চিলমারীর আকাশ রক্তিম হয়ে উঠল। বিভিন্ন জায়গায় আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। চারিদিকে নারী-পুরুষের ক্রন্দন রোল পড়ে গেল। ট্রেঞ্চে এবং বাংকারে শত্রুবাহিনী এবং তাদের দোসর বাহিনীর বিরুদ্ধে গোলাগুলি চলছিল। এর মধ্যে খবর পেলাম, নদীর মোহনায় যে নৌকার বহর রেখে এসেছিলাম তারা সবাই চলে গেছে। আমরা রি-ইনফোর্সমেন্ট এবং গাইডসহ এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের কাজে বেরিয়ে পড়লাম। কাভারের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার চেয়ে এরকম মুভমেন্টে বিপদের আশংকা বেশী। আমার জীবনে এমন উত্তেজনাকর, উম্মাদনাপূর্ণ, বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতি এর আগে কখনও আসেনি। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্থিরচিত্ত থেকে নির্লিপ্তভাবে সহযোদ্ধাদের মনের সাহস বাড়িয়েই অগ্রসর হতে হবে এটা স্মরণে রেখেছি। সকাল ৬টার আগেই E.P.C.A.P/ (ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড পারসোনেল) রাজাকারসহ অন্যান্য সহযোগী বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ শুরু করল। নায়েব সুবেদার মান্নানকে ওয়াপদার প্রধান ঘাঁটি আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জোড়গাছ স্কুল আক্রমণের দায়িত্বে ছিল প্লাটুন কমান্ডার দুলু ও কাজিউল ইসলাম। রাজারভিটা মাদ্রাসা আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্লাটুন কমান্ডার নজরুল ইসলাম আলোকে। থানা হাট পুলিশ ষ্টেশন আক্রমণের দায়িত্বে ছিল প্লাটুন কমান্ডার সোলায়মান এবং বালাবাড়ি রেল ষ্টেশন আক্রমণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় প্লাটুন কমান্ডার আব্দুল জোব্বারের উপর। এই অপারেশন প্রস্তুতির প্রাক্কালে রৌমারীতেই চিলমারীর উপরেল্লেখিত ৫টি পয়েন্টে আক্রমণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেইন্ড মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে চিলমারী এলাকার সাথে সু-পরিচিত ছেলেদের বেছে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই গ্রেনেড বাহিনী মোতায়েনের পেছনে কয়েকটি কারণ কাজ করেছে। প্রথমতঃ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন বিহীন থাকার দরুণ একটি অস্বস্তিকর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ চিলমারীতে শত্রুসেনার শক্তি বৃদ্ধি হলে একদিকে যেমন মুক্তাঞ্চলের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, যা প্রকারান্তরে মুক্তাঞ্চলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বসবাসরত দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও হাজার হাজার উদ্বাস্তু যারা ভারতে না গিয়ে



www.amarboi.org

এসব মুক্তাঞ্চলে অবস্থান নিয়েছিল, তাদের জন্য করুণ পরিণতির সম্ভাবনা, অপরদিকে চিলমারীতে এসব মুক্তিযোদ্ধার আত্মীয় পরিজনদের বিপদের সম্ভাবনা নাকচ করার উপায় ছিলনা। এ ছাড়া যেসব মুক্তিযোদ্ধা সমাজবাদী রাজনীতির কারণে ভারতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়নি এবং ১১নম্বর সেক্টরের পরিধি বিশাল হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের সুযোগ সহজ বিধায় এখানে যোগ দিয়েছিল, তাদের বিষয়টিও ভাবনার মধ্যে রাখতে হয়েছিল।

মুক্তাঞ্চলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমেই জোড়গাছ স্কুল, থানাহাট চিলমারী থানা এবং রাজারভিটা মাদ্রাসা ঘাঁটি ৩টি আক্রমণ করে। থানাহাট চিলমারী পুলিশ ষ্টেশন এর সাথে কিছু সংখ্যক ইপি ক্যাপ ছিল। জোড়গাছ আর রাজারভিটা মাদ্রাসায় শুধুমাত্র রাজাকার ছিল। ভোর ৪টায় গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা লক্ষ্য করে কিছু সংখ্যক পুলিশ ও রাজাকার ঘুম থেকে উঠে বদনা হাতে নিকটবর্তী ল্যাট্রিনে যাওয়া শুরু করে। এই অবস্থাটা আমাদের জন্য কিছুটা অসুবিধা জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যাইহোক ভোর ৪টায় গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ার সাথে সাথেই জোড়গাছ এবং রাজারভিটা ঘাঁটি দুটি প্রচন্ড গ্রেনেড চার্জে পর্যুদস্ত হয়ে পুরোপুরি সারেন্ডার করে। কাঁটায় কাঁটায় ভোর রাত ৪ টায় আলোর সবুজ সংকেত আকাশে বিস্ফোরিত করার ১৫ মিনিটের মধ্যে অভিজ্ঞ স্মার্ট কমান্ডার দুলু ওয়াপদার নিকটবর্তী soft (সফ্ট) রাজাকার ঘাঁটি জোড়গাছ স্কুলের পতন ঘটায় । এখানে উল্লেখ্য চিলমারী অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে (উলিপুরের চান ছাড়া) আমরা সবাই ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিয়েছিলাম। দুলু সকল বন্দী রাজাকার ও জব্দকৃত হাতিয়ার আমার গাজীর চর ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ ছেলে কয়টিকে তাড়াতড়ি ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিয়ে ওয়াপদা ঘাঁটির উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। দুলুর সহযোগী কমান্ডারদের মধ্যে সিপিও কাজিউল ইসলাম সার্জেন্ট চন্ডুল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিল। এরা সবাই নায়েব সুবেদার মান্নানের সহায়তায় ওয়াপদা বাংকার সীজে শরিক হয়।

এর কিছু পরেই থানাহাট পুলিশ স্টেশনও সারেন্ডার করে। আমাদের স্ট্রেটিজিও এটাই ছিল যে ঘাঁটি তিনটি মুহুর্তেই পর্যুদস্ত হয়ে যাবে এবং বাস্তবেও তাই হয়েছিল। ফলে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত হয় যা দিয়ে আমাদের কোম্পানীগুলি পূর্ণ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নির্দেশ মোতাবেক ওয়াপদা ঘাঁটির আক্রমণ শক্তিশালি করার মানষে নায়েব সুবেদার মান্নানের সাথে যোগ দেয়। বেলা প্রায় ১০টা পেরিয়ে গেছে। একমাত্র ওয়াপদা ঘাঁটি ছাড়া বাকি সব কয়টি ঘাঁটির পতন সকাল ৬টার আগেই হয়ে গেছে। বালাবাড়ী রেলওয়ে ব্রীজের



www.amarboi.org

আশেপাশে কিছুটা বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছিল; শত্রুরা ততক্ষণে হয় আত্মসমর্পণ করেছে নয়ত পালাচ্ছে । ধারণা করেছি বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দে গুলি ছুড়ছিল। আনুমানিক বেলা ১১টা নাগাদ খবর পেলাম মেজর তাহের মিত্র বাহিনীর জেনারেল এইচ.এস. ক্লেয়ার, কয়েকজন অফিসার এবং এক প্লাটুন মিত্র বাহিনীর সৈন্যসহ গানবোট নিয়ে গাজীরচরে আমাদের অপারেশন হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেছে। ঘটনাটিতে আমি বিব্রত বোধ করলাম। তবু সান্ত্বনা এই যে, ততক্ষণে পুরো চিলমারী আমাদের করায়ত্ত্ব হয়ে গেছে। কেবল মাত্র একটি স্পট তাও সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। আমি সরাসরি গাজীরচর অপারেশন হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলাম। সেখানে জেনারেল ক্লেয়ারের সাথে কুশল বিনিময় হল। তিনি স্বহাস্যে বললেন, আমি নিশ্চিত ছিলাম, এ অপারেশনে তুমি সফলকাম হবে। জেনারেল ক্লেয়ার বিগত আগস্ট মাস থেকে মেজর তাহেরকে কামালপুর চৌকি দখলের উদ্দেশ্যে সব ক'টি অপারেশনে সক্রিয় অংশ নিয়েও সফলকাম হতে না পারায় কিছুটা নিরাশ ছিল। চিলমারীর এই বিশাল ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের সাফল্যে তিনি উত্তেজনা ও আনন্দে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পরেছিলেন। আমি তাদেরকে আপ্যায়নের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারি ভেবে কিছুটা দ্বিধাবোধ করছিলাম। জেনারেল ক্লেয়ার একজন অভিজ্ঞ এবং ধী-সম্পন্ন সমর নায়ক ছিলেন। তিনি আমাকে শংকা মুক্ত করে বললেন, "আমার তরফ থেকে এক মগ গরম চা ও পুরি হয়তো এই মুহূর্তে তোমার জন্য সবচেয়ে লোভনীয় উপহার হতে পারে" সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম সেন্ট্রি হাতে ট্রেতে করে কয়েক মগ চা এবং প্লেটে পুরি নিয়ে আমার কাছে এলো। আমি, তাহের এবং জেনারেল ক্লেয়ার পরম তৃপ্তির সাথে ঐ চা পান করলাম। গোলাবারুদের তীব্র গন্ধ আর ধুলির ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত চিলমারীর বিজিত রণক্ষেত্র মেজর তাহেরের অপূর্ণ আকাঙ্খা পুরণের জন্য যথার্থ ছিল। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, সবচেয়ে ঘোরতর যুদ্ধ কোন স্পটে হচ্ছে। আমি তাকে বললাম, ঘোরতর যুদ্ধ বলতে সকাল ৬ টায় ই সব শেষ। শুধু ওয়াপদা অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে। অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জেনারেল ক্লেয়ার অবলিরায় বলে ফেললেন ঐ ঘাঁটির পতন ঘটান সম্ভবপর হবে না। ওটা গেরিলা আক্রমণের টার্গেট নয়। তিনি কামালপুরের উদাহরণ দিলেন। ট্যাঙ্ক বা এরিয়াল বম্বিং ছাড়া ঐ ওয়েল ডাগ-ইন পজিশন ডিমোলিশ করা যায় না। এমন সময় জেনারেল ক্লেয়ার ক্যাম্প সংলগ্ন ফিল্ড হাসপাতালে আর্তনাদের শব্দ শুনে যুদ্ধাহতদের দেখতে চাইলেন। আমরা সবাই মিলে সেখানে গেলাম। সেখানে সবই হৃদয়বিদারক দৃশ্য। অতি অল্প সংখ্যক ডাক্তার নার্স সীমিত পরিমাণে চিকিৎসা



www.amarboi.org

সামগ্রী নিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত সংখ্যক শত্রু মিত্র গ্রামবাসী নারী পুরুষদের চিকিৎসার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। সেখানে একটি করুণ দৃশ্য দেখলাম। একটি তরুণী মাতা তার ক্রন্দনরত শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে বসে আছে। তার সমস্ত বক্ষ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জেনারেল ক্লেয়ার ডাক্তারের কাছে জানতে চাইল মেয়েটির কি হয়েছে? ডাক্তার জবাবে বলল একটি বুলেট মেয়েটির বা দিকের স্তন ভেদ করে অভ্যন্তরে আটকে আছে। গুলির গতি স্তিমিত হয়ে আসার দরুণ তা তেমন গভীরে যায়নি এখনি গুলিটি বের করতে পারব এবং এটি কোন মেজর কেস নয়। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিল্ড হাসপাতাল থেকে ফিরে এলাম। মেজর তাহের তার নিজস্ব হাতিয়ারটি নিয়ে এবং আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদসহ দুই জন গাইড নিয়ে চলে গেল। জেনারেল ক্লেয়ার এবং তার ষ্টাফ অফিসারেরা আমার কাছে অনুরোধ করল, যুদ্ধ যখন শেষ তখন তো আমরা মোটামুটি নির্বিঘ্নে পুরা এলাকাটা দেখে আসতে পারি এবং কিছু ছবিও তুলতে পারি। আমি আলবৎ বলে তাদের নিয়ে রওয়ানা হলাম। চারদিকে একটানা অস্বস্তিকর ভাব; বিক্ষিপ্ত দু'চারটি গুলির শব্দ এবং কিছু লোকজনের চলাচল ছাড়া প্রায় শান্তই বলতে হবে। চিলমারী থানায় গেলাম। থানা ফাঁকা। মিত্র বাহিনীর অফিসারগণ অনেক ছবি তুলল। জেনারেল ক্লেয়ার থানার সাইনবোর্ড, রাবার ষ্ট্যাম্প,স্ট্যাম্প প্যাড এবং এমনি আরও টুকিটাকি জিনিষপত্র তুলে নিয়ে আমাকে বললেন, "স্যুভেনীয়র হিসাবে নিচ্ছি"। আমি পুলকিত হলাম। জেনারেল তার নাতি নাতনীদের দেখাবার জন্য যুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ করছে। এমনি আরও বেশকিছু জায়গা ঘুরে ঘুরে জেনারেলের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করে আমরা যথারীতি ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। শুধু চা নয় মিত্র বাহিনীর বন্ধুরা সারা দিনের জন্য রান্না করা খাবার তার পুরা আঁতুরাজের অফিসার ও সেনাদের জন্য সাথে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিকে খেয়াল যেতেই বোঝা গেল যে, গানবোট ইত্যাদি তারা ধূবরী থেকে মানকাচরের কাছে খাবার দাবার ব্যবস্থাসহ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এনে রেখেছিল। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত, পুরো ক্যাম্প লোকে গিজ গিজ করছে। এর মধ্যে যুদ্ধ ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধা, বন্দীকৃত শত্রুসেনা, আহত মুক্তিযোদ্ধা, আহত শত্রুসেনাসহ গ্রামের শতাধিক আহত নারী-পুরুষ সবাই ক্ষুধার্ত। পূর্ব প্ল্যান অনুযায়ী চাল, চিড়া, বিস্কুট, চিনি সবার মধ্যে বিতরণ করে নিল। মুক্তিযোদ্ধারা কলাগাছ কেটে এর শাস চিনি দিয়ে খাওয়ার প্রয়াস পেল। আমরা মিত্র বাহিনীর আনা কিছু উন্নত মানের খাবার এবং ফ্লাস্কে করে আনা চা-কফি খেয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করলাম। এর আগেই মেজর তাহেরও ফিরে এসেছে। সমগ্র অভিযানের একটা মোটামুটি ষ্টক নেয়া হল।



www.amarboi.org

আমরা আবার আহতদের দেখতে ফিল্ড হাসপাতালে গেলাম। সুখের বিষয়, সেখানে চিলমারীর সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সগণ এবং সার্জারীর উপকরণ নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আহতদের চিকিৎসা করছিল। বেলা শেষ হয়ে এলো। মিত্র বাহিনীর অফিসার এবং সৈন্যদের এখানে রাখার দায়িত্ব নেয়াটা আমি সমীচীন মনে করলাম না। আমি এই প্রস্তাব করতেই জেনারেল ক্লেয়ার সহাস্যে বললেন, যতক্ষণ তুমি এখানে আছ, আমিও এখানে আছি। যা হউক একটা রফা হল। এটা ঠিক হল যে, সমস্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/শত্রুসেনা, আটককৃত গোলাবারুদ, আত্মসমর্পণকৃত শত্রুসেনা, মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবী কোম্পানী গুলোকে সহ এই বিরাট Evacuation (ইভাক্যুয়েশান) যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এটা স্থির হল, জেনারেল ক্লেয়ার মিত্রবাহিনীর সদস্য ও মেজর তাহেরসহ আমার রৌমারী হেডকোয়ার্টারে গিয়ে অবস্থান করবে এবং আমি আগামীকাল ইভাক্যুয়েশান সম্পন্ন করে দুপুর নাগাদ রৌমারী পৌঁছব। এই যুদ্ধের সময় অনেকগুলো বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে-যেমন আমি বিস্তীর্ণ কাশবনের ভিতর দিয়ে গাজীরচরে ফেরার সময় অসংখ্য সরুপথের গোলক ধাঁধায় আমার ব্যক্তিগত লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমার ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে ফেরার পথ ও ভুল হয়ে গেছে বলে মনে হলো। যদিও খুব বিপদজ্জনক কিছু নয়, দিক নির্ণয় করে সহজেই নদীর তীরে পৌঁছে ক্যাম্পে ফেরা যেত, কিন্তু এর মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ আমার নিকটবর্তী হলো এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললো যে, তারা সব রাজাকার এবং তারা আত্মসমর্পণ করতে এসেছে। আমি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে বললাম, চল আমার সাথে। তারা অবলীলায় গাজীরচর মুক্তিবাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে পৌঁছে গেল। ঘাঁটিটি বেশ কাছেই ছিল। আমি নিঃসংকোচে তাদের সাথে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। পরে ভেবেছি যে, সেই প্রক্রিয়াটি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। ঐ ছেলে গুলো রাজাকার হলেও মনের দিক থেকে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করে ফেলেছিল। কিন্তু এক গ্রুপ সশস্ত্র রাজাকার হিসাবে আমাকে বাগে পাওয়া মাত্র হত্যা করা তাদের উপর যে অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল সে কথা তখন ওদের বিবেচনায় ছিলনা। ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে আমি তাদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলাম এবং বন্দী করলাম। তবে তাদের মারধর থেকে গার্ডদের বিরত করলাম। ইতিমধ্যে চিলমারীর একটি খাদ্য গুদাম দরিদ্রদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই সংবাদ শুনে শত শত নারী-পুরুষ গোলাগুলির মধ্যে ও খাদ্য শস্য লুট পাটের কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে একটি নিদারুণ ঘটনা



www.amarboi.org

ঘটেছিল। এক দুর্বল বৃদ্ধা প্রায় দুই মন ওজনের একটি চালের বস্তা আঁকড়ে ধরে কাঁদছে এ জন্যে যে, এত ভারী বস্তা সে কেমন করে নেবে। বস্তা ছেড়ে লোক আনতে গেলে বস্তা থাকবেনা, এই গোলাগুলির মধ্যে কেইবা তাকে সাহায্য করতে আসবে! চিলমারী অপারেশন পাক হানাদার বাহিনীর মুক্তাঞ্চল দখল করার বাসনা চিরদিনের জন্য শেষ করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রায় তিন শতাধিক বন্দীকে রৌমারী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমপক্ষে ৬টি বড় নৌকার প্রয়োজন। নৌকা সংগ্রহের পর বন্দীদেরকে পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় তোলা হল এবং হাতের ভিতর দিয়ে মোটা রশি ঢুকিয়ে নৌকার উভয় গোলই এর সাথে বেঁধে দেয়া হল। যাতে কেউ ঝাঁপ দিয়ে না পালাতে পারে। প্রতিটি নৌকায় কয়েকজন করে গার্ড মোতায়েন করা হল। সমস্ত লোকবল এবং সাজ-সরঞ্জামাদী পাঠাবার ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর দেখা গেল আমি এবং আমার ব্যক্তিগত ষ্টাফ ছাড়া সবাই রওয়ানা হয়ে গেছে। আমরা কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, কোন নৌকা নেই। একটু অসহায় বোধ করলাম। শেষের নৌকার মাঝিরা খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে এল আমাদের তুলে নিতে। নৌকায় ওঠার প্রাক্কালে হঠাৎ করে উদয় হলো ৯৫ তম মাউন্টেন ব্রিগেডের গোলন্দাজ অফিসার ক্যাপ্টেন সিঁধু সিং। সে মিত্র বাহিনীর মর্টারের গোলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিল। তার কাছে অয়্যারলেস সেট ছিল। ক্যাপ্টেন সিঁধু ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে কাশবনে পথ হারিয়েছিল। যাইহোক আমরা সদলবলে নৌকায় চড়ে বসলাম। সে সময় আমার ধুমপানের অভ্যাস ছিল। ব্রহ্মপুত্রের বুকে স্নিগ্ধ শীতল বাতাস দু-দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও টেনশন যেন মুহুর্তেই তিরোহিত হলো। আলস্য আয়েশে একটি সিগারেট জ্বালালাম। সিঁধু আমার কাছ থেকে একটু দূরে ছিল সে প্রায় হুরমুর করে আমার কাছে এসেই আমার হাতের সিগারেটটি এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই করজোরে বলল "স্যার ইয়ে সমুন্দার য্যায়সে দরিয়ামে হামতো এ্যয়সেই তাবা হো ব্যায়ঠে। সিগারেটকে আগ্‌মে হাম্‌তো দুশমনকে আচ্ছি খাছা নিশানা বন জায়ুঙ্গা" অর্থাৎ স্যার এই সমুদ্রের মতো নদীতে আমরা তো এমনিতেই মহা সংকটে আছি। তার মধ্যে তোমার সিগারেটের আগুন আমাদেরকে রীতিমত শত্রুর লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করবে। আমি তাকে সান্ত্বনায় বললাম Calm down my friend. It isn't that bad. (বন্ধু, শান্ত হও, এটা এত বেশি ঘাবরাবার মত কিছু নয়) আমরা জানি, যে কোন মানুষ চরম উত্তেজনায় আক্রান্ত হলে মুখ দিয়ে মাতৃভাষা বের হয়। সিঁধু সিং এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এই কথোপকথনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম আমাদের মাঝির দিকভ্রম হয়েছে। সে নৌকার মুখ ক্রমাগত ভাবে চিলমারীর



www.amarboi.org

দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করছে। আমরা মাঝিকে হুঁশিয়ার করে বললাম নৌকা চিলমারীর দিকে ঘোরাচ্ছ কেন? রৌমারীর দিকে রাখ মাঝি উত্তর দিল আমি তো সে দিকেই যাচ্ছি। আমার সাথের ছেলেরা যারা এ পথের সাথে খুবই সু-পরিচিত তারা ব্যাপারটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রয়াস পেল। মাঝির সঙ্গে কিছুটা মত বিরোধের আভাস আন্দাজ করতে পেরে ক্যাপ্টেন সিঁধু অয়্যারলেসে চিলমারীর উপর ২টি গোলা নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। গোলার গতি পথ দেখে ছেলেরা মাঝিকে বলল এবার বুঝেছো কোন দিকে যেতে হবে ? মাঝি কোন উত্তর দিল না। কিন্তু নৌকার মুখ আবার আস্তে আস্তে চিলমারীর দিকে ঘোরাতে লাগল। ছেলেরা বিষম উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে নালিশ করে বলল স্যার এই ব্যাটা মাঝি হয় রাজাকার নয়তো ওকে কানাভুতে পেয়েছে। ওকে মেরে ফেলি। আমি ছেলেদেরকে শান্ত করে আমার ষ্টেন থেকে ২টি গুলি মাঝির মাথার উপর দিয়ে ফায়ার করলাম। তারপর মাঝিকে বললাম তুমি যদি ফের নৌকার মুখ পশ্চিম দিকে ঘোরাতে চেষ্টা কর তাহলে তুমি গুলির নিশানা হবে। মাঝি কি বুঝল জানিনা সে এবার বৌমারীর দিকেই নৌকার হাল ধরল। অনেক সময় পার হয়ে গেল। নৌকা উজান ঠেলে স্লথ গতিতে এগুচ্ছে; তখন বোধ হয় রাত ৩টা পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ নৌকায় একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেলাম বুঝলাম নৌকা ডুবোচরে আটকা পড়েছে। এরই মধ্যে ক্যাপ্টেন সিঁধু অয়্যারলেসে গোলা নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। আমি ওর অস্থিরতা ও বিচলিত ভাব দেখে বললাম গোলা নিক্ষেপ বন্ধ কর। আমরা নদীর প্রায় এপারে এসে গেছি তোমার গোলায় এখন কোন কাজ হবেনা। উপরন্ত চিলমারীতে আমাদের নায়েব সুবেদার মান্নানের নেতৃত্বাধীন যে একটি রেগুলার প্লাটুন আমার সেফ উইথড্রয়াল নিশ্চিত করার জন্য অবারিত অবস্থানে আছে ওরাই তোমার এ গোলার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। Panic (ঘাবরাবার) এর কোন কারণ ঘটেনি। নৌকা এখনই ডুবোচর থেকে অবমুক্ত করা হবে। ছেলেরা দাড় টানা মাঝিদের সাথে নৌকা থেকে অবতরণ করার সাথে সাথে একজন মাঝি চিৎকার করে বল্‌ল "সাবধান আপনারা কেউ নৌকা ছাড়বেন না এটা চোরাবালির চর"। অন্ধকার রাত। বিশাল নদীবক্ষে চরে আটকা পড়া নৌকার মধ্যে আমরা প্রায় অসহায়। কাছাকাছি কোন চর দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। সুতরাং যে ভাবেই হোক এ চোরাবালির চর থেকে আমাদের নৌকাটিকে মুক্ত করে গন্তব্যে এগুতে হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে নৌকাটিকে মুক্ত করে বাস্তবিকই ছেলেরা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করল। আরো বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে আমাদের নৌকা ছড়ানো ছিটানো দ্বীপমালার সম্মুখীন হলো। ততক্ষণে আকাশ আলোময় হয়ে গেছে।



www.amarboi.org

আমরা ছোট ছোট বসতি বিহীন দ্বীপগুলির মাঝ পথ দিয়ে এক সময়ে গান্ধীর চরে এসে উপনীত হলাম। আমরা প্রায় দুপুরের সময় গান্ধীরচর থেকে রৌমারী থানা প্রাঙ্গণে পৌছে দেখি মিত্র বাহিনীর কমান্ডারসহ আরও অনেকে থানা প্রাঙ্গনে উম্মুক্ত আকাশের নীচে বিশাল ভোজের আয়োজন করে বোধকরি আমার অপেক্ষায় ছিল। আমি লৌকিকতা এবং ভোজনপর্ব সমাপনের এক পর্যায়ে দেখলাম তিনটি ছেলেকে নিয়ে উইথড্রয়াল কমান্ডের ইনচার্জ আমার কাছে এসে হাজির। সে কাচু মাচু করে বল্‌ল, স্যার গত রাত্রে যে তিনটি ছেলে ব্রহ্মপুত্রে পড়ে গিয়েছিল ওরা জীবন্ত ফিরে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ওরা বেঁচে আছে কেমন করে আর বেঁচেই যখন আছে তখন ওপারে না গিয়ে এখানে এল কেন? সে উত্তরে বলল ওরা যেখানটায় ঝাঁপ দিয়েছিল সেখানে চর ছিল এবং কোমর পানি ছিল সকালে জেলেদের নৌকায় ওরা এপারে আসার মনস্থ করে আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুরো কাহিনীটি শুনে মিত্র বাহিনীর অফিসারগণসহ আমরা সবাই ব্যাপারটিকে উপভোগ করলাম। ১৯ অক্টোবর অর্থাৎ তার পরেরদিন খবর এল দূরে ডিপ্লয়কৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডের ক্যাপ্টেন ওয়ালি মোহাম্মদ এবং পাট ব্যবসায়ী পঞ্চু মিয়াকে আটক করে আমার রৌমারী ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে যথাবিহীত বিচারের জন্য আমি বন্দীদেরকে থানা হাজতে বন্দী রাখার নির্দেশ দিলাম। আমি সেদিন মুক্তাঞ্চলের সানন্দবাড়ি এবং নিকটবর্তী আরও ২/১টি চরে (সানন্দবাড়ির এই বিখ্যাত হাটটি মোল্লারচর থেকে আনুমানিক ৪/৫ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে জিঞ্জিরাম নদীর উত্তর পাশে অবস্থিত। এই নদী দিয়েই আমরা সচরাচর casualty evacuation (ক্যাজুয়ালটি ইভাক্যুয়েশান) করে ১০/১৫ মাইল দূরে মানকাচর সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে পৌঁছানো হতো)। বিশেষ একটি ঘটনার তদন্তে গিয়েছিলাম। দিন চারেক পরে রৌমারী হেডকোয়ার্টারে পৌছে শুনি ইতিমধ্যে মেজর তাহের রৌমারী এসে হাজত থেকে বন্দী দুইজনকে বের করে কোন বিচার না করেই গুলি করে মেরে চলে গিয়েছে। আমি যথাবিহীত বিচার করতে না পারায় বিব্রতবোধ করেছিলাম। আজকে বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিকেরা স্ফিত বক্ষে গর্ববোধ করে বলতে পারবে বাংলাদেশের মানুষ কোন পরাশক্তির কাছেই পরাজয় মানতে শিখেনি। প্রয়োজনে মাতৃভূমি রক্ষায় কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। চিলমারীর যুদ্ধ এই আত্মবিশ্বাস তাদের মনে অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস, শক্তি ও মনোবল যোগাবে।



www.amarboi.org

১৬/১৭ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর এই প্রিয়েমটিভ চিলমারী রেইড এবং ৯/১০আগস্টের ভূয়াপুরে অস্ত্রবাহী জাহাজ আক্রমণের ফলে একদিকে যেমন প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিবাহিনী মুক্তাঞ্চল নিয়ে দুঃশ্চিন্তামুক্ত হল অপর দিকে পাক বাহিনীর আতঙ্ক বেড়ে গেল এই ভেবে যে তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই বৃহত্তম পাবনা ও রংপুর জেলার অধিকাংশ এলাকা মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়। একই ধারাবাহিকতায় ১১নং সেক্টরের কম্যান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর '৭১ তথা স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত রৌমারীকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

www.amarboi.org
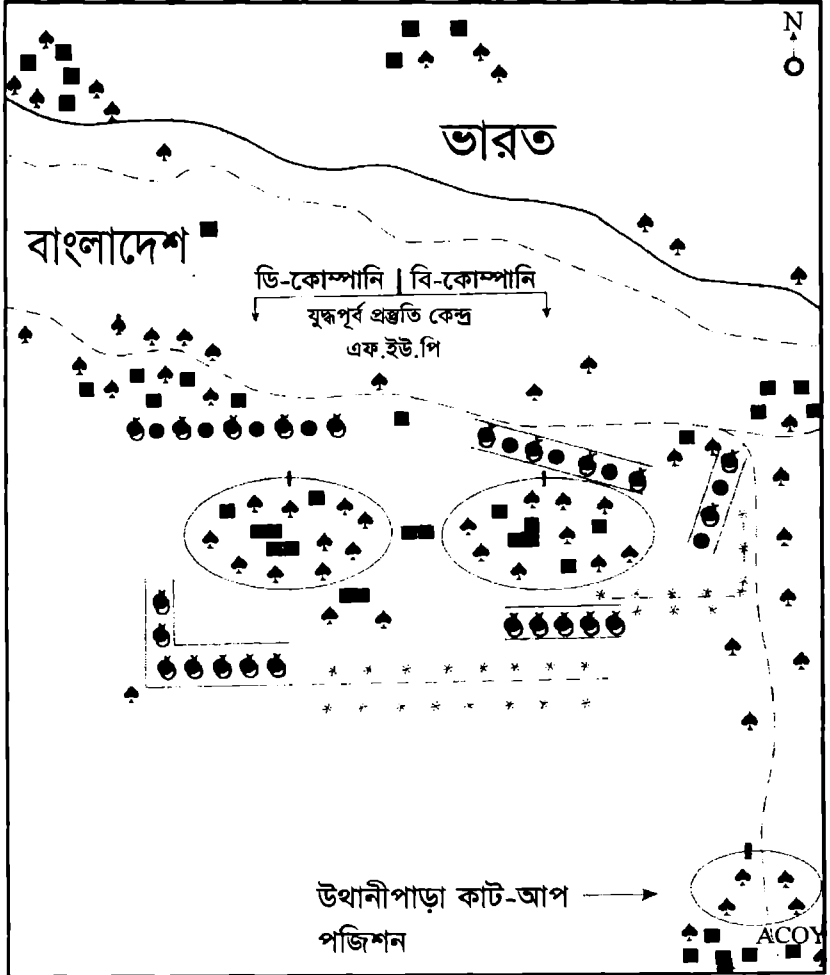
# ১১ নম্বর সেক্টরে জেড ফোর্সের অবিস্মরনীয় যুদ্ধসমূহ

## কামালপুর যুদ্ধ ১

মেজর হাফিজের বর্ণনা মতে, "৩১ শে জুলাই ১৯৭১ সালে জেড ফোর্স এর ১ম বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন পাক বাহিনীর অতি শক্ত চৌকি কামালপুর ঘাঁটির উপর একটি ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী এবং অতি দুর্ধর্ষ অভিযান পরিচালনা করে। জেড ফোর্স এবং একই সাথে ১১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান স্বয়ং এই অপারেশন পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করেন। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর মঈনুল হোসেন তাঁর সাথে ছিল। এই অভিযানে শত্রু অবস্থানের পেছনে ১ মাইল দক্ষিণে কামালপুর-শ্রীবর্দি সড়কে উথানিপাড়াতে ব্লক পজিশন নিবার দায়িত্ব ছিল ১ম বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন মাহবুবের আলফা কোম্পানীর উপর। মূল এসল্টে লীড দেয় ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজের ডেলটা কোম্পানী এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ এদের মধ্যে সর্বজেষ্ঠ বিধায় ফিল্ড পরিচালনার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তার উপর বর্তে ছিল। নবীন সৈনিকদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষা করার এবং উত্তর ফ্রন্ট থেকে সরাসরি ঢাকা অভিযানের জন্য এ অপারেশনটি খুবই উপযোগী বিবেচিত হয়েছিল। জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমান ১ম ইষ্ট বেঙ্গলের মাধ্যমে কামালপুর বর্ডার আউট পোষ্টটিতে (বিওপি) আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা শত্রুরা এই ঘাঁটিটিকে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে শক্তিশালী করে তুলেছিল। শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বর্তমান বক্সিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত গ্রাম কামালপুর। কামালপুরে পাকিস্তানী (ইপিআর) বিওপি টিকে পাক আর্মি উত্তর রণাঙ্গন এলাকায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। ১১ নম্বর সেক্টারের মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টর থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে কামালপুরের অবস্থান। উভয় পক্ষের জন্যই তাদের এই স্ট্র্যাটেজি যথার্থই সঠিক ছিল। নর্দান ফ্রন্ট থেকে ঢাকা অভিযানের জন্য মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর এটাই সবচেয়ে সহজ এবং একমাত্র পথ ছিল। যুক্তিসঙ্গত ভাবে পাকিস্তানীরাও কামালপুর বিওপি কে মোটামুটি একটি দুর্ভেদ্য গ্যারিসনে রূপান্ত রিত করেছিল। পাকিস্তানী নিয়মিত সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্টের প্রায় দেড়শতাধিক সৈনিক (কোম্পানী প্লাস) এই সুরক্ষিত ঘাঁটিতে রোটেশনের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করত। এই রক্ষণব্যুহের চারদিকে পর পর কয়েকটি স্তরে মোটা গাছের গুঁড়ি, এবং প্রতিটি স্তরে রি-ইন-ফোর্সড্ কংক্রিট বেরিয়ার যা



www.amarboi.org

যে কোন গোলার আঘাত প্রতিহত করার জন্য উপযোগি করে গড়ে তুলেছিল। বাংকারের উপরের আবরণ ছিল কয়েক স্তরে লগ-বালুরবস্তা-কংক্রিটে সাজানো। এ ভাবে তারা গড়ে তুলেছিল দুর্ভেদ্য বাংকার গুচ্ছ। এসব বাংকার ধ্বংস করতে গোলন্দাজ বাহিনীর মিডিয়াম কামানের গোলাও খুব একটা কার্যকর ছিল না। পদাতিক বাহিনীর ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলার আঘাতে এর কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। যুদ্ধ বিমান থেকে বাংকার ব্লাস্টার বোমা বা রকেট ছাড়া এগুলি ধংস করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এর চারদিকে পাতা ছিল এ্যান্টি ট্যাংক মাইন, বুবি ট্র্যাপ এবং এ্যান্টি পারসোনেল মাইন; রয়েছিল যথারীতি কাঁটাতারের বেড়া । সর্বোপরি, এ ঘাঁটির চারদিকে প্রায় দেড়শ থেকে দুশো গজ পর্যন্ত এলাকার গাছগাছালি কেঁটে রাখা হয়েছিল, যাতে আক্রমণকারীদের পাক সৈনিকেরা রাইফেল ও মেশিনগানের গুলিতে সহজেই ঘায়েল করতে পারে। অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর যে কোন আক্রমণ মোকাবেলায় তারা কোন ত্রুটি রাখেনি। কামালপুর ঘাঁটি স্থল ও আকাশ (হেলিকপ্টার) পথে নিয়মিত সরবরাহ এবং লোকবল রিপ্লেনিশের ব্যবস্থা সমৃদ্ধ ছিল। শত্রু এলাকার যাবতীয় খোঁজখবর নেওয়ার জন্য অনুসন্ধানীদল পূর্বাহ্নেই তৎপরতা (রেকি) শুরু করে দিয়েছিল। পর পর দুই দিন রেকি করার পরেও ফলাফল ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন এর মনঃপুত না হওয়ায় সে শত্রুশিবির নিজের চোখে পর্যবেক্ষণের জন্য লেঃ মান্নানকে সাথে নিয়ে ২৮ জুলাই রাতে এক দুঃসাহসি রেকী মিশনে গেল। ওদের যুদ্ধ সঙ্গি হয়ে আরও গেল সুবেদার হাই, টিজে হাসেম, ল্যান্স নায়েক ইউসুফ, নায়েক শফি সহ আরও বেশ কয়েকজন সেনা। ঘোর অন্ধকার রাত, আসে পাশে কোথাও কোন লোক বসতি নেই। বিওপি'র কাছে পৌঁছে জমির আইলের উপর ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত, লেঃ মান্নান, সুবেদার হাকিম, নায়েক শফি এবং দলের অন্যান্য সবাইকে রেখে শুধু সুবেদার হাইকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুর বাংকারগুলো রেকি করতে চলে গেল। এটা জানা ছিল যে শত্রুরা রাতে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে চলে যেত। দিনের বেলায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকলেও রাতে ওরা ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে যেত। খালি বাংকার দেখে দৃঢ়চিত্ত সালাহউদ্দিন ও হাই আরও ভিতরে শত্রু বাংকারের ১৫/২০ গজের মধ্যে চলে এল। সালাহউদ্দিন যখন শত্রুর এম.জি পজিশন অকেজো করার মত অবস্থানে পৌঁছে গেছে ঠিক ঐ সময় ২ পাক সেনা বোধকরি তাদের প্যাট্রলিং শেষ করে ফিরে আসার সময় এদের দুজনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে একটু ইতস্ততঃ দ্বিধায় এক পাক সেনা বলে উঠল 'হল্ট'। ত্বড়িৎ রিফ্লেক্সে ওরা কিছু বোঝার আগেই ১০৫ পাউন্ড ওজনের লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি ফ্রেমের



www.amarboi.org

দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক খান সেনার উপর। অন্ধকারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় খানসেনা বলে উঠল "ইয়ার ম্যায় খালেদ হুঁ"। ও হয়ত ভেবেছিল ওরই সঙ্গি ওকে জাপ্‌টে ধরেছে। মুক্তিরা ত এত ডীপে আসতেই পারে না। ত্বরিৎ রিফ্লেক্সে কিছু বোঝার আগেই সালাহউদ্দিন একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাক সেনা যখন বুঝল এ ত 'মুক্তি' তখনই শুরু হয়ে গেলো এক অসম মল্লযুদ্ধ। ৬ফুট দীর্ঘ বিশালদেহী পাকসেনা সালাহউদ্দিনকে এক পর্যায়ে নিচে ফেলে গলা চেপে ধরল। এরই মধ্যে সালাহউদ্দিন চিৎকার করে ডাকল 'মান্নান'! মান্নান ছুটে কাছাকাছি এসে স্টেন হাতে জিঞ্জেস করল 'উপরে কে? সালাহউদ্দিনের কথা বোঝা যাচ্ছে না। সে গোঙানির স্বরে কিছু বলে উঠল। ঘোর অন্ধকারে সঠিক টার্গেট নিশ্চিত করার উপায় নাই। এটা বোঝা গেল শত্রু উপরে কারণ এরই মধ্যে সালাহউদ্দিন জড়িত কণ্ঠে বলতে পেরেছে 'শত্রু উপরে'। লেঃ মান্নান গাব গাছের গুড়ির আড়ালে পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। এদিকে সুবেদার হাই একেবারে কাছে চলে আসতেই অপর পাকসেনা হুঙ্কার দিল 'হ্যান্ডস আপ' মুহূর্তে হাই রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করে খান সেনার জি-থ্রী রাইফেলটি কেড়ে নিল। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঐ খান সেনা তৎক্ষণাৎ তার পরিচিত পেছনের বাংকারে ঢুকে পড়ল। আর নায়েক শফি এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কার গায়ে গুলি লাগে এই ইতস্ততায় দৌড়ের আওয়াজ ঠাহর করে গুলি ছুড়ল। দিকনির্ণয়ে শব্দ নিশ্চিতভাবে বিভ্রান্তিকর হয়। ষ্টেনের গুলি হাই ও শত্রুর মাঝখান দিয়ে চলে গিয়ে বাঁ পাশের বিল্ডিংএর ওয়ালে হয়ত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হাই বাংকার লক্ষ্য করে পুরো ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল। শত্রু ততক্ষণে বাংকার থেকে ফায়ারিং শুরু করে দিয়েছে। হাই তখনই জি-থ্রী টি নিয়ে সালাহউদ্দিনের দিকে এগুচ্ছে। পায়ের শব্দ আন্দাজ করে চাপাস্বরে মান্নান জিঞ্জেস করল- কে? আমি হাই বলেই সে অতি দ্রুত সালাহউদ্দিনের উপরে অবস্থানরত শত্রুকে স্টেন দিয়ে সজোরে আঘাত করল। বাংলা বাক্যালাপ শুনে বিপদ আঁচ করে পাকসেনা সালাহউদ্দিন কে ছেড়ে হয়ত দৌড়ে যাবার উদ্যোগ নেয়ার অপেক্ষায়ই ছিল। সালাউদ্দিনকে ছেড়ে পালাবার মুহূর্তেই হাইয়ের ষ্টেন গর্জে ওঠে। শত্রুসেনার ভবলীলা সাঙ্গ হল। তাদের মাথার রেজিমেন্টাল টুপি এবং দু'টি জি থ্রি রাইফেল নিয়ে রেকি পার্টি বীরের বেশে ফিরে এলো । ক্যাপের রং ও জি থ্রি রাইফেল দেখে বোঝা গেল পাকবাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্ট কামালপুরে অবস্থান করছে। এমন বেহিসেবি অভিযানের পর বেঁচে গিয়ে সালাহউদ্দিন সত্য সত্যই অদম্য হয়ে উঠল। সালাহউদ্দিন ও হাই এর অতি উৎসাহ বিপর্যয় নিয়ে এল। এমন একটি



www.amarboi.org

হাই রিস্ক অপারেশনের পর অতি প্রয়োজনীয় বিরতি না দিয়ে মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে ১ম বেঙ্গলের এরূপ সিদ্ধান্ত সঠিক হয় নাই। যে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ইনটেনসিভ এয়ার সাপোর্ট এর সাহায্য ছাড়া আক্রমণ করার কথা শুনে অভিজ্ঞ ব্যাট্‌ল হার্ডেন্ড প্রফেশনাল সৈনিকেরাও অবাস্তব বলে পরিত্যাগ করবে সেখানে ২০০ জন আনকোরা নতুন অপর্যাপ্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাম্য যুবক নিয়ে সেই ঘাঁটি আক্রমণ করার ভাবনা হঠকারিতা বৈ কি! তবে একটা কথা থেকে যায়, যে ৩১ জুলাইয়ের অভিযান মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নিতান্তই অনির্বায ছিল। এই ঘটনার পর পরই শত্রু অতি সতর্ক হয়ে যায়। রাতারাতি তারা সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ করে ৩১ বালুচের দুই কোম্পানী প্লাস সাথে রাজাকারের সংখ্যাও দ্বিগুন করে ফেলল। এই আত্মঘাতি অভিযানে ১ম বেঙ্গল ঝাঁপ দিল ৩১ জুলাই ভোর ৪ টা ৪৫ মিনিটে। ভারতীয় ৯৫তম মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি ৩" মর্টার ব্যাটারী এবং মিডিয়াম রেঞ্জ কামানের গোলা বর্ষণ করে প্রথাগত আক্রমণে সীমান্তের মধ্যে থেকে যথাসম্ভব সহায়তা দিয়েছিল। আক্রমণ শুরুর সময় থেকেই যেন সব এলো মেলো হয়ে যাচ্ছিল। সামনের অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ হানবে ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্রাভো কোম্পানী এবং ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের ডেলটা কোম্পানী। শত্রু অবস্থানের পেছনে একমাইল দক্ষিণে কামালপুর-শ্রীবর্দী সড়কে উথানিপাড়াতে ব্লক পজিশন নেবে ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে আলফা কোম্পানী (ক্যাপ্টেন মাহবুব বীর উত্তম ২৮ নভেম্বর সিলেটের ধলুই এলাকার রণাঙ্গনে শহীদ হন)। এদের দায়িত্ব কামালপুরে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শত্রুবাহিনীর সর্বপ্রকার রি-ইনফোর্সমেন্টের যে কোন প্রচেস্টাকে প্রতিরোধ করা এবং একই সাথে কামালপুর থেকে পশ্চাদপসরণরত শত্রু সৈন্যকে ঘায়েল করা। টার্গেটের আনুমানিক ৬০০ গজ অগ্রবর্তী অবস্থানে ফরমিং আপ প্লেস পয়েন্টটি নির্ধারণ করা হলো। এর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো লে: মান্নানের ওপর। বিগ্রেড কমান্ডার জিয়া এবং ১বেঙ্গলের সিও মেজর মঈন কয়েকজন স্টাফসহ আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থান নিলেন। অধীনস্থ সৈনিকদের প্রথাগত সামরিক কায়দায় নির্দেশ (V.O) দেওয়ার পর ৩০ জুলাই সূর্যাস্তের পর পরেই পুরো ব্যাটালিয়ন সামরিক যানে চড়ে তেলঢালা থেকে মহেন্দ্রগঞ্জের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা শুরু হল। পথে নামলো বিরতিহীন তুমুল বৃষ্টি, সৈনিকেরা সবাই ভিজে গেলো। অফিসারদের মধ্যে যারা ট্রুপস কলামের অগ্রভাগে একটি কাভার্ড জিপে ছিল তারা তেমন ভিজল না। পেছনে আসছিল সালাহউদ্দিন খোলা জিপে। সে ভিজে একেবারে জুবুথুবু অবস্থা। মহেন্দ্রগঞ্জে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সীমান্তের কাছাকাছি ভারতীয় এলাকায় একটি পরিত্যক্ত মলিন বাংলো



www.amarboi.org

টাইপ (Bungalow type) এর ডেরায় (Assembly Area) এসেমব্লি এরিয়ায় পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বিরতি হলো। গরম চা খেয়ে কিছুটা ফ্রেশ হল সবাই। এতো ভিজেও সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা রয়েছে। সালাহউদ্দিন তার প্যান্ট-শার্ট খুলে বারান্দায় মেলে দিয়ে আক্ষেপ করে বললো, 'আমরা অফিসার, জিপে চড়ে এসেছি, বেচারা সৈনিকেরা খোলা ট্রাকে এভাবে ভিজলো, কিছুই করার ছিল না। ঐ পরিত্যক্ত ডেরাতে যে যেভাবে পারল বিশ্রাম নিল। এক সময় বিশ্রামের পালা শেষ হলো। সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী শেষ মুহূর্তের চেকআপ (Marry up) করে এফ.ইউ.পি.র উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু। লেঃ মান্নান পুরো ব্যাটালীয়নকে সামরিক কায়দায় জমায়েত হওয়ার স্থান দেখিয়ে দিলো। লেঃ মান্নান এর সাথে যৌথ দায়িত্বে ছিল ব্যাটালিয়ন এডজুয়েন্ট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত। লিয়াকত যোগ্য সাহসী মিষ্টভাষী অফিসার। আক্রমণের জিরো আওয়ার ছিল ৩১ জুলাই ভোর ৩টা ৩০মিনিট। আরেক উট্কো সমস্যা দেখা দিল। গাইড যথাসময়ে ফোর্সদেরকে ফরর্মিং আপ পজিশনে নিতে ব্যর্থ হল। ফলে ৩টা ৩০মিনিটের স্থিরকৃত আর্টিলারী যথাসময়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে দিল। পজিশনে যাওয়ার আগেই পূর্ব নির্ধারিত ভাবে আর্টিলারী ব্যাটারি শত্রু অবস্থান লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল বটে কিন্তু সিগন্যাল জ্যাম হয়ে যাওয়ায় তারা এডভাসিং ফোর্সের সেট থেকে হিস্ শব্দ শোনার অপেক্ষায় থাকা সমীচীন মনে করা আরও বিপজ্জনক ভেবেছে। ঘটনার মুখে সবাই চরম বেকায়দায়। কিছু গোলা শত্রু অবস্থানে পড়েছে, কিছু পড়েনি। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট অবশ্যই হয়ে থাকতে পারে। শত্রুকে চমকে দেওয়ার সুযোগ অর্থাৎ সাপ্রাইজ (Surprise) নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিটা বেশি হয়েছে। শত্রু সহজেই আক্রমণকারী মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেল্ল। তাদের ত পোয়াবারো; সঙ্গে সঙ্গে তারাও আমাদের ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। আশপাশে ভারি গোলা বিকট শব্দে ফাটতে লাগলো। কাদামাটিতে এত লোকের দাপাদাপি দুশমনের জন্য আক্রমণে খুবই সহায়ক হয়ে গেল। একদিকে শত্রু-মিত্র দু'দিক থেকেই আর্টিলারী শেল পড়ছে অন্যদিকে কোনভাবেই কোম্পানী দু'টি যথাযথ কো-অর্ডিনেশন প্ল্যান অনুযায়ী এফ.ইউ.পি তে পৌঁছতে পারছে না। প্লাটুন পর্যায়ে ডেপ্থ (টু-আপ) সিচ্যুয়েশন মিস-ক্যারেজ্ড হয়ে ট্রুপস আগে পিছে ত হলই উপরন্ত একে অপরের উপর পড়ে গিয়ে নাজেহাল হল। ফলে কমান্ড কন্ট্রোল জারী রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। বি কোম্পানী এবং ডি কোম্পানীর ব্যবধান মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় বি কোম্পানী অনেকটা পিছিয়ে রইল। কম্যুনিকেশন বিহীন অবস্থায় পড়ে যাওয়ার কারণেই যে পিন পয়েন্ট



www.amarboi.org

লোকেশনের হদিস পাওয়া যাচ্ছিলনা এটাও একটা প্রধান কারণ হতেইতো পারে। শত্রু অবস্থানের দিকে মুখ করে সৈনিকদের পাশাপাশি দাঁড় করানোটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক। বহুকষ্টে এক সময় FUP এ- (এফ ইউ পি) তে জোড়াতালি পজিশন নিয়েই রণধ্বনি, আল্লাহু আকবার, ইয়া আলী বলে যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়ে শত্রু বাঙ্কার অভিমুখে আক্রমণ চালান হলো। আক্রমণের দৃশ্যের অবস্থা যে কোন ভাবেই মানের মাপকাঠিতে নিখুঁত বলা যাবে না। শত্রু অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলছে সবাই যেন তৃড়িতাহতের মত। ছায়ার মত অনুসরণ করছে বেতার যন্ত্র (অকেজো) অপারেটর। শত্রু, অগ্রসরমান মুক্তিবাহিনীর সবার পুরো শরীর দেখতে পাচ্ছে। আর আমাদের ছেলেরা শুধু দেখতে পাচ্ছে তাদের বাঙ্কারের মধ্যে রাইফেল বা মেশিনগানের কালো নল আর গুলির ফ্লাশ। অবস্থাকে আরও সঙ্গিনতর করে ফেলে দিল আমাদের এবং মিত্র বাহিনীর আর্টিলারী শেলগুলি। শত্রু বাহিনীর শেলগুলি ত বিরামহীন ভাবে পড়ছেই। সিগনাল হয় জ্যাম নয়ত স্তব্ধ আগে থেকেই হয়ে আছে। চতুর্দিকে করুণ আর্ত চিৎকার আর তুমুল হট্টগোল। ডিরেকশনের হতাশাজনক অভাবে এডভান্স করা কালীন সময়ে একে অন্যের উপর হোঁচট খেয়ে পড়ছে। করুণ সেম সাইড। বৃষ্টিঝড়া কর্দমাক্ত মাইন বিছানো রণক্ষেত্রের উপর দিয়ে এমজি, এলএমজির হাজার হাজার গুলি আর মুহুর্মুহূর আর্টিলারি/মর্টার শেল ফাটার বিকট আওয়াজে অনভিজ্ঞ এক মাসের ট্রেনিং প্রাপ্ত সেনারা এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য শত্রুর বাংকার। দুপাশে লাশ পড়ছে, তাকাবার ফুরসৎ নাই, গোলার বিকট আওয়াজে যন্ত্রণার ক্রন্দন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সামনে একটি ছোট নালা, নালার পরই কাঁটাতারের বেড়া। তাছাড়া পুরো এপ্রোচটাই মাইনফিল্ড। অপারেটর সিরাজ মাটিতে পড়ে গেছে, তার একটি পা এ্যান্টি পারসোনেল মাইনের আঘাতে উড়ে গেছে। শেলের টুকরা এসে ক্যাপ্টেন হাফিজের হাতের চাইনিজ ষ্টেনের বাঁটটি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ায় অস্ত্রটি বিকল। আহতাদের গোঙানী আর আর্তনাদ। ভয়াবহ দৃশ্য! এত সবের পরেও বেতারযন্ত্রটি কাঁধে তুলে নিয়ে আরেক মুক্তিসেনা গ্রেনেড ছুঁড়ে ছুঁড়ে সঙ্গিদের নিয়ে দ্রুত এগিয়ে সামনের দু'টি বাঙ্কার দখল করল। আকাশে ভোর হওয়ার আভাষ দৃশ্যমান হচ্ছে। বেতারযন্ত্রে সালাহউদ্দিনের এবং মঈনের সঙ্গে আবারও যোগাযোগের চেষ্টা করে কোন পক্ষ থেকে কোন সারা শব্দ পাওয়া গেল না। শত্রু কিছুটা পিছিয়ে বাঁ দিকের অবস্থান থেকে আমাদের ওপর মেশিনগান ও এলএমজি'র অবিরাম গুলিবর্ষণ করে চলেছে। আমাদের সামনে তেমন কোনো আড়ালও নেই। এদিকে এফ ইউ পি'র



www.amarboi.org

চরম অনাকাঙ্খিত বিশৃঙ্খলা থেকে সামান্য রেহাই পেয়ে উভয় কোম্পানী সবেমাত্র অগ্রসর হয়েছে অমনি পাকিস্তানী স্যালভো (একযোগে নিক্ষিপ্ত একাধিক আলোকিত গোলা) ফায়ার এসে পড়লো। এত গোলার মিলিত ঝলকানিকে নতুন রিক্রুট আনকোরা ছেলেদের কেউ কেউ হতবুদ্ধি হয়ে কাদার মধ্যেই শুয়ে পড়ল। সালাহউদ্দিন ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে গেল। মুখ দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর আদি রসসিক্ত স্ল্যাং অনর্গল মুখ থেকে বেরুচ্ছে সাথে একযোগে চলছে হাত ও পা। পিছু হটার প্রশ্ন ওঠেনা এগিয়ে যেতে হবে। স্বভাবজাত ক্রাইসিস কমান্ডার। শত্রুর কাছ থেকে সে আত্মগোপনের কোন চেষ্টাও করেনি। তাদের মনোবল ভাঙ্গতে সে মেগাফোন হাতে নিয়ে বলল 'থোরা হী ওয়াক্ত হ্যায় তোমহারা জিন্দেগী, মওত বহুত ক্বারিব, হাথিয়ার ডাল দো ঔর সোচ। জীন্দেগী বহুত কিমতি চীজ হ্যায়'। তার পরের ইতিহাস প্রতিটি বাঙ্গালীর জন্য গৌরবের । এ যেন শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, মুক্তিকামী মানুষের প্রাণবন্যার ইতিহাস। সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনভিজ্ঞ গ্রামীণ যুবকেরা কামানের সাহায্য ছাড়াই মাইনফিল্ড কাঁটাতার ডিঙ্গিয়ে তরঙ্গরাশির মত তখন ছুটছে। মুহূর্তের মধ্যে তারা পাক বাহিনীর ডিফেন্সের প্রথম সারির বাংকারগুলো দখল করল। সে দৃশ্যের কথা ভেবে বিশ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। কোন পেশাদার দক্ষ সৈনিকের পক্ষেও গোলন্দাজ বাহিনীর সর্মথন ছাড়া এ ধরণের মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে বাঙ্কার অতিক্রম করে বিশ পঁচিশটা ছেলে কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে পড়লো। তাদের ভিতর মাত্র দু-একজন আহত অবস্থায় ফেরত আসতে পেরেছিল আর বাকি সবাই হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করেন। প্রচন্ডভাবে তখন হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। উভয়দিকেই ক্যাজুয়ালটি বেড়ে চলছে। পিছনে তখন আমাদের পক্ষের লাশ আসা শুরু হয়ে গেছে। পিছনের উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরাও বুঝতে পেরেছিলেন বাঙ্গালীরা যুদ্ধক্ষেত্রেও কারও থেকে কম নয়। আজকে শুধু আফসোস হচ্ছে যে, আজকে সেদিনের কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে বাবুদের আশ্রয়ে লালিত পেপার-টাইগাররা যদি সেদিন যুদ্ধের ময়দানে থাকত তবে সম্ভবত আজ আর তারা রনাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অযথা হেনস্থা করে, তাদের প্রাপ্য সন্মান থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে নিয়ে বণিজ্য করত না। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের গায়ে তখনও সেই রিলিফের সাদা শার্টটা ছিল।".....এদিকে মাইন ফিল্ডে ফেঁসে যাওয়া সুবেদার হাই-এর প্লাটুনের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন বুঝতে পারলেন যে, শত্রুরা মাইন-ফিল্ডের পেছনের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে আরও পেছনে সেকেন্ড লাইনে সরে গিয়ে কাউন্টার এ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মেগাফোনে হাইকে



www.amarboi.org

প্লাটুন নিয়ে ডানে যেতে বললেন। প্রথম আক্রমণের শুরুকালে সুবেদার হাই এর লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছা পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ হতে ২০ জনে এদিকে মাইনের আঘাতে নায়েক শফিকের হাত উড়ে গেল আর ধাবমান শত্রুদের পিছু নেওয়া কালে জোয়ানরা বারবার সালাউদ্দীনকে অনুরোধ করলো, 'স্যার,পজিশনে যান'(মাটিতে শুয়ে পড়া)। সালাউদ্দীন ধমকে উঠলো, অযথা স্যার স্যার করে চিৎকার করবেনা, শত্রুরা আমাদের অবস্থান টের পেয়ে যাবে। চিন্তা করার কিছু নাই যুদ্ধ এমনই হয় । তুমি বরং আমার কাছে এসে দাঁড়াও গুলি গায়ে লাগবেনা 'হারামখোররা আমার জন্য গুলি এখনো বানাতে পারেনি।' দু'দিকে বৃষ্টির মত গুলির মাঝে দাঁড়িয়ে পরম নির্লিপ্ততায় কথাগুলো বলল সালাহউদ্দিন । আজও ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় সালাউদ্দীনকে। দ্বিতীয়বার মেগাফোনে 'হাই' বলার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের সামনে ২/৩ টি শেল এসে প্রচন্ড শব্দে ফেটে পড়লো। মুহুর্তের মধ্যে সালাউদ্দীনের দেহটি সমান্তরাল ভাবে মাটিতে পড়ে গেল। না, তখনও সে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যায়নি। তখনও কিছু কাজ ত বাকি রয়ে গেছে। তার দেহটা প্রথমে বামে,পরে আধা ডানে ও শেষে বুঝি চিরতরে পিছনের দিকে পড়ে গেল। আশেপাশের জোয়ানরা ছুটে আসে, 'স্যার, কলেমা পড়েন' কিন্তু বাংলার অবিস্মরনীয় গৌরব সালাউদ্দীন উত্তর দিল, 'আমার কলেমা কবুল হয়ে গেছে। খোদার কসম, যে পেছনে হট্‌বি তাকে গুলি করবো।' তারপর বিড় বিড় করে আবার বলে উঠলো, 'মরতে হয় এদেরকে মেরে তবে মর-বাংলামায়ের পুত পবিত্র মাটিতে শোবে।

উঁচু মাটির ঢিবিতে পড়ে থাকা সালাউদ্দীন এর নিস্প্রাণ দেহটিকে ২/৩ জন সৈনিক শত্রুর এলাকা থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সকলেই মৃত্যুবরণ করে। পরিশেষে একটি বিহারী ছেলে ৮টি গুলি খেয়েও শেষবারের মত চেষ্টা করে নিজে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং লাশটি আনতে ব্যর্থ হয়। সালাউদ্দীনের গায়ে তখনও রিলিফের সেই সাদা শার্টটিই ছিল যা তার খুলে ফেলার কথা ছিল। কারণ, সাদা নড়াচড়া রত বস্তু রাতের আঁধারেও দৃষ্টি আকর্ষণের ঝুঁকিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের ঘড়ি, ষ্টেন ও অন্যান্য জরুরী কাগজ নিয়ে আসা হয়। পরে লোক মুখে শোনা গেছে, এই জাতীয় বীরকে পাকিস্তানীরা যথাযোগ্য সামরিক মর্যাদায় সমাধিস্থ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্য বীর সালাহউদ্দিনের কবরের কোন সন্ধান করে নাই। সালাহউদ্দিন মরণোত্তর বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব পান নাই। বীর যোদ্ধা কর্ণেল শাফায়াত জামিলের লাগসই ভাষায় 'খয়রাতি বীর উত্তমদের মিছিলে শামিল করে



www.amarboi.org

দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের ময়দানে ক্যাপ্টেন হাফিজ ছিলেন জেষ্ঠ্য কমান্ডার। কিন্তু FUP এ জমায়েত হওয়ার ব্যাপারে গাইডের অনিচ্ছাকৃত গাফিলতি আর আমরা জমায়েত পূর্ব অবস্থায় ফ্রেন্ডলি গোলা বর্ষণের জন্যে অহেতুক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের ডেল্টা কোম্পানি কয়েক ফারলং এগিয়ে যায়। ফলে পূর্ব নির্ধরীত সময়ের হেরফেরে ফ্রেন্ডলি আর্টিলারি ফায়ারের আক্রমণের টার্গেট হয়ে পড়ে। প্রায় সব কটি সিগ্যনাল সেটই অকেজো হয়ে যাওয়ায় অভিযানের আভ্যন্তরিণ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিথর থাকে। এরই মধ্যে ক্যাপ্টেন হাফিজ বেঁচে গেলেন অলৌকিক ভাবে। হাতের ষ্টেনটিই শুধু তোপের মুখে উড়ে গেলেও আহত ত হয়েছিলেনই এই বীর সেনানি, কেননা একেবারে কাছেই মর্টারের শেলটি ফেটেছিলো। হাফিজ তাৎক্ষণিক ভাবে মাটিতে লুটে পড়েছিল। হাতে কাঁধে শেলের তীক্ষ্ণ টুকরোগুলো প্রবেশ করলো। দু'জন ধরাধরি করে ওকে পিছনে নিয়ে গেলো। কোম্পানীটি কমান্ডারবিহীন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিল। এতো অধিকসংখ্যক হতাহত। মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাটালিয়নটিই বুঝি ব্যাট্‌লক্রেজি হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে অগ্রসরমান লেঃ মান্নান উরুতে গুলি লেগে গুরুতর আহত হল। এদিকে এফ.ইউ.পি. তে সর্বাগ্রে পৌছে যাওয়া ফ্লাইট লেঃ লিয়াকতও মান্নানের অতি নিকট অবস্থানেই ছিল। গুলি তাকে এড়িয়ে গেলেও কম মারাত্মক স্প্রিন্টার গুলো তার শরীরকেও ছাড় দেয় নাই। তিনি ঐ মুহূর্তে যথারীতি 'বি' কোম্পানীর নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে নিলেন। আহত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লেঃ মান্নান ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত মেজর হাফিজের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতি ছিল। লেঃ মান্নানও আহত হওয়ার পর লিয়াকতের উপর পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায়। সে ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও দৃঢ় মনোবল এবং নেতৃত্বের নৈপুণ্যকে পুঁজি করে অগ্রাভিযানকে আবার জোরদার করে তোলেন। ক্রমাগত হেভি মর্টার এবং এইচ.এম.জির এ্যাটাকের জাল বিদীর্ণ করে পুরো সৈন্যদল সহ প্রথম সারির বাংকার গুলো দখল করে নেবার মরণপণ প্রচেষ্টা চালায়। কেননা ঐ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এদের মরণপণ আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী সেনারা সম্মুখস্থ বাংকার গুলি ছেড়ে পেছনের বাংকার গুলিতে আশ্রয় নেয়।

এই আক্রমণের প্রাক্কালে আলফা কোম্পানীর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুবকে উথানি পাড়ায় ব্লক পজিশনে ডিপ্লয় করা হয়েছিল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আক্রমণের তৃতীয় পথ নিয়ে সালাহউদ্দিনের আক্রমণকে জোরদার করার জন্য তুমুল গোলা বর্ষনের মধ্যদিয়ে শত্রুর ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এমতাবস্থায় অনেকে আহত হল অনেকে শাহাদত বরণ করলো। কাঁচা ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিভিন্নস্তর



www.amarboi.org

থেকে উঠে আসা এই সব তরুণদের আত্মত্যাগ মুক্তিযোদ্ধের ইতিহাসকে জনম জনম কাল সমৃদ্ধতর রাখবে আর আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে থাকবে স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণার উৎস। এই আক্রমণের প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধরণের অবাঞ্চিত সমস্যা ১ বেঙ্গলের প্রচেষ্টাকে দুঃখজনক ভাবে ব্যহত করেছে। সিগনাল সেট গুলো অকেজো হয়ে থাকার কারণে কমান্ড কন্ট্রোল নির্জীব হয়েছিল। শত্রুমিত্র উভয় দিক থেকে গোলা আমাদেরকে সাহায্যের পরিবর্তে আমাদের উপর এসে পড়ছিল। সময় মত কোন পয়েন্টে যেতে না পাড়ায় আক্রমণের তিব্রতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অচিরেই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত সালাহউদ্দিনের কাছাকাছি এসে পৌছেছিল। সময় মত এবং শৃঙ্খলার সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে না পাড়ায় আমরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম। দুঃখজনক ভাবে আমাদের প্রচুর কালক্ষেপন হওয়ায় আমাদের কঠিন কাজ আরও কঠিনতর হয়ে ভোরের আভাস পূর্বাকাশে আমাদের জন্যে অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি করলো। আলো আঁধারের আড়ালে সুযোগ থেকে শত্রু আমাদের দেখার সুযোগ পেলো। আমরা ৩০/৪০ গজ দূর থেকেই দেখতে পেলাম অসম সাহসী বীর সেনা ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন বিপুল তেজস্বিতায় তার অধীন সেনাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার অধীন সেনারাও চরম উত্তেজনা ও সাহসীকতায় বৃষ্টির মত গুলির ঝাঁকের ভিতর দিয়ে দৌড়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অনেক সেনা গুলির আঘাতে পড়ে যাচ্ছিল অনেকের জীবন প্রদীপও নিভে গিয়েছিল। সালাহউদ্দিনের সেনারাও বিরামহীন গুলি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল শত্রুসেনাও ঠিক একই পরিমাণে পড়ে যাচ্ছিল। আক্রমণকারী হিসাবে আমাদের হতাহতের সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই বেশি হচ্ছিল। এরই মধ্যে আমরা যখন সালাহউদ্দিনের খুব নিকটে এসে আমাদের সেনাদের সমন্বিত বিন্যাসে শক্তি বৃদ্ধি করলাম তখনই বীর সাহসী যোদ্ধা সালাহউদ্দিন শত্রুর গোলায় নীরব হয়ে গেল। আমরা তার অতি নিকটেই ছিলাম। এরই মধ্যে শত্রুর এল এম জি পয়েন্টম্যান এর নিক্ষীপ্ত গুলি সরাসরি লেঃ মান্নানের উরুতে আঘাত হানলো কিন্তু আশ্চর্য্য জনক ভাবে ঐ অবস্থাতে মান্নান ক্রল করে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং সেনাদেরকে জোর উৎসাহ দিয়ে বাংকারের দিকে এগুচ্ছিল। ফ্লাঃ লেঃ লিয়াকত তখন ধীরস্থির মস্তিষ্কে যতগুলি সম্ভব সেনাকে নিয়ে দৌড়ে সালাহউদ্দিনের বেঁচে যাওয়া সেনাদের সাথে একত্রিত হয়ে আক্রমণের গতি অব্যাহত রাখল। বিরামহীন গোলাগুলি মর্টার এবং মিডিয়াম রেঞ্জ কামানের গোলায় ধুলা এবং ধোঁয়ায় আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলো। আবার অন্য দিকে ভোরের আলো ফুটে ওঠায় শত্রুরা আমাদেরকে



www.amarboi.org

স্পস্ট দেখতে পাচ্ছিল। লেঃ মান্নান আহত হয়ে যাওয়ার পর লিয়াকত তৎক্ষণাৎ মান্নানের অসমাপ্ত দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিল। যুদ্ধের পরিস্থিতি বিবেচনায় অস্পস্ট নির্দেশ এলো কৌশলগত পশ্চাদপসরণের। বোধ করি নির্দেশটি ক্যাপ্টেন হাফিজের কাছ থেকে এসেছিল। বৃষ্টির মত শত্রুর গুলির ভিতর দিয়েই আহত লেঃ মান্নানকে বহন করে আমরা আমাদের মূল FUPতে ফিরে এলাম। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম গুলি ও গোলার স্প্লিন্টারের আঘাত থেকে নিষিক্ত রক্তে আমার ইউনিফর্ম রক্তাক্ত এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অন্যদিকে আহত ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধারকল্পে ল্যান্স নায়েক রবিউল ছুটলো শত্রু অভিমুখে। কয়েক কদম যাওয়ার পর দুই হাতেই গুলি এসে লাগল। মারাত্মক আহত অবস্থায় প্রচুর রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও অকুস্থলে পৌঁছে দেখে হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। সেখানে পড়ে থাকা অয়ারলেস ও রকেট লাঞ্চার উঠাবার সময় রবিউলের বুকে গুলি লাগল। রবিউল নিথর। পাশের আহত সেনা সাহায্যের অপারগতার ভয়ে পাশ কেটে চলে গেল। রবিউল বুঝতে পেরেছে সে মরে নাই। রবিউল গ্রেনেডটা হাতে নিল (উদ্দেশ্য,বন্দি হবে না)। ক্রল ত্যাগ করে সে নিকটবর্তী আখক্ষেতের দিকে জোরে দৌড় দিল। বৃষ্টির মত শত্রুর গুলি আসছিল। কি আশ্চর্য! রবিউলের গায়ে গুলি লাগল না। আখক্ষেতে পৌঁছতেই রবিউলের প্রতীতি জন্মালো সে নব জন্ম লাভ করেছে। বাঁ হাত থেকে বেগে রক্ত বের হচ্ছে। ডান হাতের হাড়টি ভেঙ্গেছে। একটা মানুষকে বিদ্ধস্থ অবস্থায় দেখে এগিয়ে এলো গ্রামের কয়েকটি তরুনী/গৃহবধু। কাছেই দাঁড়ানো পুরুষেরা ভয়ে ইতঃস্তত করছিল। পরে শুনেছে রমনীরা নিজেরাও রক্তাক্ত হয়ে নিজেদের কাঁধে আশ্রয় দিয়ে তকে FUP এরিয়া পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। এদিকে সালাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সৈন্যদল ছত্রভংগ হয়ে গেলেও সেই অবস্থায়ই ছোট ছোট গ্রুপে ওরা শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। বেলা তখন ৭ টা বাজে। আমাদের আর শত্রুর লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভরে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বেলা সাড়ে সাতটার দিকে আমাদের সৈন্যদলকে রিট্রিট করানো হয়। এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমাদের একজন অফিসার সহ ৩০ জন নিহত/নিখোঁজ আর দুইজন অফিসার সহ ৬৬ জন আহত হয়।



www.amarboi.org

## ১১ নম্বর সেক্টরে জেড ফোর্সের অবিস্মরনীয় যুদ্ধসমূহ
## ৩য় বেঙ্গলের যুদ্ধ -২

'জেড' ফোর্সের তৃতীয় বেঙ্গলের অকুতভয় বুকের পাটার অধিকারী ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর শাফাআত জামিল ৩১ জুলাই দুপুরে কামালপুর বিওপি'র নিকটবর্তী হয়রত শাহ কামালের মাজার কাছাকাছি একটি স্থান থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিজে এই অভিযান পরিচালনা করে। তখন তাদের জনবল ছিল আনুমানিক ৩৫০ জনের মত। পুরো ব্যাটালিয়নের আলফা কোম্পানী, ডেলটা কোম্পানী, মর্টার প্লাটুন এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের সজ্জিত জনবলসহ ছোট বড় ৩ টি নদী পাড় হয়ে তারা তাদের টার্গেট প্রায় ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট আক্রমণের জন্য রওনা হয়। ঐ অঞ্চলের বলরামপুর গ্রামের নাসের নামের একটি আই-এ পাশ ছেলে এই আক্রমণের পথপ্রদর্শক ছিল। যার উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষীপ্রতায় ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৩টি ছোট বড় নদী ১০/১২টি নৌকা নিয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। নৌকা সংগ্রহে প্রতিটি স্পটেই স্থানীয় জনসাধারণ পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করে। গানবোটে পাহারারত পাকসৈন্যদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে এই নদীপথ নিরাপদে অতিক্রম করা বাস্তবিকই বিপদ সংকুল ছিল। এই নদীগুলি পার হওয়ার পর পুরো ব্যাটালিয়ন কাদা পানি ভেঙ্গে সবুজপুর ঘাটে পৌছল। সেখানেও স্থানীয় লোকজনের স্বতস্ফুর্ত সাহায্যে আবার ১০/১২ টি নৌকা সংগ্রহ করা হল। কিছুটা পথ হেঁটে পরে নৌকাযোগে খুব সাবধানতায় পুরনো ব্রক্ষপুত্র নদ পার হয়ে একটানা ১৫ ঘন্টার অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ বিনা বিশ্রামে অর্ধভুক্ত অবস্থায় এ পারে পৌছার পর পরই ঘাটের বার্জের ওপর থেকে চারদিকে সার্চ লাইটের আলো ফেলে ক্ষণিক পর পর মেসিনগানের শত্রু লোকেশন বার্স্ট নিক্ষেপ করছিল। অবশেষে রাত তিনটার দিকে পূর্ব নির্দিষ্ট এফ-ইউ-পি'তে পৌছতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের অধীনে আলফা কোম্পানী নৌকাঘাটে (হাইড আউট) পাহারারত থাকে, কেননা নৌকা চলে গেলে ইমার্জেন্সি ইভাক্যুয়েশন সম্ভব হবেনা। আলফা কোম্পানীর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল ডেলটা কোম্পানীর রিয়ারের প্রটেকশন প্রদান। এ সময় ব্যাটালিয়ন কমান্ডার শাফায়াত জামিল ও তাদের সাথে ছিল। কেননা ডেলটা কোম্পানী পূর্ব প্ল্যান মোতাবেক বাহাদুরাবাদ ঘাট সংলগ্ন বার্জ ও রেলের খোলা বগিতে পাক মেসিনগান ও মর্টার পজিশনগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে সে গুলোকে অকেজো করে দেবে এছাড়া ঘাটে অবস্থানরত বার্জগুলিকেও ডুবিয়ে দিবে। ভোর



www.amarboi.org

৫টার আগেই ডেলটা কোম্পানী পাক সেনাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালালো। আচমকা আক্রমণে কিছুটা হতচকিত হলেও মিনিট দশেকের মধ্যে পাক বাহিনী নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে মেসিনগান ও মর্টারের পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীদের তিনটি বার্জ অকেজো করে দেওয়া হয়। দুটো যাত্রিবাহী কম্পার্টমেন্টে বিশ্রামরত অজ্ঞাত সংখ্যক পাক সেনা গোলাগুলির মধ্যে পড়ে হতাহত হয়। ১২নম্বর প্লাটুন ই-পি-আর'এর নায়েক সুবেদার আলী আকবরের অধীনে কাট অফ পার্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

যখন 'ডি' কোম্পানী বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়; নায়েক সুবেদার বুলু মিয়া ১১নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনে আর সুবেদার করম আলী ১০নম্বর প্লাটুন নিয়ে রেলওয়ে জেটির দিকে অগ্রসর হয়। তখন ভোর হয় হয় প্রায়। রেল লাইনের ওপাশে তখন দুশমনরা 'স্ট্যান্ড-টু'র জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এদিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন তখন রেললাইনের উপর শানটিং করছিল। গাড়ী শানটিং করে পিছে যাওয়ার সাথে সাথে সুবেদার করম আলী প্লাটুনের রকেট লাঞ্চারটি নিজে কাঁধে করে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে মালগাড়ীতে অবস্থানরত জেনারেটর এবং পর মুহূর্তে অগ্রসরমান শানটিং গাড়ীর ইঞ্জিনকে ফায়ার করে অকেজো করে দেন। আর সাথে সাথে ডানে অবস্থানরত সুবেদার ভুলু মিয়ার প্লাটুন ফায়ার শুরু করে এবং গ্রেনেড পার্টি রেলের প্রত্যেক কামরায় গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করে। প্রায় প্রত্যেক কামরাতেই ৩/৪ জন করে খাকি পোশাক পরিহিত লোক শুয়ে ছিল। এদিকে এ্যাকশন পার্টি (২টি প্লাটুন) উইথড্রয়ালের সাথে সাথে ৩"মর্টার গর্জে উঠে। ফলে স্থায়ী ভাবে যে দুটি প্রথম শ্রেণীর কামরা আর্মিগার্ডের জন্য রাখা হয়েছিল তাও বিধ্বস্থ হয়। এছাড়া রেলওয়ে স্টেশন, বহু রেলওয়ে বগী এবং ঘাটে অবস্থানরত মালগাড়ী বহনকারী স্টীমার এবং জেটির ছাদের উপর দুশমনের মেশিনগানের বাংকার ভীষণভাবে বিধ্বস্থ হয়। স্টেশন এরিয়া থেকে উইথড্র করা কালে দুশমনের একটি গুলি নায়েক সুবেদার ভুলু মিয়ার বাম বাহুতে লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। এই আক্রমণকালে নায়েক সুবেদার ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কেউ হতাহত হয়নি। অপারেশন শেষে নদী পাড় হয়ে পুরো ব্যাটালিয়ন নিরাপদ আর.ভি তে সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল তখনই তেলঢালায় ফিরে না গিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে আরও কিছুদিন অবস্থান করে কয়েকটি অভিযান চালিয়ে পাক বাহিনীর ফিজিক্যাল ক্ষতি ছাড়াও ওদের মনোবল মিছমার করে দিতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের সবল অভিযান যে এখন সমাসন্ন এ সত্যটি তাদেরকে স্পস্ট বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তাদের দিন শেষ। পরদিন দেওয়ানগঞ্জ চিনিকল ও



www.amarboi.org

রেলস্টেশন সংলগ্ন পাক ঘাঁটিগুলো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।আমরা ১২টি ৫০০/১০০০মন এর বিশাল বিশাল নৌকায় ওঠে পুরোন ব্রহ্মপুত্র নদ ধরে রওনা হয়ে গেলাম। নায়েব সুবেদার করম আলীর নেতৃত্বে একটি প্লাটুন আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ব্রিজটি ধ্বংস করার জন্য। ঐ দায়িত্ব সে সাফল্যের সঙ্গেই পালন করে। এর পরের বিবরনও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার শাফায়াত জামিলের মোটামুটি হুবহু বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করা হল। পথে একটি গ্রামের বাসিন্দারা খুব সমাদর করে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। প্রায় সাড়ে চারশ' সৈনিকের আহারের জন্য গরু জবাই করল তারা । দুপুরের খাওয়া ত হলোই সঙ্গে তারা রাতের খাবারও দিয়ে দিল। গরিব গ্রামবাসিরা গরু জবাই করায় তাদে কিছু টাকা দিতে চাওয়ায় টাকা ত নিলই না বরং কিছুটা রেগেই গেল। 'আমরা শত্রুকে মোকাবেলায় অস্ত্র ধরতে পারিনা। আপনাদের জন্য কিছু করার সুযোগ পেলাম সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এই তৃপ্তিটা থেকে কেন বঞ্চিত করবেন।' দিনশেষে সেই গ্রাম থেকে দেওয়ানগঞ্জের দেড় দুই মাইল আগে যাত্রা বিরতি করে অবস্থার স্টক নেওয়া হল। পূর্ব প্ল্যানানুযায়ী ডেলটা কোম্পানী দেওয়ানগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন পাক সেনাদের অবস্থানে হামলা চালাবে। চিনিকলের রেস্টহাউজে অবস্থানরত পাক সেনাদের আক্রমণ করবে আলফা কোম্পানীর আনোয়ার। আর কমান্ডার নিজে হেডকোয়ার্টার কোম্পানী নিয়ে ঘাটের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। প্ল্যান ছিল ডেলটা কোম্পানীর আক্রমণের গুলির শব্দ শোনা মাত্র আলফা কোম্পানী সুগার মিলের রেস্ট হাউজ এলাকায় অভিযান চালাবে। ডেলটা কোম্পানী স্টেশনে পাক সেনাদের অবস্থানে সফল আক্রমণ সমাপ্ত বরে সকাল ৯টার দিকে ঘাটে ফিরে আসে। আলফা কোম্পানী তাদের অভিযান সফল করে আগেই ফিরে এসেছিল। আলফার অধিকাংশ সেনা নদী পার হয়ে কাছের একটি গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার উপর পাকিস্তানী জঙ্গি বিমান ও কপ্টার গুলি লো ফ্লাইং শুরু করায় ডেলটা কোম্পানী সহ নদী পার হয়ে পাশের গ্রামে আশ্রয় নিতে হল। সেখানেও একই অবস্থা । গ্রামবাসীদের পীড়াপীড়িতে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে খেতেই হল। রাতে সবুজপুর ঘাট সংলগ্ন গ্রামটিতে ফিরে এলাম। তার পরদিন বাহাদুরাবাদ ঘাটে বহু গানবোট ও মোটর বোট যাতায়াত করলেও একটিকেও রকেট লাঞ্চারের বা মেসিন গানের রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া গেলনা। পাকিস্তানীরা বহু সৈন্য এনে বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকায় তাদের অবস্থান আবার সুরক্ষিত করেছিল।



www.amarboi.org

দেওয়ানগঞ্জ অভিযানে এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটে। রেল স্টেশন অপারেশন শেষে ফেরার সময় ডেল্টার সেনারা ৬টি সশস্ত্র রাজাকারকে বন্দি করে নিয়ে আনে। হত্যা বা কোনরকম শাস্তি না দিয়ে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেই এবং তারা আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। তারা আমাদেরকে বলেছিল মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ না পেলে কোন যুবকের পক্ষেই রাজাকারীতে যোগ না দিয়ে উপায় নাই। যোগ দিতে না চাইলে শান্তি কমিটি আর দালালেরা খবর দিয়ে দেয়। পাক সেনারা রাতের বেলা ধরে নিয়ে গুলি করে মারে। যাদের ধরে নেয় তারা কেউ আর ফিরে আসে না। এটা মুক্তিযুদ্ধ কালীন আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ রাজাকারই একদিকে আর্থিক অনটন সাথে দালালদের চাপে রাজাকারীতে নাম লিখিয়েছিল। শহরের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এখানে অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের ক্যাডার, সামরিক-বেসামরিক আমলা, পেশাজীবি ইত্যাদিদের মধ্য থেকে আসল কট্টর রাজাকার আলবদর ক্যাডার গোষ্ঠি পাকিস্তান রক্ষায় হাতিয়ার ধরেছিল। তারা আজও মন্ত্রীসভা থেকে সর্বস্তরেই বহাল তবিয়তে আছে। গ্রামের রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করত এ খবর অহরহই আমাদের কাছে আসত। এর পরেই পাক সেনারা সবুজপুর এলাকায় গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করেছে।

তিনদিন বিজয়ীর বেশে অবস্থান করার পর ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিজ ক্যাম্পে ফেরত আসার পথে দেখল শাহ কামালের মাজারের কাছে তার জীপের পাশে স্বয়ং উৎকণ্ঠিত জিয়া দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গম্ভীর স্বরে বিলম্বের কারণ জানতে চাইলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মেজর জিয়াকে অন্য অভিযান গুলির কথা জানাতে তিনি বললেন কেন আমরা অপরিকল্পিত অভিযান করতে গেলাম। জানালাম বাহাদুরাবাদ অভিযানের সাফল্যে সবাই খুব উৎসাহিত হওয়ায় পরবর্তী অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। স্বদেশের মাটিতে পা রেখে যুদ্ধ করতে সবাই উদগ্রীব ; কেউ ফিরতেই চায়না। আর এ কদিন ভেতরে থেকে যুদ্ধ করে বুঝলাম বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থান করে যুদ্ধাভিযান চালানো কোন ব্যাপারই না। এ কথা শুনে জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া খুবই উৎসাহিত হয়ে বলেই ফেললেন, তহলে ত সবাইকে নিয়ে শীগগীরই ভেতরে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাঁর এই উৎসাহকে নস্যাৎ করতে যে চক্রান্ত চলছিল তা ত তিনি জানতেন না আর আমরাও জানতামনা।



www.amarboi.org

যাই হোক এই আক্রমণগুলি ছিল পরিপূর্ণ সার্থক আক্রমণ। এই সফলতার প্রধান কারণ ছিল ধীরস্থির নির্ভীক যোদ্ধা মেজর শাফাআত জামিলের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দক্ষ পরিচালনা এবং ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের ই-পি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক অধিক সংখ্যায় থাকার জন্য ব্যাটল প্রসিডিউর মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার সুফল।

## ১১ নম্বর সেক্টরে জেড ফোর্সের অবিস্মরণীয় যুদ্ধসমূহ

### ॥ নকশী বি-ও-পি আক্রমণ ॥ ৩

www.amarboi.org
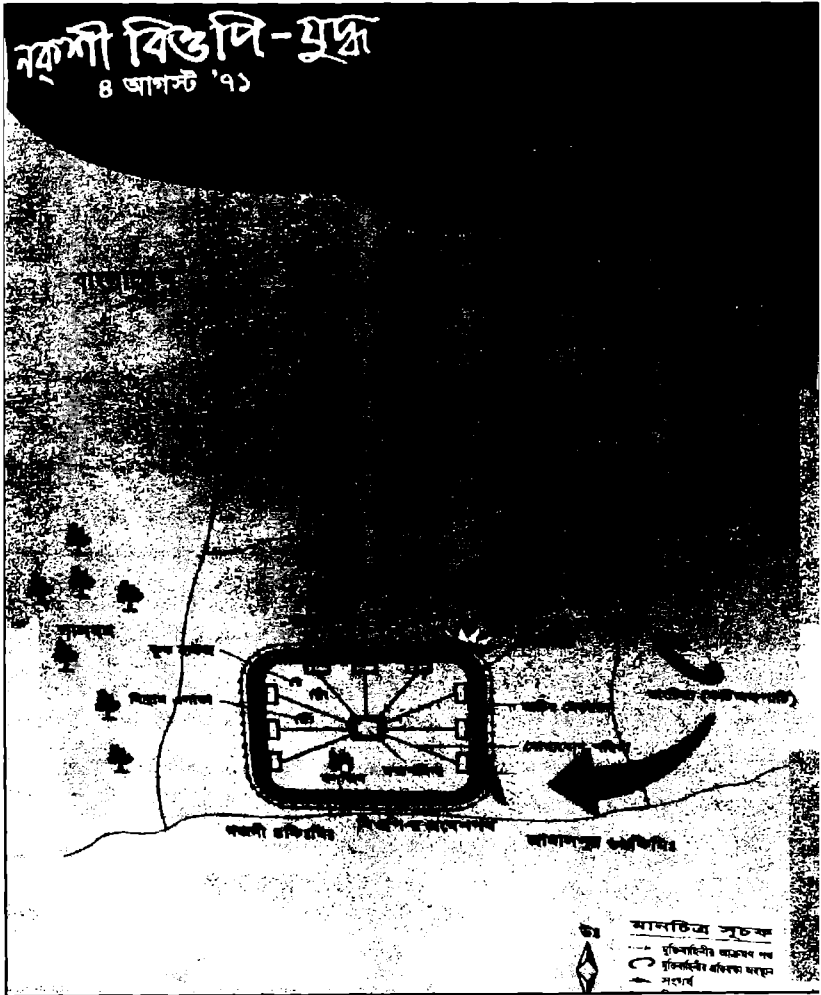
৩ আগস্ট ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো ও ডেল্টা এই দুই কোম্পানী নকশী বি-ও-পি আক্রমণ করে। আক্রমণের আগে তিনদিন ধরে বি-ও-পি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রেকি করা হয়। নকশী বি-ও-পি'র পূর্বকালীন সুবেদার হাকিম ও তার সাথীরা এ কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রথম দিন ক্যাপ্টেন আমিন সুবেদার হাকিমসহ একটি উঁচু টিলা থেকে নকশী বি-ও-পি'র আশেপাশে রেকি করে। বাইনোকুলারে সুবেদার হাকিম কোথায় শত্রুদের বাংকার, কতটা তারের বেড়া, বাঁশের কঞ্চি, মাইন ফিল্ড, কুক হাউস, মসজিদ ও বি-ও-পি'র প্রবেশ পথ, কোথায় কত সান্ত্রী থাকতে পারে ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে।। তারপর ছদ্মবেশে গারো পাড়ায় গিয়ে দেখা হল শত্রুশিবিরে আমাদের প্রেরিত বাবুর্চির সংগে। বাবুর্চি বললো, সে ৪৫ জন আর্মির খাবার রান্না করেছে এবং আরো ৬৫ জন আর্মির জওয়ান আসছে এবং এর অতিরিক্ত আরও ৫০/৬০ জন রাজাকার বিভিন্ন ডিউটিতে আছে। দ্বিতীয় দিন প্লাটুন কমান্ডারকে নিয়ে আবার স্বচক্ষে হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালা পথ রেকি করে কোথায় কোন হাতিয়ার পজিশন হবে এবং কোথায় এফ-ইউ-পি হবে (ফর্ম আপ প্লেস) এ ব্যাপারে সকলকে ব্রীফ করা হলো। রাতের আঁধারে ভুল এড়াবার জন্য পহেলা আগস্ট সব সেকশন কমান্ডারগণ যার যার জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখে নিল। এদিকে সার্পোর্টিং হাতিয়ার মেশিনগান, ১০৬ মিঃ মিঃ ও ৭৫ মিঃ মিঃ আর-আর' এর জন্য বাংকার বানাবার জন্য ২৫টি আড়াইমন ধারণক্ষম মোটা চটের বস্তা আনা হল। এত প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়েছিল শালবনের ঘন আড়ালের জন্যই। অবশ্য পাকিস্তানীরা উত্তর দিকে বি-ও-পি'র চতুর্পার্শ্বে প্রায় ৬০০ গজ এলাকায় সমস্ত গাছপালা, জংগল পরিস্কার করে ফিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে সাফ রেখেছিল। তৃতীয় দিনে রেকি করা কালে হালছটি গ্রামের নালার পাশে আমরা তখন একটি আমগাছের মাথায় লাল ফুলকে মানুষ (স্নাইপার) মনে করে থমকে দাঁড়ালাম। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হাসতে যাব এমন সময় ঝুপ করে একটি শব্দ হলো, মনে হলো একটি লোক নালার ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। সেকশন কমান্ডাররা তড়িঘড়ি করে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পজিশনে গেল। মারাত্মক ভুল। তাদের করণীয় ছিল আরও ছড়িয়ে পরে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ করে (ডায়মন্ড ফর্মেশন) অলরাউন্ড ডিফেন্স নেওয়া। বোঝাগেল আরো অনেক ট্রেনিং-এর দরকার। ঝুপ করে যে আওয়াজ হয়েছিল সেটা আসলে নালার পাড় ভেংগে ধসে পড়া মাটি থেকে। তা না হলে গোল হয়ে বসে থাকা আমাদের দলটিকে নিমেষের মধ্যে শেষ করে দেয়া একজন শত্রুসৈন্যের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। ফেরত আসার সময় একটি গারো মেয়ে



www.amarboi.org

আমাদেরকে দেখে চুপ করে পাহাড়ের গাছের সাথে মিশে রইল। আমরা ধারণাই করতে পারিনি যে অমন ফাঁকা জায়গায় কোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

২রা আগস্ট বিকালে মেজর জিয়াউর রহমান স্বচক্ষে আমাদের প্ল্যান মোতাবেক হাতিয়ারের অবস্থান গুলো দেখলেন। ৩ আগস্ট রাত ১২টার দিকে এসেম্বলি এরিয়া থেকে রওনা হবো-দেখি বাহাদুরাবাদ ঘাটে বিজয়ী বীর মেজর শাফায়াত জীপ নিয়ে হাজির। তিনি বললেন, Amin, better rethink, don't make any dicey move all by yourself. If you're confident enough, go headlong. I wish you all the best. (আমি বলতে চাচ্ছি যাই করো অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে করো, মোহের বশে কিছু করে আফসোস করোনা। নিজের উপর পূর্ণ আস্থা থাকলে এগিয়ে যাও- আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল) এসেম্বলি এরিয়া থেকে ৮ বেঙ্গলের সৈন্যরা অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এফ-ইউ-পিতে পৌঁছে গেল। এমনকি মাঝপথে নালা ক্রস করার সময়ও কোন শব্দ করেনি, কারণ পূর্ববর্তী দু-রাত বিনা শব্দে পানির উপর চলার প্র্যাকটিস করা হয়েছিল। অন্য দিকে একই সময়ে দুই প্লাটুন রাঙ্গাটিয়াতে যায় কাট-আপ পার্টি হিসাবে। যদিও ই-পি-আর'এর গার্ড ছিল তথাপি মনে হয় এফ-ইউ-পি মার্কিং করলে যে সামান্য বিশৃংখলাটুকু হয়েছিল তাও হত না। সৈন্যরা যখন এফ-ইউ-পি'তে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন আমিন তখন ৮/১০ জন এফ এফ ছাত্র নিয়ে এম-জি ও আর-আর এর অ্যাম্যুনিশন বাংকারে পৌঁছে দেয় ; উদ্দেশ্য, ওদের মনে সাহস যোগানো। কারণ যুদ্ধের ফলাফল এদের উপর অনেক খানি নির্ভর করেছিল। বাংকারের পশ্চাতে অবস্থানরত সুবেদার হাকিম তখন রীতিমত খেপে গেছেন, কারণ ইনি নিজে তো খাবার পানই নি, তার ছেলেরাও যারা সারারাত ঐ আড়াইমনী বস্তায় বালি ভরে বাংকার বানিয়েছে ওরাও পায়নি। সুবেদার হাকিমকে বুঝিয়ে বলা হল ভুলক্রমে তাদের সবার খাবার রুটি ও গোস্ত পেছনে এসেমব্লি এরিয়াতে রয়ে গেছে, লোক পাঠানো হয়েছে, এখনই এসে পৌঁছবে। এফ-ইউ-পি' তে সুবেদার হাকিম মেজর আমিনকে একাকী শত্রুঅভিমূখে ঠেলে না দিয়ে তিনি নিজেও সাথে যেতে চাইলেন। ক্যাপ্টেন আমিন সেই দুঃসাহসিক বীর যোদ্ধাকে ইকনমির কথাটা বুঝাতে চাইল। নিছক ভাবাবেগে কাজ হবে না একসঙ্গে দুজন অফিসার হারানো মুক্তি বাহিনীর জন্য নিছক বোকামি। রাত ৩-৩৫মিনিটে এফ-ইউ-পি' তে পজিশন নেওয়া হল। আমাদের ডানে ১২নং প্লাটুন আর বামে ৫ নং প্লাটুন। আর সেই ১২ নং প্লাটুনে ক্যাপ্টেন আমিন এর এক ভাগ্নে আই-এ ক্লাশের ছাত্র জহিরুল আনোয়ার ওরেফে সানু সাধারণ সৈনিক হিসেবে তার পাশেই ছিল। এই সংবাদটি আমি জানতেই পারিনি অথচ আজ



www.amarboi.org

আকাশচুম্বি দূর্নীতি আর স্বজনপ্রীতি আমাদের সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে রীতিমত খোলামেলা ভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছে সেদিন কিন্তু এমনটি চিন্তায় আনার সুযোগই ছিলনা। তাই যুদ্ধের ময়দানে নিজের ভাগ্নের উপস্থিতি টের পায়নি।

আমিন এফ-ইউ-পি' তে পজিশন নিয়ে ৩-৪৫ মিনিটে অয়ারলেসে বলল-'জোরে মার।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টিলারী গর্জে ওঠলো। বুঝতে পারলাম আর্টিলারীর আওয়াজের প্রচন্ডতায় আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা এফ-ইউ-পি' তে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা আরো প্রকট হয়ে উঠলো যখন নিজেদের এই প্রি-এইচ আওয়ার আর্টিলারী গোলাবর্ষণ কালে দু-তিনটি রাউন্ড ভুলবশত ঠিক আমাদের এফ-ইউ-পি' তে এসে পড়ে- যদিও বা টার্গেট থেকে এফ-ইউ-পি ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূরে। মনে হয়, এফ-ইউ-পি, শত্রু শিবির ও আমাদের আর্টিলারী পজিশন এক লাইনে ছিল বলে সহজে আর্টিলারী গোলা এসে এফ-ইউ-পি'তে পড়ছিল। পূর্বাহ্নে আর্টিলারীর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলে কিংবা এত নিম্নমানের হতে পারে এ ধারণা থাকলে হয়ত ডানে হালছটি গ্রামের শালবনকে এফ-ইউ-পি বানান হত। হালছটি গ্রামের শালবনটি শত্রুশিবির থেকে মাত্র তিনশ' গজ দূরে ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে ঐ শালবনকে এফ-ইউ-পি বানিয়ে এফ-এফ কোম্পানী বি-ও-পির উপর আক্রমণ করেছিল, তাই ঐ শালবনটিকে এফ-ইউ-পি বানান হয়নি। অন্যদিকে পূর্বদিন আমার পরিকল্পনা ছিল সামনের নালাকে এফ-ইউ-পি বানিয়ে আর্টিলারীর "ফায়ার অন কল" রেখে (দরকার মত ব্যবহার করা) আক্রমণ করা। তাতে করে রাতের আঁধারে শত্রুর অজান্তে আমরা শত্রুশিবিরের ২/৩শ' গজ ভিতরে পৌঁছে যেতাম আর নিজেস্ব আর-আর ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে আচম্‌কা ঘায়েল করে শত্রুর ব্যূহ্যভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস ছিল। আর বিশেষ দরকার মত আর্টিলারী সাপোর্টে তো ছিলই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পূর্ব পরিকল্পনা বদল করে প্রি-এইচ আওয়ার (আক্রমণের পূর্বাহ্নে) গোলাবর্ষণের কার্যক্রম নিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধের আগেই এফ-ইউ-পি' তে নিজেদের আর্টিলারী এই দু-তিনটি রাউন্ড এসে পড়াতে আমার ছয়টি ছেলে ঘটনাস্থলে গুরুতর রূপে আহত হয়। ফলে পুরা প্লাটুন আহতের শুশ্রূষার নামে এফ-ইউ-পি তে থেকে যায়।



www.amarboi.org

এতে যথেষ্ট শোরগোলও হয়। অপরদিকে প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে আমাদের আর্টিলারী গর্জে ওঠার মিনিট খানেকের ভিতর পাকিস্তানী আর্টিলারী গর্জে ওঠে। একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি-বিশেষ করে আমার দুই কোম্পানীর জন্য। কারণ আমার দুই কোম্পাণীতে (৮ম ইস্ট বেঙ্গল) দু'শ জনের মধ্যে তখন মাত্র ১০জন সামরিক বাহিনীর লোক, গোটা আটেক ই-পি-আর এবং দু'তিন জন পুলিশের লোক ছাড়া বাকী সবাই সাতদিনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাম বাংলার একান্ত সাধারণ তরুণ। প্রি-এইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের সাথে সাথে আমার ডানে অবস্থিত মেশিনগান ও আর-আর প্রচন্ডভাবে গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালছটি গ্রাম থেকে ই-পি-আর'এর প্লাটুনটি ভাওতা দেওয়ার জন্য আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে শত্রুদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিল। এই কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে হতে থাকে। ই-পি-আর'এর আক্রমণ চলাকালীণই আমরা চুপি চুপি এক্সটেনডেড লাইন ফরমেশন করে পায়ে পায়ে এগুতে থাকি। এ অবস্থায় সুবেদার জালাল যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করলেও পরবর্তীকালে তার আর সাক্ষাৎ পাইনি। এফ-ইউ-পি ছাড়ার সাথে সাথে একটি ছেলে পাশ থেকে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলো,"স্যার' বাঁ দিক থেকে গুলি আসছে যে" -ভাবখানা এই গুলি তার পিছু ধাওয়া করছে। হাসি পেলেও চিৎকার করে উঠলাম -" গুলি আসবে না তো কি বারিধারা আসবে?" ৫০০ গজ আগে নালার কাছে পৌঁছে শুধু ২" মর্টার ওয়ালাদেরকে নালার পাড়কে আড়াল রেখে ৩০০ গজ আগে শত্রুশিবিরের উপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। এই নির্দেশ না দিলেই যেন ভাল হতো, কারণ আমার এই নির্দেশের সুযোগে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা নালাতে আড়াল নিয়ে নেয় তাতে কমান্ড ও কন্ট্রোল একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে। নায়েক সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে ৫ ও ৬ নং প্লাটুন বি-ও-পি'র গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার কথা ছিল, কিন্তু তারাও নালার ভেতরে আড়াল নিয়ে মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করতে শুরু করে। সম্ভবতঃ এই জন্যই এফ-ইউ-পি ত্যাগ করার পর ফায়ার এন্ড মুভ পদ্ধতিতে আক্রমণ করা মিলিটারী একাডেমীতে (পাকিস্তান) বির্তকের বস্তু ছিল এবং প্রায় বলা হতো এফ-ইউ-পি ছাড়ার পর ডোন্ট গো টু দি গ্রাউন্ড এগেইন। নালাতে আমার সৈন্যদের এমন কান্ড দেখে শত্রুশিবিরের কিটবর্তী এসেও আমি চিৎকার না করে পারিনি, এমন কি কাউকে



www.amarboi.org

কাউকে পর্যন্ত লাঞ্ছিতও করেছি। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে জোর করে ধরে ধরে আগে পাঠাতে চেষ্টা করি। বামে হাবিলদার নাসির অত্যন্ত সাহসের সাথে ক্ষিপ্রগতিতে এগুতে থাকে এবং আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সাথে করে ডানে বাংকারের দিকে এগুতে থাকি। আমাদের এই মনোবল দেখে শত্রুরা তখন পলায়নরত। ইতোমধ্যে আমরা এসল্ট লাইন ফর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে 'চার্জ' বলে হুংকার দিই এবং পর মুহূর্তে 'ইয়া আলী' বলে আমার সৈন্যরা সংগীন উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য রীতিমত দৌড়াতে শুরু করে। এদের উত্তেজনাকে বাড়াবার জন্য নায়েক সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি করলে সৈন্যরা ঘন ঘন 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি করে সমস্ত যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলে। আনন্দের আতিশয্যে আমার সিগনালম্যান অয়ারলেস সেট আমার সামনে এনে ধরলে আমি বলে দিলাম 'তুমি নিজেই যা পার বলে পাঠাও'। পিছু পিছু সে অয়ারলেসে জোরের সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছিল, "হয়ে গেছে, আর একটু বাকি----বাংকারে বাংকারে যুদ্ধ জয় হচ্ছে"--- ইত্যাদি। ঠিক এমন সময় শত্রুদের আর্টিলারীর স্যালভো ফায়ার (এয়ার বার্স্ট) এসে পড়লো আমাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন ঢলে পড়ল, যার ভেতরে সম্ভবতঃ হাবিলদার নাসিরও ছিল। আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমার ডান পায়ে এসে একটা শেল লাগল, আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই জোশের সাথে এগিয়ে গেলাম আরো পঞ্চাশ গজ। শত্রুবাংকার মাত্র পাঁচ গজ বাকি। আমাদের গুটিকতক ছেলে তখন পলায়নরত শত্রুদেরকে মারছে। কেউ কেউ মাইন্ড ফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে শত্রুর মাইনে উড়ে যাচ্ছে। কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমতবস্থায় অনার্সের ছাত্র শামসুল আলম শত্রুর পাতা মাইন কিংবা তোপের মুখে উড়ে গেল। ঐ বিশ-পঁচিশটা ছেলের মনচাংগা রাখার জন্য জোরে জোরে চিৎকার করে উঠলাম "বি-ও-পি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। আগে অগ্রসর হও" যদিও বি-ও-পি'র মাটির দেওয়াল আগের মতই ঠিক খাড়া ছিল। এমন সময় আমার বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চি বিঁধলো, আমি পড়ে গেলাম। সম্ভবতঃ পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহত এক পাকসেনা এলো সংগীন নিয়ে। বাচ্চা ছেলে সালাম (অস্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং এক সুবেদার মেজরের ছেলে) আগেই খতম করে দিল পাকসেনাকে। এদিকে যারা মাথা নিঁচু করে পেছনের নালা থেকে আন্দাজে ফায়ার করছিল তাদের ফায়ারে আমাদের দুটি ছেলে জখম হল। করার



www.amarboi.org

কিছুই নেই তখন। এর আগে এফ-ইউ-পি থেকে এডভান্স করাকালীণ নালাতে অবস্থান করা কালে অমন মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করার জন্য আমি একটি ছেলের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দেই। মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি দুটি ধাবমান শত্রুকে গুলি করে ডানদিকে বাংকারে অবস্থানরত শত্রুসেনাকে গুলি করার জন্য বিহারী ছেলে হানিফকে ঘন ঘন নির্দেশ দিচ্ছিলাম। অবশ্য হানিফ তখন ভীষণ ভাবে অনুরোধ করছিল "স্যার, আপ পিছে চল্ যাইয়ে, ম্যায় কভারিং দে রাহাহুঁ"। বলা বাহুল্য, বিহারী ছেলে হানিফ ছিল আমার ব্যক্তিগত প্রহরী। বরিশালের এক বাংগালী মেয়েকে বিয়ে করেছিল হানিফ। বেশ কয়েকটা অপারেশন করার পরেও সন্দিহান হয়ে মুক্তিবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। বন্দীশিবিরে স্পষ্ট বাংলায় সে আমাকে বলল' "স্যার, আমি বেঈমান না, একটা চান্স দিন, জান দিয়ে প্রমাণ করবো।" পিঠ চাপড়িয়ে আমি বললাম -"হানিফ আজ থেকে তুমি আমার পারসোনাল গার্ড। পারবে?" "স্যার, আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না।"- প্রত্যয় ভরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল হানিফ।

সত্যি সে জীবিত থাকাকালীন আমার গায়ে গুলি লাগেনি (যদিও শেলের টুকরো লেগেছে)। হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেবার আগেই হিস শব্দ হল, হানিফ ঢলে পড়ল, মনে হয় ওর মাথায় গুলি লেগেছে। তার মাথায় স্টীল হেলমেট ছিল না! ক্রল করে ওর হ্যাবারসেকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে উঠলাম 'হানিফ' - কোন সাড়া আসল না। প্রাণটা কেঁদে উঠল। সাথে সাথে শত্রুর গুলিতে পাশের মাটি উড়ে গেল। বুঝতে পারলাম শত্রু আমাকে দেখে ফেলেছে। সাইড রোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করা কালীন বামদিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডান হাতের কনুইতে লাগল। ঝাঁ করে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল, হাতের স্টেনটা ছিট্‌কে পড়ল। বাঁ হাতে তা কুড়িয়ে নিলাম। কব্জিটা বেঁকে গেছে। প্রচুর রক্ত বের হচ্ছে। ফিল্ড-ড্রেসিংটা বের করব- একঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইলটা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলাম শত্রুর পাঁচ গজের ভিতর আর থাকা সম্ভব নয়। আমার দু-ধারে শুধু লাশ আর লাশ। কারণ, এর আগের মুহূর্তে এস-ও-এস (সেইভ আওয়ার সোল), এয়ার বর্স্ট, আর্টিলারী ফায়ারে আমাদের যে ৮/১০ জন সেনা শত্রুরবাংকারে ঢুকে পড়েছিলো তারা ধরাশায়ী হলো। তার মধ্যে নায়েক সিরাজ এবং পুলিশের ল্যান্স নায়েক সুজা মিয়াও ছিল। পাশে



www.amarboi.org

তাকিয়ে দেখি একটি কচি ছেলের লাশ। ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে শত্রুর গুলিতে ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে শত্রুর ডান বাংকার এড়িয়ে কোনাকুনি আরো ডানে অধিকতর নিরাপদ স্থানে হালছটি গ্রামের দিকে যেতে চেষ্টা করছিল।
শত্রুশিবির পাঁচ গজের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য ফিল্ড ড্রেসিং আর বের না করে সাইড রোল শুরু করলাম। উদ্দেশ্য, ডানের ঢালু জমি দিয়ে অধিকতর নিরাপদ রাস্তাতে পশ্চাদপসরণ করা। কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর তাকিয়ে দেখি আসলে ডানে না গিয়ে আমি কোনাকুনি শত্রু শিবিরের দিকে যাচ্ছি। মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে, তাই একটু দম নিয়ে পিছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। শরীর গরম থাকতে থাকতেই আমাকে হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় পৌঁছতে হবে। ক্রলিং শুরু করব, এমন সময় দেখি বাচ্চা ছেলে সালাম, যে পঞ্চাশ গজ ক্রল করে পিছনে গিয়েছিল হঠাৎ করে আবার দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটা এল-এম-জি নিয়ে শত্রুবেষ্টনীর দিকে ধাবিত হলো। ছত্রভংগ হয়ে যাওয়া শত্রু তখন পুনরায় কাউন্টার এ্যাটাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পিছে জমায়েত হচ্ছিল। 'ওরে তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি ছেড়ে দেব?' বিড় বিড় করে পাগলের মত সালাম শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। অতি কষ্টে একবার ডাক দিলাম 'সালাম চলে এসো।' কিছুক্ষণ আগে যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল সেই সালামকে আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি। অথচ বাচ্চা বলে এবং তার সংসারে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি বলে আমি তাকে যুদ্ধে সামিল করিনি। কিন্তু সে পালিয়ে এসে এসেম্বলী এরিয়াতে আমাদের সাথে চুপি চুপি যোগ দেয়। বাংলার শ্যামল গালিচার দুর্বাদলের মাঝে এমনি করে লুকিয়ে আছে হাজারো সালাম।
সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটা তখন মহাশ্মশান, মৃতদেহ ছাড়া আর জ্যান্ত মানুষ নেই-বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে দু-দিক থেকে। শালবনে অবস্থানরত আমার মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠছে। সম্ভবতঃ আমার ক্ষতবিক্ষত পশ্চাদসরণকারী সৈন্যদেরকে কভারিং ফায়ার দিচ্ছিল। তাই আমি নিজেদের ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য ডাইনে অপেক্ষাকৃত নিচু ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করি। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠলো- 'এরে আঁই বাঁচতে চাই, তোরা কেউকি আঁর কথা শুনছিস না। এরে আঁরে লই যা।' প্রাণটা কেঁদে উঠলো, যদিও করার কিছুই ছিল না। তবুও দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, "চিৎকার করিস না।" তবে তার কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগেই ঐ এলাকা বরাবর একটি আর্টিলারী



www.amarboi.org

শেল এসে পড়লো। মাথাটা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকাকালে আঁচ করলাম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমার পাশের মাটি গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ হাত ঠেলে ঠেলে নিজের আহত শরীরটাকে নালার দিকে নিয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে আর কোন চিৎকার শুনিনি। নালার কাছে পৌঁছে সর্বশক্তি নিয়োগ করে খাড়া হয়ে টলতে টলতে কেমন করে জানি নালাটা পার হয়ে গেলাম আজ বল্‌তে পারব না। মনে হচ্ছে বাঁচতে হবে এই জোরেই বুঝি নালাটা পার হয়েছিলাম। আর পাড়ে ওঠার সাথে সাথেই ধপ করে পড়ে গেলাম। তবুও স্বস্তিবোধ করলাম এই মনে করে যে, শত্রু থেকে অনেক দূরে এসে গেছি এবং অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায়। যেখানে এসেছি তাতে শত্রুর স্মল আর্ম ফায়ার থেকে প্রায় বেঁচে গেলাম। শরীরটা ক্রমশই ঠান্ডা হয়ে আসছিল,তাই সমস্ত জোর দিয়ে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম। আগেই একঝাক গুলি আমার পায়ের কাছের মাটি উড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে মাটির উপর গিয়ে পরলাম। শত্রুর আর গুলি আসছে না দেখে আবার একটু স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই টের পেলাম ১০/১২ জন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পিছনে নালার ওপারে আমার এক হতভাগ্য আহত জোয়ানকে পেয়ে এক গাল হাসি হেসে ওরা গুলি করলো। তারপর কিছুক্ষন কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তারপর হটাৎ করে শত্রুর দল থেকে এক বাংগালী আরেক বাংগালীকে বলছে, "মকবুল এদিকে আয়, পাওয়া গেছে।" বোধ হয় ঠেলে আসার ফলে কর্দমাক্ত মাটিতে রাস্তা হয়ে গিয়েছিল আমার পালাবার পথ। সাথে হাতের ও পায়ের রক্ত আরো বেশি করে চিহ্নিত করেছিল সেই পথকে। সেই থেকে শত্রুর সাথে শুরু হল আমার লুকোচুরি। ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে প্রায় ৩০০ গজ আসার পর ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এর পরের ২০০ গজ সম্পূর্ণ খোলা ময়দান। ঐদিকে কর্দমাক্ত মাটিতে কোমর পর্যন্ত পানিতে থাকার ফলে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভীষণ শীত করছিল। ভাবলাম আর বোধ হয় বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের তরফ থেকে কোন জনপ্রাণীরই চিহ্ন নাই। যে মেশিনগান এতক্ষণ ধরে প্রচন্ড বেগে ফায়ার করছিল সেও চুপ হয়ে গেছে। এফ-ইউ-পি তত্ত্বাবধানে যারা ছিল তারাও চলে গেছে। আমার নিজেস্ব কোন ঘড়ি ছিলনা। আক্রমণের আগে আমার রকেট লাঞ্চারওয়ালা তার নিজের ঘড়িটা আমাকে দিয়ে ছিল। ঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম। বেলা তখন ৮টা ১০মিনিট। রোদটা পিঠে লাগছিল। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। কেবলই মনে হচ্ছিল আমার একটা জওয়ান যদি একটা কাভারিং ফায়ার দেয় তবেই আমি রক্ষা পাই। শত্রু তখন পঞ্চাশ গজ দূরে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রমেই আমি তলিয়ে যাচ্ছি। শেষবারের মত টেনে-



www.amarboi.org

হেঁচড়ে নিজের বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারী শেলে সৃষ্ট একটি কালো মাটির গর্তে নিয়ে গেলাম। শত্রু যাতে সহজে দেখতে না পায়- গলা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাঁ হাতের কর্দমাক্ত কালো মাটি দিয়ে লেপে দিয়ে স্টীল হেলমেট মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে রইলাম। অপেক্ষায় রইলাম চরম মুহূর্তের, চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে, স্টেনটা বাঁ হাতে ধরা। বন্দী হবো না কোন ক্রমেই, বরং মেরে মরব। তবুও মনেপ্রাণে মরার কথাটা চিন্তা করতে পারছিলাম না। কেন জানি মনে হচ্ছিল এত অল্প বয়সে মরে যাব! চোখ দুটোকে আর খুলে রাখতে পারছিলাম না। ঠিক এমন সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনুল হকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো শলবন থেকে -"আমিন, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা কর।" আহত হওয়ার তিনঘন্টা পর এই প্রথমবারের মত সক্রিয় সাহায্য পেলাম। বস্তুত, আমার নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর আমিনুল হক তখন কমান্ডো প্লাটুন নিয়ে আমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছিল। মেজর আমিন হাবিলদার তাহের কে সাথে নিয়ে ক্রল করে আমার দিকে এগুতে লাগল। আমার কাছে এসে উভয়ে পর্যায়ক্রমে আমার পা ধরে মৃতদেহের মত টানতে শুরু করলো। পিঠের চামড়া উঠে যাচ্ছে, বিক্ষত ডান পায়ের ব্যথা অসহ্য হলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। সম্ভবতঃ বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনায় ব্যথা ভুলে গেলাম, লেফটেন্যান্ট মোদাচ্ছের তখন চিৎকার করছে শালবন থেকে -' তাড়াতাড়ি করেন স্যার।' তার দুই এল-এম-জি ওয়ালা তখন দুই গাছের উপরে উঠছে। শত্রুরা তখন আমাদের ২০/২৫ গজ পেছনে। একজন আহত জওয়ানকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। আমাদের দুই এল-এম-জি'ওয়ালা কেঁদে কেঁদে বলছে -"আপনাদের ধরে ফেললো যে স্যার।" যথাসাধ্য জোরদিয়ে বললাম ফায়ার কর।" আমাদের উপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে তাই জোয়ানরা ইতস্ততঃ করছিল। শত্রু তখন আমাদের উপর চার্জ করে আর কি। সঙ্গে সঙ্গে এল-এম-জি গর্জে উঠলো। ৬/৭টি খান সেনা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পরলো। মকবুল আর তার সাথী দালালকে আমরা হাতেনাতে ধরে ফেললাম। দুই খানসেনা পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে লাগলো। বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মাঝে মেজর আমিন আমাকে কাঁধে নিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে নিজেই আমাকে নিয়ে নালায় পড়ে গেল। "স্যার, প্লীজ আপনি চলে যান, তাহের আমাকে নিয়ে আসবে" আমি বলে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত জোর করে আমি হাবিলদার তাহেরের দিকে হাত বাড়ালাম। "স্যার প্লীজ, আপনি চলে যান" আবার বললাম। আর বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মধ্যে হাবিলদার তাহের আমাকে কাঁধে নিয়ে প্রাণপণে এক

-৮



www.amarboi.org

দৌড় দিল। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল তাহের। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "স্যার চিন্তা করবেন না, মরলে দু'জন একসাথেই মরব।"

এ যুদ্ধে ৮ বেঙ্গল জয়ী হতে পারলনা। এ অভিযানেও ব্যর্থতার যথেষ্ঠ কারণ ছিল। মেজর শাফায়েত জামিল আগেই ক্যাপ্টেন আমিনকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল। এ ধরনের যুদ্ধে জয়ী হতে হলে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন যেটা তাদের ছিল না।

নকশী বি-ও-পি আক্রমণকালে যারা শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছেন তাঁরা হলেন ঃ- ১। হাবিলদার নাসিরউদ্দিন ২। সিপাই মোহাম্মদ আলী ৩। সিপাই সিরাজুল হক ৪। ল্যাঃ নাঃ আবুল কালাম ৫। ল্যাঃ নাঃ মোঃ ইউসুফ মিয়া ৬। সিপাই হুমায়ন কবীর ৭। সিপাই মোঃ সুজা মিয়া ৮। সিপাই শামসুজ্জামান ৯। সিপাই আবদুস সাত্তার ১০। সিপাই ফয়েজ আহমেদ ১১। সিপাই আবদুস সালাম ১২। সিপাই মোঃ হানিফ, এক্স ই-পি-আর ১৩। সিপাই আব্দুস সালাম ১৪। সিপাই সদর উদ্দিন ১৫। সিপাই ফজলুল হক ১৬। সিপাই আবদুস সামাদ ১৭। সিপাই জামাল হোসেন ১৮। সিপাই আবু ইসমাইল ১৯। নায়েক আবদুস সালাম ২০। নায়েক সৈয়দ ফুল মিয়া ২১। নায়েক সতর উদ্দিন ২২। নায়েক হায়েত আলী ২৩। নায়েক আব্দুল কুদ্দুস ২৪। রবিউল আলম ২৫। সিপাই শাহজাহান আলী ২৬। সিপাই মনসুর আলী।

### জেড ফোর্স নিয়ে কর্ণেল জিয়ার সিলেট অভিমুখে যাত্রা

৫ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী তেলঢালা আসেন। তিনি জিয়াউর রহমানকে সিলেট অঞ্চলে ৪ ও ৫ সেক্টরের বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে তাঁর পূর্ণ শক্তির জেড ফোর্স নিয়ে সেখানে মুভ করার নির্দেশ দেন। কেননা সিলেট অঞ্চলের উপর পাক অনস্লট (onslaught) কে প্রতিহত করার উপযোগি আর কোন সংহত শক্তি কর্ণেল ওসমানীর হাতে ছিল না। 'কে' ফোর্স এবং 'এস' ফোর্স তখনও যুদ্ধ উপযোগি হয়ে ওঠে নাই আর ৪ ও ৫ সেক্টরের পক্ষে প্রথাগত যুদ্ধ করার মত কোন প্রস্তুতিই ছিলনা। এমতাবস্থায় মুক্তাঞ্চলের সব পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি ১০ অক্টোবর মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে সিলেট রক্ষার মিশনে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি একটি সুসজ্জিত প্লাটুন আমাকে দিয়ে গেলেন।



www.amarboi.org

www.amarboi.org
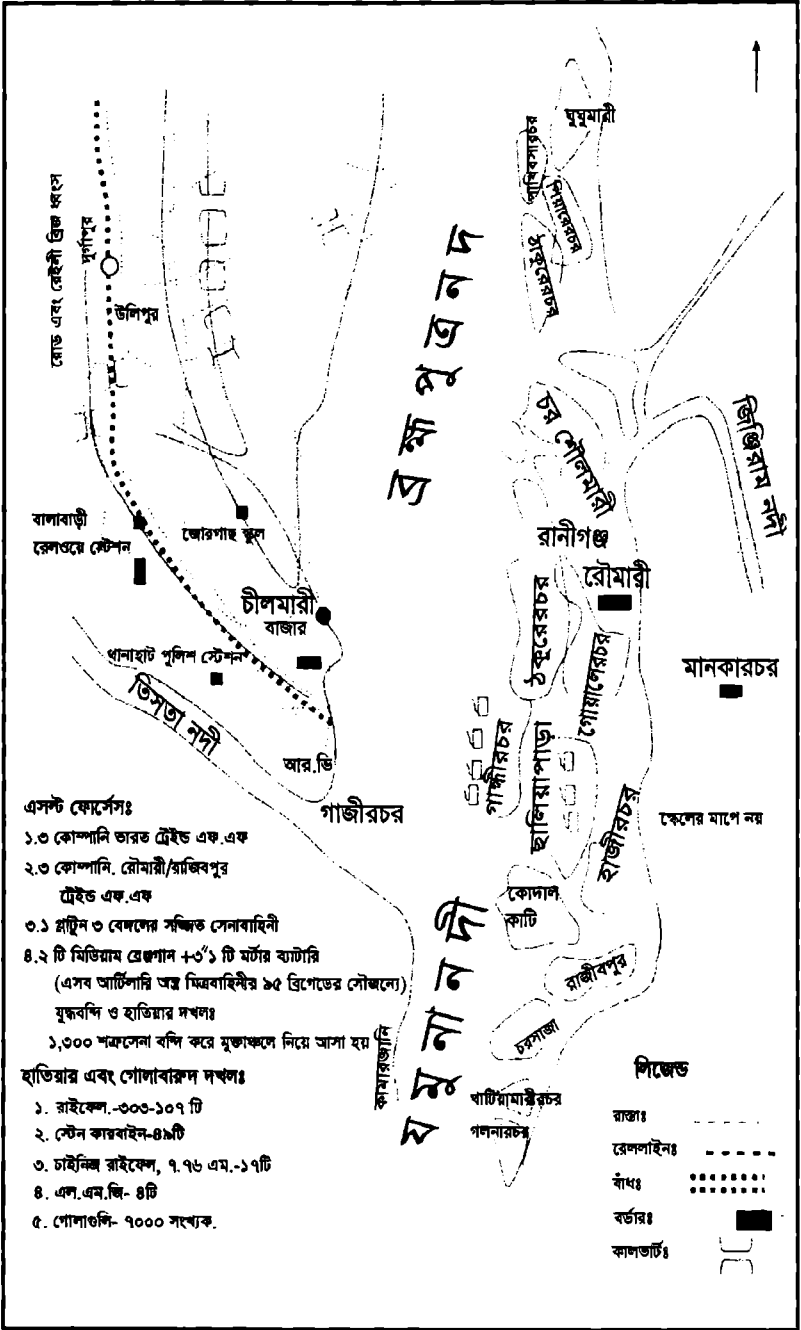
অক্টোবরের প্রথমার্ধ থেকেই ৪নং এবং ৫নং সেক্টরের করুণ অবস্থার ঘন ঘন আর্তবার্তা ৮নম্বর থিয়েটার রোডে আসতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে সিলেট সেক্টর দুটির চরম সংকটাপন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এম এ জি ওসমানী স্বয়ং উদ্যোগি হয়ে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে অক্টোবরের ৫ তারিখে জেড ফোর্স ব্রিগেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়ার হেড কোয়ার্টার তেলঢালায় এসে হাজির হন। এ' থেকেই অবস্থার বিপজ্জনক পরিস্থিতি আন্দাজ করা গিয়েছিল। জিয়া ১ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাথে নিয়ে ৪নং সেক্টরের সিলেট ডাওকি সড়কের দক্ষিণ-পূর্ব অক্ষে অবস্থিত চা বাগানসমূহের শক্ত পাক ডিফেন্স স্ট্রংহোল্ড গুলোর আক্রমণে সাহায্যার্থে রওয়ানা হয়ে যান। ৩ বেঙ্গল এর অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলকে নির্দেশ দেন, অবিলম্বে সম্পূর্ণ মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষা এবং মানকাচরের দায়িত্ব স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খানের উপর ন্যস্ত করতে এবং ঐ দিনই ১১নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব মন্দ্রেগঞ্জ সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহেরের উপর ন্যস্ত করতে। জিয়ার নির্দেশক্রমে মেজর শাফায়াত জামিল মেজর তাহেরকে সেক্টর চালিয়ে যাবার উপযোগি কিছু হাতিয়ার, যান বাহন ও লোকবলও দিয়ে যান। ঐ দিনই মেজর জিয়াউর রহমান রওয়ানা হয়ে সিলেটে অবস্থিত ৪নং সেক্টর বর্ডারের অপর পার্শ্বে অস্থায়ী কৌশলগতভাবে এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কম ঝুঁকিপূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য কয়েকটি স্পটে ব্যাট্ল এবং মেডিক্যাল সাপ্লাইসহ হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে ১ ও ৮ বেঙ্গলের যুদ্ধ কমান্ড নিজ হাতে নিলেন। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর আমিনুল হকের নেতৃত্বে দুই ফ্রন্টে সমান্তরালে চা বাগানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দিতে থাকেন। কেননা ঐ অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনী শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। পরিকল্পনা ছিল চা বাগানগুলো শত্রুমুক্ত করে সিলেটের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

## বাঁশতলার পথে

জেড ফোর্স ৩য় বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর শাফায়েত জামিল লিখেছেন, 'তুরা পাহাড়ের তেলঢালা ক্যাম্প থেকে ১০ অক্টোবর আমরা রওনা হলাম। আমাদের বহরে প্রায় একশো গাড়ি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫৭ টা সিভিল ট্রাক দিয়েছিল, বাকিগুলো আমার ব্যাটালিয়নের জিপ, ডজ, থ্রি টন এই সব। টানা দু'দিন দু'রাত চলার পর গৌহাটিতে পৌছলাম। গৌহাটি থেকে শিলং। শিলং থেকে দীর্ঘ পাহাড়ী ও বিপদসঙ্কুল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হলাম আমরা। মেঘের দেশ চেরাপুঞ্জি। চারদিকে



www.amarboi.org

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা আকারের পাথর। চোখে পড়লো অনেক পাহাড়ি ঝরণা। আর বহু উঁচুতে বলে হাত বাড়ালেই যেন মেঘের নাগাল। আকাশের গা-ছোঁয়া পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলেছি, হঠাৎ করেই বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। গাড়ির সামনে পথের ওপর ভেসে এসেছে এক টুকরো মেঘ! তাই এ বিপত্তি। ভাসমান মেঘটা সরে যেতেই আবার যাত্রা। ৫ হাজার ফুট নিচে দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। অদ্ভুত এক ধরণের অনুভূতি হচ্ছিল।

চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির কথা এতোদিন কানে শুনেছি, এবার চোখে দেখা হলো। এই অক্টোবর মাসেও ক'দিনের যাত্রায় চোরাপুঞ্জির বৃষ্টিতে ভেজার অভিজ্ঞতা হলো। চেরাপুঞ্জি হয়ে আমরা এলাম শেলা বিওপিতে। শেলা বিওপির অবস্থান সিলেটের ছাতক শহর থেকে বারো মাইল উত্তরে, ভারতে। শেলা বিওপির পাশেই বাঁশতলা নামে একটা জায়গা। গোটা জায়গা জুড়ে শুধু ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। আপাতত জঙ্গল পরিস্কার করে অনেকগুলো তাঁবু পেতে বাঁশতলায় ক্যাম্প করলাম আমরা। এই ক্যাম্পেই ক্যাপ্টেন আকবর, আশরাফ আর আমার পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমাদের পরিবার এর আগে ছিল তুরার উপকণ্ঠে একটা ভাড়া বাড়িতে। বাঁশতলা আসার সময় আকবর গিয়ে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এজন্য সে আমাদের একদিন পর রওনা হয়। বাঁশতলায় আমাদের গুছিয়ে উঠতে উঠতে বেলা গড়িয়ে গেলো।

## অবাস্তব এক অভিযানের পরিকল্পনা

প্রায় ৪শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সবাই খুব ক্লান্ত। আর এ অবস্থাতে সেদিন ভোর রাতেই অভিযানে যেতে হবে। একেবারে অবাস্তব পরিকল্পনা। সাধারণ বাস্তববুদ্ধি-বিবর্জিত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। যাই হোক, অপারেশনের নির্দেশনা দেয়া হলো এরকমের- ক্যাপ্টেন মোহসীন তার চার্লি কোম্পানি নিয়ে ছাতকের উত্তর-পশ্চিমে দোয়ারাবাজারের নিকটবর্তী টেংরাটিলা দখল করবে, যাতে করে পাকসেনারা তাদের অবস্থানের সাহায্যার্থ ছাতকের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। দোয়াবাজারে পাকিস্তানিদের ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারির একটি দল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। ছাতক ও ভোলাগঞ্জের মধ্যে ছিল একটা রোপওয়ে/Cable Car। সেই রোপওয়ে দিয়ে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির জন্য ভোলাগঞ্জ থেকে চুনাপাথর আনা হতো। রোপওয়েটির প্রায় নিচ দিয়েই ভোলাগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত একটা হাঁটাপথও আছে। পথটা গিয়ে পৌছেছে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পর্যন্ত। সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মাইল দেড়েক উত্তরে আরেকটি পায়ে-চলা-পথ



www.amarboi.org

দোয়ারাবাজারের দিক থেকে এসে এই রোপওয়ের নিচের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। ঐ রাস্তা ধরে পাকিস্তানি সৈন্যরা যাতে আমাদের মূল বাহিনীর পেছনে এসে আক্রমণ করতে না পারে, সে জন্যই দোয়ারাবাজার দখল করতে হবে। ইকো কোম্পানি থাকবে এই হাঁটাপথ দুটোর সংযোগস্থলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে, যাতে শত্রুপক্ষ দোয়ারাবাজার থেকে আমাদের পেছনে কোনো সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে।

ছাতক শহর ও সিলেটের মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। গোবিন্দগঞ্জে সিলেট-ছাতক এবং সিলেট-সুনামগঞ্জ রাস্তা এসে মিলেছে। সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের দিকে মাইল বিশেক ভেতরে এর অবস্থান। ছাতক শহর থেকে দূরত্ব ১০ মাইল। লে. নূরন্নবীকে তার ডেল্টা কোম্পানি নিয়ে এই গোবিন্দগঞ্জের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হলো। সিলেট থেকে ছাতকে পাকিস্তানি রিইনফোর্সমেন্ট আসা ঠেকাতে হবে তাকে। সেই সঙ্গে ছাতক থেকে যেন পাকসেনারা সিলেটে পশ্চাদপসারণ করতে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। ছাতক অবরোধ এবং দখলের জন্য মূল ফোর্স হিসেবে রইলো আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি, ছাত্রদের (মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানী) নিয়ে গঠিত ইকো কোম্পানি। এ ছয়টি কোম্পানি প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে দখল করবে। এরপর নদী পার হয়ে ছাতক শহরে অভিযান চালাবে। ভারতীয়রা জানালো, তারা এসময় আর্টিলারি সাপোর্ট দেবে।

## শুরু হলো অপারেশন

অপারেশন শুরু হওয়ার কথা পরদিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর ভোর পাঁচটায়। রাতে রওনা হলাম আমরা। পরিকল্পনা মতো আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও আকবরের নেতৃত্বে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা এক পর্যায়ে ফ্যাক্টরির অবস্থান ছেড়ে দিয়ে সুরমা নদীর ওপারে ছাতক শহরে পিছিয়ে গেলো। ৩০ এফ এফ এবং টোচি স্কাউটস-এর সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করছিল। আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়। আকবর ঠিক তার পেছনেই, মাঝখানে একটা বিল।

এদিকে দোয়ারাবাজারে একটা বিপর্যয় ঘটে গেলো। দোয়ারাবাজার ঘাটে আগে থেকেই পাকিস্তানিরা তৈরি হয়ে ছিল। পাকসেনা, রাজাকার বাহিনী এবং পাকিস্তান থেকে আসা ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারি তখন এলাকায় প্রতিরক্ষার



www.amarboi.org

দায়িত্বে ছিল। হাওর-বিল পার হয়ে মোহসীন ও তার চার্লি কোম্পানি দোয়ারাবাজার ঘাটে নামার আগেই তারা গুলি চালাতে শুরু করে। খুব সম্ভবত রাজাকারদের কাছ থেকে তারা আমাদের আগমনের খবর পেয়ে যায়। খবর পাওয়ার কথাই। প্রায় শ' খানেক গাড়ির বহর আমাদের। হেড লাইট জ্বালিয়ে এতোগুলি গাড়ি আসছে, সেটা চোখে পড়া খুব স্বাভাবিক। আর উঁচু পাহাড়ি রাস্তা বলে অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। পাকসেনারা বুঝে গিয়েছিল, এ এলাকায় আমাদের সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে। সে জন্য তারা পুরোপুরি সতর্ক ছিল। মোহসীনের কোম্পানিটা নৌকায় থাকা অবস্থাতেই পাকিস্তানিরা গুলি চালাতে শুরু করলে বেশ কয়েকটি নৌকা পানিতে ডুবে যায় এবং অতর্কিত আক্রমণে পুরো কোম্পানিই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের দিন তিনেক পরও আমি মোহসীনের জন্য ত্রিশেক সহযোদ্ধার কোনো খবর পাই নি। এরা শহীদ, আহত, না বন্দি- কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। দেড়শো যোদ্ধার প্রায় ষাট শতাংশ অস্ত্রই পানিতে পড়ে যায়। প্রাণ রক্ষার্থে আমাদের সৈন্যরা হাওরের গভীর পানিতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য হয়। কাজেই কোম্পানী তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন, অর্থাৎ দোয়ারাবাজার দখল এবং প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে ব্যর্থ হলো। ওদিকে নৌকা যোগাড় করতে দেরি হওয়ায় গোবিন্দগঞ্জে পৌঁছতে লেঃ নবীর অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। সেই সুযোগে পাকিস্তানিরা ছাতককে তাদের ট্রুপস রিইনফোর্সমেন্ট পাঠিয়ে দেয়। তারা ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির আশপাশে আমাদের অবস্থানে প্রচন্ড শেলিং শুরু করলো। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করার জন্য আমরা সেখানে কিছু শেলিং করেছিলাম। ফ্যাক্টরি দখল হয়ে গেলে ছাতক শহরের ওপর কিছু গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু বেসামরিক লোকদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কায় কিছুক্ষণ পরই শহরে গোলাবর্ষণ বন্ধ করা হলো। এদিকে লেঃ নূরুন্নবীর গোবিন্দগঞ্জে পৌঁছতে ব্যর্থতার সুযোগে সিলেট থেকে পাকবাহিনীর নতুন সৈন্য এসে যায়। ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের দু'কোম্পানি এবং পাঞ্জাবের এক কোম্পানি সৈন্য ছাতক শহরে পৌঁছে যায়। নবী গোবিন্দগঞ্জে পৌঁছানোর পরদিন পাকসেনাদের ঐ কোম্পানিগুলোর একটি অংশ তার ওপর আক্রমণ চালায় এবং একই সাথে পশ্চাদপসরণ করে।

প্রায় ৪শ মাইল রাস্তা গাড়ি দিয়ে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আমরা ঐ এলাকায় পৌঁছুই। আমাদের কাছে এলাকাটি ছিল এক বিশাল প্রশ্নবোধকের মতো। আমাদের অনেকেই এর আগে কখনো হাওর দেখেনি। তার ওপর আমাদেরকে সিগনাল সেট্স (Signal Sets) দেয়া হয় নি। পুরো যুদ্ধের সময়টাই আমাদের (ব্যাটালিয়ন থেকে কোম্পানি এবং কোম্পানি থেকে প্লাটুন) যোগাযোগের



www.amarboi.org

একমাত্র মাধ্যম ছিল রানার এবং তার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র। এরকম বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রথাগত (Conventional) যুদ্ধ, যেমন Attack এবং Defence-(আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা) দুটোতে বহুবর অংশ নিয়েছি আমরা কোনো (সিগনাল কম্যুনিকেশন) Signal communication ছাড়াই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছি। যেমন বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ, রৌমারীর প্রতিরক্ষা এবং ছোটখেল আক্রমণ ও দখল। আবার ছাতক ও গোয়াইনঘাট অভিযানের মতো ব্যর্থতাও ছিল।

লেঃ নূরুনবী রাতে হাওরে চলতে গিয়ে নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে দিক হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া এর চাইতেও বিশ্রী কারণ ছিল, তা হচ্ছে, নবীর অধীনস্থ দু'জন জেসিও প্লাটুন কমান্ডারের সঙ্গে তার অহেতুক বাক বিতন্ডা। লেঃ নবী EME Corps-(প্রকৌশল শাখা)'র একজন জুনিয়ার অফিসার। পদাতিক ব্যাটালিয়নের অনেকদিনের চাকরির অভিজ্ঞতালব্ধ দু'জন পদাতিক শাখার প্লাটুন কমান্ডার (জেসিও) এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে যাত্রাপথে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। ওদের উদ্বেগ যুক্তিযুক্ত ছিল। তারা একজন অ-পদাতিক বাহিনীর অফিসারের অধীনে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে পাকবাহিনীর মোকাবেলা করাটা যথার্থই অবাস্তব মনে করছিল । এই অভিযানের আদেশ পেয়ে জেসিও দু'জন এক রকম বেকায়দায় পড়ে। যাত্রাপথেই এরকম অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য। স্বতঃস্ফূর্ততা বিহীন ফিল্ড কমান্ডারদেরকে নিয়ে নবী কয়েক ঘন্টা বিলম্বে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানিদের ৩০ ফ্রন্টিয়ার্স ফোর্স রেজিমেন্টের রিইনফোর্সমেন্ট এবং কয়েকটা আর্টিলারি গান ছাতকে পৌঁছে যায়। এদেরই একটা অংশ পরদিন নবীর গোবিন্দগঞ্জ অবস্থানে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর নবী পশ্চাদপসারণ করে ভোলাগঞ্জে অবস্থান নেয়। সেখান থেকেই সে যাত্রা শুরু করেছিল। গোবিন্দগঞ্জের যুদ্ধে পাকবাহিনীর একজন অফিসারসহ অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

আমরাও এ যুদ্ধে প্রায় সমসংখ্যক যোদ্ধাকে হারাই। ইন্‌ফ্যানট্রির ব্যাট্‌ল হার্ডেন্ড জেডসওদের মতামতকে আমলে না নেওয়ার কুফল মুক্তিসেনাদের রক্তের মূল্যে পরিশোধ করতে হয়। ছাতক যুদ্ধ শেষে পুরো ঘটনা বিশ্লেষনান্তে আমি জেসিও দুজনকে বাঁশতলায় স্থানান্তর করি। বাঁশতলায় তখন আমার ব্যাটালিয়নের এলওবি (Line of Battle)।



www.amarboi.org

## আনোয়ার ও আকবরের পশ্চাদপসরণ

এদিকে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও ক্যাপ্টেন আকবর দু'দিন ধরে সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। এই দু'দিনের মধ্যে পাকিস্তানিরা ছাতকে যে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে এলো, সেটা দোয়ারাবাজারে এসে আমাদের পেছনে সমবেত হতে লাগলো। আমাদের পরবর্তী সৈন্যরা তখন সুরমা নদীর সামনে পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা দোয়ারাবাজার দিয়ে আমাদেরকে পেছনে থেকে আক্রমণ করে বসে। আমাদের পেছনে আবার ছিল ইকো কোম্পানি অর্থাৎ ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারা। পাকসেনাদের সঙ্গে তাদেরও প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। ইকো কোম্পানির ছেলেরা এ সময় দুর্দান্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হয়। ইকো কোম্পানির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে পাকিস্তানিদের অগ্রাভিযান কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। এক পর্যায়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পাকবাহিনীর হস্তগত হলে তারা আমাদের পেছনে এসে পড়ে। এ কারণে আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই।

ক্যাপ্টেন আনোয়ারের আলফা কোম্পানি তখন দখলিকৃত সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করছে। তার পেছনেই একটি ছোট বিলের পাড়ে উঁচু টিলার মতো জায়গায় ক্যাপ্টেন আকবরের ব্র্যাভো কোম্পানি। এদিকে পাকবাহিনীরা রিইনফোর্সমেন্ট (৩০ ফ্রন্টিয়ার্স ও ৩১ পাঞ্জাব) দোয়ারাবাজার হয়ে ইকো। (এফ এফ) কোম্পানির অবস্থান পর্যুদস্ত করে আমাদের অবস্থানের প্রায় পেছনে এসে পড়েছে। আনোয়ার এবং আকবরের অবস্থানের ওপর পেছনে দিক থেকে একটা আক্রমণ অত্যাসন্ন। আমি তখন ক্যাপ্টেন মোহসীনের চার্লি কোম্পানির উদ্ধারপ্রাপ্ত সেনাদের সঙ্গে ইকো কোম্পানির অবস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছি। যুদ্ধে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। আমাদের কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। পাকিস্তানিরা অনবরত শেলিং করে যাচ্ছে। সবগুলোই এয়ার বার্স্ট অর্থাৎ আকাশেই ফেটে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিচে আঘাত হানছে। আনোয়ার ও আকবরের অবস্থানগুলোতে পেছন দিক থেকে রাইফেল আর এলএমজির গুলিও গিয়ে পড়ছিল। চারদিকে একটা সংশয় আর অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে অবস্থানের পেছনদিককার গোলাগুলি খুবই বিপজ্জনক। আমাদের তখন খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। আক্রমণ করতে এসে এখন নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। নিজের ভুল সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে মেজর মীর শওকত বাধ্য হয়ে আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত রেখে আকবরকে ফিরে আসার নির্দেশ পাঠালেন । আনোয়ারকে ফিরে আসার নির্দেশ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আকবরকেই দেয়া হলো। আগেই বলেছি, আমাদের মধ্যে কোনো রকম সিগন্যাল কম্যুনিকেশন



www.amarboi.org

ছিল না। আকবর তার কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেই কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সেই গভীর রাতে গলা সমান পানি ভেঙ্গে বিল অতিক্রম করে আনোয়ারের অবস্থানে এসে পৌঁছায়। তখন প্রচন্ড গোলাবর্ষণ চলছিল। সেই সঙ্গে হাল্কা অস্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি। ভোর হওয়ার আগেই আনোয়ারের অবস্থান আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। ফিরে যাওয়ার নির্দেশ সময়মতো না পেলে আনোয়ার এবং তার কোম্পানি বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণকারীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারতো। আনোয়ার ও আলফা কোম্পানির সঙ্কটময় অবস্থার কথা ভেবে আকবর তাদের পশ্চাদপসরণ নিশ্চিত করার জন্য কোনো রানার না পাঠিয়ে নিজেই এই দায়িত্বটি পালন করে। আলফা কোম্পানি একটি নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ছাতক এলাকায় ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর- এই পাঁচদিন যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে লেঃ নবীর 'ডি' কোম্পানীর অদূরদর্শিতার কারণে মারাত্মক ভাবে বিধ্বস্থ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বেঙ্গলের লেঃ নূরুন্নবীর 'ডি' কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। তবে এ অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে কিছু সান্ত্বনা এই যে, আমরা যথেষ্ঠ আন্তাজার্তিক প্রচার পাই। এছাড়া বাকিরা সবাই মিলে সেবারই প্রথম একটি বড়ো ফোর্স নিয়ে অপারেশন করি আমরা, যার ফলে আমাদের যোদ্ধাদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে যায়। পাক বাহিনীও বুঝতে পারে, মুক্তিবাহিনী এখন অনেক সংগঠিত। তারা এখন আগের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে এবং পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছে। এই যুদ্ধের পর আমরা ৫/৬ মাইল পিছিয়ে এসে বাঁশতলা সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের ভেতরেই বাংলাবাজার প্রতিরক্ষাগত অবস্থান গ্রহণ করি।

## সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোনো অভিযানকেই ভারতীয় অথবা পাকিস্তানিরা কখনো সম্মানজনকভাবে চিত্রিত করেনি। তাদের কোনো গ্রন্থ বা রচনায় বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের কোন কৃতিত্বের কথাই স্বীকৃত হয়নি। পাকিস্তানিদের লেখা পড়লে মনে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্ব সবই ভারতীয় সেনাবাহিনীর। কিন্তু সিদ্দিক সালিক নামে পাকিস্তান আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার (তিনি কয়েক বছর আগে পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন) 'Witness to Surrender' 'উইটনেস টু সারেন্ডার' নামে একটি বই লিখেছেন, যেখানে ছাতক যুদ্ধের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সিদ্দিক সালিক ঢাকাস্থ আইএসপিআর-এ কর্মরত ছিলেন



www.amarboi.org

বলে যুদ্ধের খবরাখবর সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন। পাকিস্তানি এই লেখকের গোটা বইয়ে মুক্তিবাহিনীর মাত্র দুটো অভিযানের কথা স্থান পেয়েছে। তার একটি হলো ছাতক অভিযান, অন্যটি প্রথম বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণ। লেখক তার বইতে লিখেছেন, আক্রমণকারীরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করতে পারলেও ছাতক শহর তাদের অর্থাৎ পাকিস্তানিদের হাতেই রয়ে গিয়েছিল। ছাতকের যুদ্ধ যে পাকিস্তানি হেড কোয়ার্টারে বড়ো ধরনের ধাক্কা দিয়েছিল, সিদ্দিক সালিকের বইয়ে তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় বাহিনী ছাতক শহর ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রচন্ড হামলার পর তৃতীয় বেঙ্গলের সহায়তায় তারা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে নেয়। সিদ্দিক আরো লিখেছেন, এ আক্রমণ এতো প্রচন্ড ছিল যে আমরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ছেড়ে দিয়ে ছাতক শহরে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হই। পরে আমরা ৩১ পাঞ্জাব এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটা রেজিমেন্ট নিয়ে কাউন্টার-অ্যাটাক করি। তিন দিন যুদ্ধের পর অবস্থানটি আবার আমাদের অধিকারে আসে। লেখক তাঁর বইতে সম্পূর্ণ সত্য তথ্য দিয়েছেন, শুধু ভুল করেছেন আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করতে। তিনি লিখেছেন, ৮৫ বিএসএফ এই আক্রমণ পরিচালনা করে এবং এতে তৃতীয় বেঙ্গল তাদের সাহায্য করেছিল মাত্র। প্রকৃত তথ্য এই যে, ভারতীয় সেনা সদস্যদের একজনও এই আক্রমণাভিযানের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এটি পুরোপুরিভাবেই তৃতীয় বেঙ্গল এবং ৫ নম্বর সেক্টরের তিনটি এফ.এফ. কোম্পানির নিজস্ব অভিযান ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আমরা ভারতীয়দের কিছু গোলাবর্ষণের সাহায্য নিয়েছিলাম।

## ওসমানী ও জিয়া এলেন বাঁশতলায়

ছাতক অভিযানের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় ও সঠিক কৌশল নির্ধারণ করতে ২০ অক্টোবর কর্ণেল ওসমানী বাঁশতলায় এলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি অসন্তুস্ট ছিলেন। আমি বিনয়ী প্রতিবাদ করে বললাম, কোলকাতা এবং শিলংয়ের পাহাড়-চূড়ায় বসে যারা এরকম একটি অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা এ অঞ্চলে পৌঁছানো মাত্র কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই অভিযানে যেতে বাধ্য করেছেন, ব্যর্থতার দায়িত্বভার তাদের ওপরে চাপানোই যুক্তিযুক্ত হবে। ওসমানী তখনকার মতো আর কিছু বললেনা। ১৯৭২ সালে পদক বিতরণের দায়িত্ব সেনা প্রধান কর্ণেল এম.এ.রবকে দিয়েছিলেন কিন্তু কর্ণেল রব অসুস্থ থাকায় উপ সেনা প্রধান এ. কে. খন্দকার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তৃতীয় বেঙ্গল তথা জেড ফোর্স ও ১১নম্বর সেক্টরের ওপর বিমাতা সুলভ আচরণ করেছেন। জিয়াউর রহমানের সাথে এ.কে. খন্দকারের সুসম্পর্ক ছিলনা। বীরত্বসূচক পদক তৃতীয় বেঙ্গলের অনেক



www.amarboi.org

যোগ্য সদস্যেদের অতি অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, যা নাকি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেখানে কেবল কিছুসংখ্যক যোদ্ধাকে বিশেষ করে বিমানচালক যারা ৩ ডিসেম্বর পাক যুদ্ধবিমান পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অল্প কয়েকটি সর্টি উড়ে থাকতেও পারে; কেননা একটি মান্ধাতার আমলের ডিসি-৩ মালবাহী বিমান, ১টি সিঙ্গলঅটার এবং একটি এক ইঞ্জিনের এল্যুয়েট কপ্টার, সেখানেও আবার পক্ষপাত মূলক ভাবে খেতাব দেয়া কতোটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেটা পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে পুনর্বিচারের দাবি রাখে। বিশেষ করে জিয়ার গড়া মুক্তিযুদ্ধের সর্ববৃহৎ ১১নম্বর সেক্টরের এবং জেড ফোর্সের অসংখ্য শহীদ/যুদ্ধাহত এবং যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনকারী মুক্তিযোদ্ধারা ত পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েছেই এমনকি বিশ্ময়কর চিলমারী অভিযানের সফল নায়ক (ফিল্ড কমান্ডার) সেক্টর কমান্ডারকে বীর প্রতীক খেতাব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে অসন্মান করা হয়েছে। এ ছাড়াও অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ ঘটনা অনুদ্ঘাটিত ও অবহেলিত রয়ে যায়। সেই সব ঘটনার নায়কদের সম্বন্ধে কীর্তিপত্র বা (সাইটেশন) citiations লেখার কেউ তো তখন ধারে কাছেও ছিলেন না। অনেক বীরত্বপূর্ণ সফল যুদ্ধের নায়ক ৯নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলকে ত কোন খেতাবই দেওয়া হলনা, (দাদাদের আজ্ঞাবহ হওয়ার নিকৃষ্ট নমুনা)। যে সব সেক্টর কমান্ডারদের হেড কোয়ার্টারগুলো সীমান্ত পাড়ের বহু দূরে বড়ো শহরের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের বিস্তৃত রণক্ষেত্রে কোথায় কি ঘটছে, তার কতোটুকু সংবাদ তাদের কাছে পৌছতো? কর্ণেল ওসমানী আওয়ামী লীগের এম.এন.এ. ও ছিলেন বটে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার কলকাতা ৮নং থিয়েটার রোডে তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করা সাত আট জন সিভিল বিমান চালক, কৃষি দপ্তরের শস্য ক্ষেতে পোকা মারার বিমান চালক এবং বিমান বাহিনীর বিমান চালক, পি আই এ 'র বিমান চালকদেরকে একেবারে পাইকারি দরে স্বয়ং নিজেকেসহ 'খয়রাতি' বীর উত্তম বানিয়ে ছেড়েছেন। তাছাড়া আহত মেজর তাহের ১৯৭২ এর জানুয়ারীতে ভারতের পুনা হাসপাতাল থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে খন্দকার সাহেবকে তুকতাক করে আমার প্রস্তুত করা সাইটেশনের লিস্ট সরিয়ে ফেলে নিজেরা ৪ ভাই আর তারামন বিবিকে খেতাব দিয়ে এক চমকপ্রদ কাজ সারলেন। জিয়াউর রহমানের সাথে অহরহ রাজীবপুর গিয়ে ক্যাম্পে তারামন কেন, কোন মেয়েকেই কষ্মিণকালেও দেখিনি। সুবেদার (পরে অনারারী ক্যাপ্টেন) আফতাবকে কানাডায় ফোনে প্রশ্ন করায় সে আমতা আমতা করে স্বীকার করেছে তারামন তার আশ্রয়েই ছিল। মশলা টশলা বাটাবাটি করত! আবতাব এখনও জীবিত আছে এবং ঢাকায়ই আছে বলে শুনেছি।



www.amarboi.org

পদক বিতরণের নামে এই প্রহসনে তৎকালীন সরকারের আস্থা ও বিশ্বাসের অমর্যাদা করে তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যসহ অন্যান্য সেক্টর ও ফোর্সের যেসব মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, রক্তদান এবং সার্বিক অবদানকে অবমূল্যায়ন করে পদক প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ সেনা প্রধান খন্দকার বিদ্বেষমূলক ভাবে গর্হিত কাজ করেছেন। এই প্রহসনের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেও কর্ণেল ওসমানীর নিয়োজিত নির্বাচকের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে অনেকেই খয়রাতি 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে পালিত ভূমিকা বিবেচনা সেখানে অনুপস্থিত ও গৌণ, মুখ্য উপাদান ছিল গোষ্ঠী রাজনীতি ও তদবির। আমাকে পদক এর নাম চয়ন, শ্রেণীবিন্যাস এবং বিতরণ পদ্ধতি গ্রন্থনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পদক বিতরণের দায়িত্ব সেনা প্রধানের অসুস্থার কারণে দেওয়া হল ডিপুটি সেনা প্রধান এ.কে. খন্দকারকে। বিতরণ প্রহসনের দায়ভার শতগুণ বেশি বর্তায় খন্দকার সাহেবের উপর। উপরে ১১ নম্বর সেক্টরের পদকের ব্যাপারে তদবিরের একটি উদাহরণ দিয়েছি।

ছাতকের বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়া বাঁশতলায় আসেন। জিয়াকে ওসমানীর সঙ্গে আমার মতানৈক্যের কথা খুলে বলাতে তিনি বললেন, 'You have done the right thing, I shall vindicate you and your battalion at an appropriate moment.' (ইউ হ্যাভ ডান দি রাইট থিং, আই শ্যাল ভিন্ডিকেট ইউ এন্ড ইউর ব্যাটালিয়ন অ্যাট অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মোমেন্ট)

## জেনারেল গিলের কনফারেন্স

সন্ধ্যায় দু'জন রানার বাঁশতলা থেকে এ্যাডজুট্যান্ট আশরাফের বার্তা নিয়ে এলো। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় আমাকে শিলংয়ের ১০১ কমুনিকেশন জোনের জিওসির অফিসে অনুষ্ঠেয় কনফারেন্স এ যোগ দিতে হবে। আমার নির্দেশমতো আশরাফ শেলা বিওপিতে রাত তিনটা নাগাদ একটি জিপ এবং প্রোটেকশন পার্টি তৈরি করে রাখলো। রাত দুটো নাগাদ ভোলাগঞ্জ থেকে রওনা হলাম। পায়ে হাঁটা পাহাড়ি রাস্তা। গন্তব্যের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। জনমানবহীন এলাকা। চলার সময় পাহাড়ি বুনো লতাপাতা ও গাছের ছোট ছোট ডাল শরীরে এবং অনাবৃত মুখে আছড়ে পড়ছিল। যাই হোক, খুব দ্রুত হেঁটে আমি ও আমার সহযোদ্ধারা রাত চারটার কিছু আগে শেলা বিওপিতে পৌঁছে যাই। সেখানে পৌঁছেই নতুন প্রটেকশন পার্টি নিয়ে শিলংয়ের পথে যাত্রা শুরু করি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শিলংয়ের অবস্থান ৬ হাজার ফুট উঁচুতে। তাই



www.amarboi.org

শিলংয়ের যতোই কাছে যাচ্ছি, ততোই বেশি ঠান্ডা লাগতে শুরু করলো। এক সময় মনে হলো শীতে জমে যাবো, আমরা আসছি সমতল ভূমি থেকে কাজেই অমার গায়ে সুতির একটা শার্ট মাত্র। শিলংয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এমন সময় মনে হলো, টুপ টুপ করে আমার মাথা ও ঘারের কাছ থেকে কি যেন গাড়ির ভেতরে পড়লো। গাড়ি থামিয়ে অবাক হয়ে দেখরাম কতোগুলো বড়ো কুল বরইয়ের মতো কি যেন পড়ে রয়েছে গাড়ির ভেতরে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেলো, ওগুলো সব গেছো জোঁক। রক্ত খেয়ে ফুলে বরইয়ের মতো গোল হয়ে গেছে। শীতের তীব্রতায় ওরাও আমার শরীর ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। একটা জোঁক তখনো চোখের একটু ওপরে লেগেছিল। আমার মুখ ও ঘাড় তখন সত্যিকার অর্থেই রক্তাক্ত। পাঁচটি জোঁক বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে পরম নিশ্চিন্তে আমার রক্ত চুষছিল। কিন্তু একটুও টের পাইনি ; হয়তো যুদ্ধের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম বলে।

## গোয়াইনঘাট অভিযানের আদেশ

যাই হোক, সময়মতো জেনারেল গিলের সামনে হাজির হলাম। তিনি বললেন, তোমার ব্যাটালিয়ন এখন দুভাগ করতে হবে। একভাগ অর্থাৎ দুই কোম্পানি থাকবে ছাতক-বাঁশতলা এলাকায়। বাকি দুই কোম্পানি নিয়ে তুমি যাবে ডাউকি সাব সেক্টরে। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। গোয়াইনহাটে পাকসেনাদের অবস্থান আক্রমণ করবে তুমি। গোয়াইনঘাটের অবস্থান সিলেটের ডাউকি সীমান্ত থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে, অর্থাৎ বাংলাদেশের অনেকটাই ভেতরে। গোয়াইনঘাটের উত্তরে আবার রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স, সেটা পাকিস্তানিদের খুবই শক্তিশালী একটা ঘাঁটি। গোয়াইনঘাটেও পাকিস্তানিদের বেশ শক্তিশালী অবস্থান ছিল।

গোয়াইনঘাটে পিয়াইন নদীকে সামনে রেখে পাশে ডাউকি-রাধানগর-গোয়াইনঘাট সড়ক কভার করে পাক-ডিফেন্স। গোয়াইনঘাট হয়ে নদীর পাড় ধরে সোজা গেলে শালুটিকর এয়ারপোর্ট। এটাই সীমান্ত থেকে সিলেটে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম রাস্তা। রাস্তাটা তখন পায়েহাঁটা পথ হলেও স্ট্র্যাটেজিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গিলের নির্দেশমতো ১৮ অক্টোবর দুটো কোম্পানি ক্যাপ্টেন মোহসীনের অধীনে রেখে গেলাম। মোহসীন তখন আমার টুআইসি (সেকেন্ড-ইন-কমান্ড)। আলফা কোম্পানির কমান্ডার আনোয়ারকে চিকিৎসার জন্য শিলং পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। মার্চে সৈয়দপুর এলাকার পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়েছিল আনোয়ার। এতদিন সুচিকিৎসার হয়নি বলে কষ্ট পাচ্ছিল সে।



www.amarboi.org

ওর জায়গায় কমান্ডার হলো সে. লে. মঞ্জুর। প্রসঙ্গত, ছাতক অপারেশন শেষে বাঁশতলায় ফিরে আসার পর আরো দুজন সেনা অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরা ছিল 'ফার্স্ট মুর্তি ব্যাচ' অর্থাৎ যুদ্ধচলাকালীন সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সমাপনকারী অফিসার সে. লে. মঞ্জুর এবং সে. লে. হোসেন (মঞ্জুর পরে মেজর (অব.) হোসেন পরে লে. কর্ণেল, ১৯৮১-তে ফাঁসিতে নিহত)। এ দু'জনকে যথাক্রমে আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হয়। মূর্তি নামক স্থানে এদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে দাঁড়ায় মূর্তি কমিশন। এদের গ্রুপটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার।

## অভিযানের প্রস্তুতি

মঞ্জুরের আলফা কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নিয়ে প্রথমে গেলাম ভোলাগঞ্জ। সেখান থেকে ডেল্টা কোম্পানিসহ কোনাকুনিভাবে বাংলাদেশের ভুখন্ড দিয়ে মাইল পনেরো দূরবর্তী হাদারপড়ায় গেলাম। সেখানে আমরা একটা কনসেনট্রেশন এরিয়ার মতো করলাম, অনেটা হাইড-আউট ধরনের। এখানে আমাদের দুটো কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের মোট প্রায় পাঁচশ' সৈন্য। হাদারপাড়ায় আরো দুটো এফএফ কোম্পানি যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে। মোট প্রায় সাতশ লোক নিয়ে একদিন একরাত সেখানে থাকলাম। এর মধ্যে গোয়াইনঘাটের পরিস্থিতি, রাস্তাঘাট সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। গোয়াইনঘাট তখনো বারো মাইল দূরে। সারা রাত হেঁটে খুব ভোরে পিয়াইন নদীর পারে পৌঁছলাম আমরা। পৌঁছে দেখি, যাদের ওপর নৌকা যোগাড় করার দায়িত্ব ছিল, তারা নৌকা যোগাড় করতে পারেনি। অথচ এ খবরটাও তারা আমাদের দেয়নি। পাহাড়ী নদী বলে অবশ্য পিয়ইন বেশি চওড়া নয়, বড়োজোর শ' দেড়েক ফুট ছিল এর প্রশস্ততা। নদীর তীর বরাবরই পাকিস্তানিদের অবস্থান। ওপারের একটা স্কুলে গোয়াইনঘাটের মাইল দেড়েক উত্তরে রেখে নৌকায় নদী পার হবো। জায়গামতো গিয়ে নৌকা না পেয়ে তাই বিপদেই পড়ে গেলাম। এর মধ্যে সকাল হয়ে গেলো। সকাল হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানিরা আমাদের দেখে ফেলে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। দু'পক্ষের মধ্যে সমানে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলো। আমরা পজিশনেই যেতে পারলাম না। নদী পার হয়ে তবে তো অ্যাটাক করতে হবে। অথচ ওপারে গিয়ে পজিশন নেয়ার আগেই শুরু হয়ে গেলো ফায়ারিং।



www.amarboi.org

সে. লে. মঞ্জুরের আলফা কোম্পানি ছিল সবার আগে। পাক আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো আমাদের। লেঃ নবীর ডেল্টা কোম্পানির বেশির ভাগ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

রাত তিনটার দিকে আমরা যখন গোয়াইনঘাট এলাকায় গিয়ে পৌছই, তখন হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে আজানের ধ্বনি  উঠতে থাকে। অসময়ে আজান শুনে আমরা অবাক হয়ে যাই। এক বাড়ির আজান শুনে কিছুদূর পরপর বিভিন্ন বাড়ি থেকে আজান দেয়া হচ্ছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, এভাবে আমাদের আগমনবার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছিল পাকসেনাদের কাছে। আর আজান দেয়া হচ্ছিল রাজাকারদের বাড়ি থেকে। কাজেই আচম্‌কা আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের হতভম্ব করতে পারিনি আমরা, বরং আগে থেকেই সতর্ক থাকায় ওরাই আমাদেরকে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দেয়।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে মঞ্জুরের আলফা আর নবি'র ডেল্টা দুটো কোম্পানিই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। ওই অবস্থাতেই পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের দিনভর গোলাগুলি চললো। আশপাশে ৫০/৬০ জন সৈন্য ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। যোগাযোগ যে করবো তারও উপায় নেই। যে-কোনো কারণেই হোক, ভারতীয়রা আমাদের সিগন্যাল সেট, ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার এসব প্রয়োজনীয় রসদ সরঞ্জাম দেয়নি। পাক অবস্থানের ওপর মেশিনগান আর তিন ইঞ্চি মর্টার চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। প্রায় পাঁচশ' সৈন্যের প্রতিটি হাত একটা করে গোলা বহন করছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতেই সমস্য দেখা দিলো। মর্টারের গোলা দূরে থাক, সৈন্যদেরই পাত্তা নেই।

এক সময় দক্ষিণ দিক থেকে কিছু সৈন্যকে বিলের ভেতর দিয়ে পানি ভেঙ্গে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কাছাকাছি এলে বোঝা গেলো তারা আলফা কোম্পানির সৈন্য। ফায়ার কাভার দিয়ে নিয়ে এলাম তাদেরকে। সারাদিন-সারারাত যুদ্ধ করে এভাবে পাকসেনাদের সামনে থেকে বাকি লোকদের উদ্ধার করতে হয়। দুপুরের দিকে মাথার ওপর দুটো ফিক্সড উইং প্লেন (ছোট প্রশিক্ষণ বিমান) এসে আমাদের ওপর মেশিনগানের গুলি চালাতে লাগলো। কিন্তু প্লেন দুটো এতো উঁচুতে ছিল যে তেমন একটা সুবিধা করতে পারে নি। তবে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে তা সাময়িকভাবে কিছুটা ভীতি সঞ্চারের কারণ হয়েছিল। আমরা নদীর এপারে বাঁধমতো একটা উঁচু জায়গার আড়ালে ছিলাম বলে রক্ষা! কেবল স্কুলের ছাদে বসানো পাকসেনাদের মেশিনগানটাই সমস্যা



www.amarboi.org

করছিল। এর মধ্যে সবাইকে পিছিয়ে এসে পশ্চাৎবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। আমাদের কোম্পানিগুলোর অবস্থা তখন শোচনীয়। গুটিকয় সৈন্য ছাড়া আশপাশে কেউ নেই। এফএফ কোম্পানিগুলোও উধাও। আমার নিজের হেড কোয়ার্টারের শ'খানেক সৈন্যের বেশির ভাগেরই খবর নেই। কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওকে নিয়ে শত্রুর একেবারে সামনে থেকে বেশ ঝুঁকি নিয়ে কতক সৈন্যকে উদ্ধার করলাম। এরপর ধীরে ধীরে সবাই পেছনের একটা গ্রামে জড়ো হলাম। গ্রামটার নাম লুনি। এ যুদ্ধে আমাদের এমনই দুর্দশা হয় যে, জনা পনেরো সৈন্যকে শেষ পর্যন্ত পেলমই না। সব মিলিয়ে গোয়াইনঘাট অপারেশন আমাদের জন্য একটা বিপর্যয়ই ছিল বলতে হবে। এখানকার পাক অবস্থানটি ছিল খুবই সুরক্ষিত । মিত্র বাহিনীর কমান্ডাররা দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ায় বসে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে আর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া ভাসা ভাসা তথ্যের ওপর নির্ভর করেই আমাদের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করার নির্দেশ দিতো। ফলে যেখানে বলা হতো পাকবাহিনীর একটা সেকশন আছে, সেখানে গিয়ে দেখা যেতো পুরোদস্তুর একটা কোম্পানি সেখানে উপস্থিত। গোয়াইনঘাটের বিপর্যয়ের কারণও তাই। আমরা পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না।

## মিত্র বাহিনীর সঙ্গে মতবিরোধ

মিত্র বাহিনীর সেনানায়কের সঙ্গে ছাতক যুদ্ধের সময় থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয় আমার। আমি বলেছিলাম, কনভেনশনাল অ্যাটাকে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। অন্তত বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সেই দক্ষতা অর্জিত হয়নি। প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণও নেই বললেই চলে। আর প্রথাগত আক্রমণ করতে গেলে প্রতিপক্ষের চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য যেমন থাকতে হবে, তেমনি শত্রুরর চেয়ে তিনগুণ বেশি ক্যাজুয়ালটি স্বীকার করার প্রস্তুতি থাকতে হবে। কিন্তু এতো বেশি ক্যাজুয়ালটি মেনে নেয়ার অবস্থায় আমরা নেই। কারণ রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা বলতে গেলে কিছুই নেই। নিয়মিত বাহিনী হিসেবে পাকবাহিনীর সেটা ভালো মতোই আছে। এসব ব্যাপারে আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের প্রায় সবাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে গেছেন। আর না এড়িয়েই-বা কি করবেন? আমাদের সেক্টরগুলোর বিপরীতে ভারতীয় যে সেক্টরগুলো গঠিত হয়েছিল, তার কমান্ডারদের একজন ছাড়া সবাই ছিল কর্মরত ব্রিগেডিয়ার, অবশিষ্ট জনের র‍্যাঙ্কও ছিল মেজর জেনারেল। আর আমাদের সেক্টর কমান্ডাররা একেকজন মেজর, ক্যাপ্টেন আর এয়ারফোর্সের উইং কমান্ডার। পৃথিবীর কোনো আর্মিই পারতপক্ষে ছাতক অভিযানের মতো আহম্মকি অপারেশন করবে না।

প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় পৌঁছানো মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে অ্যাটাক করার পরিকল্পনা কেউই সমর্থন করবে না।

যাই হোক, আমরা পিছিয়ে লুনি গ্রামে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান নিলাম। আস্তে আস্তে সবাই সেখানে জড়ো হলো। লুনির অবস্থান রাধানগর আর গোয়াইনঘাটের মধ্যে, একটু পশ্চিমে। ঐ অবস্থানে থেকে কয়েকদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ করলাম আমরা। পাকসেনারা মাঝেমধ্যে ফাইটিং প্যাট্রল পাঠিয়ে ছোটোখাটো হামলা চালায়, আমরা ওদের প্রতিহত করি। এমনি ধরনের সংঘর্ষ চলে- কোনো বড়োসড়ো লড়াই হয়নি।

## রাধানগর এলাকায় তৃতীয় বেঙ্গলের অবস্থান গ্রহণ

গোয়াইনঘাট আক্রমণে (২৪/২৫ অক্টোবর) তৃতীয় বেঙ্গলের বিপর্যয়ের পর জেনারেল গিল আমাকে রাধানগরের পাকিস্তানি সেনাদলের শক্তিশালী প্রতিরক্ষার বিপরীতে অবস্থানরত এফএফ কোম্পানিগুলোর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলফা ও ডেল্‌টা কোম্পানিকে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করার পরামর্শ দিলেন। মুক্তিবাহিনীর তিনটি এফএফ কোম্পানি রাধানগর পাক ডিফেন্সের মুখোমুখি বাঙ্কারে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। জুলাই-আগস্ট মাস থেকেই এফএফ ভারতীয় সাব-সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল রাজ সিং জেনারেল গিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের অঘোষিত কমান্ডার হিসেবে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানীগুলো পরিচালনা করছিলেন। এখানে প্রায় প্রতিদিনই ছোটোখাটো আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের ঘটনা ঘটছিল। সেই সঙ্গে বেড়ে চলছিল দু'পক্ষের হতাহতের সংখ্যাও। ছোটখেল গ্রাম ছিল রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের হেড কোয়ার্টার। গোয়াইন ঘাটের অবস্থান এর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে।

২৭ অক্টোবর আলফা কোম্পানিকে কাফাউরা এবং ডেল্‌টা কোম্পানিকে লুনি গ্রামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। কাফাউরা গ্রামটি রাধানগর-গোয়াইনঘাট রাস্তার উত্তর-পূর্ব এবং লুনি গ্রামটি একই রাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এফএফ কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করতে আমার কোম্পানি দুটো অবস্থান নেয়াতে রাধানগরে অবস্থিত পাক সেনাদল তিনদিক থেকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে যায়। একমাত্র দক্ষিণ দিকটাই খোলা ছিল। সেদিক দিয়ে গোয়াইনঘাট যাওয়ার রাস্তা। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ডেল্‌টা কোম্পানির অবস্থান লুনি গ্রামের প্রতিরক্ষা আরো জোরদার করার জন্য ইকো এবং ব্র্যাভো কোম্পানির দুটো প্লাটুন বাংলাবাজার (শেলা-ছাতকের রাস্তার পার) থেকে আনিয়ে ডি



www.amarboi.org

কোম্পানীতে ন্যস্ত করেছিলাম। এর ফলে রাধানগর পুরোপুরিভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এই অবরোধ ভাঙ্গার কাজ করার জন্য পাকসেনারা ২৮ অক্টোবর থেকে প্রায় প্রতিদিন লুনি এবং কাফাউরা গ্রামে হামলা চালাতে থাকে। সেই সঙ্গে আর্টিলারির গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে। রাধানগরে এক কোম্পানি টোচি স্কাউটস এবং ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য অবস্থান করছিল। আগেই বলেছি পাকসেনাদের হেড কোয়ার্টার ছিল রাধানগরের আধ মাইল দক্ষিণে ছোটখেল গ্রামে। গোয়াইনঘাট যাওয়ার রাস্তাটি ছোটখেলের প্রায় লাগোয়া। নভেম্বরের মাঝামাঝি মুক্তিবাহিনী রাধানগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিকটবর্তী দুয়ারিখেল ও গোরা নামের দুটি গ্রাম দখল করে নেয়। ফলে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে প্রায় প্রতিদিন ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে হামলা চালাতে থাকে। এতে দুপক্ষের প্রচুর হতাহত হলেও পাকসেনারা আমাদেরকে হটাতে পারেনি।

## কর্ণেল রাজ সিংয়ের অযাচিত হুকুমদারি

২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীকে মিত্রবাহিনীর অধীনস্থ করা হয়। তারপরেই শুরু হলো কর্ণেল রাজ সিংয়ের অযাচিত হুকুমদারি। সে আমার অধীনস্থ কোম্পানি কমান্ডারদের সরাসরি নির্দেশ দিতে শুরু করলো। এক সময় তারা আমার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। রাজ সিংকে একদিন ডাউকিতে বিএফএফ- এর বিওপি সংলগ্ন এলাকায় পেয়ে ধরলাম। তাকে সরাসরি বললাম, 'You will not communiate with any one directly under my command without my consent. Do remember that I have taken up arms to liberate my country from an occupation army taking recourse to rebellion from the disciplined army to which I had vowed oath of allegiance leading from the front. In the process, I had to arrest my incumbent commanding officer. You may keep that in mind & not try to encroach on my command in future'. (ভবিষ্যতে আমার অনুমতি ব্যতিত আপনি আমার কমান্ডের অধিনস্ত কারও সাথে সরাসরি খবরদারি করবেন না। স্মরণ রাখবেন আমি আমার মাতৃভূমিকে একটি দখলদার শক্তির কবল থেকে স্বাধীন করার জন্য একটি সুশৃঙ্খল আর্মি যার প্রতি আমার আনুগত্য ছিল তাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গন থেকেই বিদ্রোহ করে অস্ত্র ধরে আমার তদানিন্তন কমাডিং অফিসারকে বন্দি করেছি। এটা মনে রেখে আর কখনও আমার কমান্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না।)

রাজ সিংকে আরো বললাম, আগামীতে আবার এরকম করলে সৈন্যদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ভেতরে অবস্থান নেবো আমি। তারপর সে তার অনধিকার



www.amarboi.org

চর্চার ফল বুঝবে। কারণ আমাদেরকে খেপিয়ে দেয়ার জন্য উর্ধ্বতন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিশ্চিতভাবেই ধরে বসবে। কর্ণেল রাজ সিং এরকম কথা শোনায় অভ্যস্ত ছিল না। আমার কথায় মনে হলো খানিকটা ভড়কে গেল সে। এতে করে কাজ হলো। মনে মনে আমার ওপর খেপে থাকলেও তার দৌরাত্ম্য কিছুটা কমলো।

## রাধানগর-ছোটখেল আক্রমণঃ প্রথম পর্যায়

২৬ নভেম্বর জেনারেল গিল অপারেশনাল ব্রিফিংয়ের জন্য ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাঠালেন আমাকে। সেদিনই সন্ধ্যায় ডাউকিতে গেলাম। জেনারেল গিল আমাকে জানালেন, ভোর রাতে ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানি রাধানগর এবং একটি কোম্পানি একই সময়ে ছোটখেল আক্রমণ করবে। আক্রমণের আগে একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট শত্রুর অবস্থান দুটোর ওপর গোলাবর্ষণ করবে। গিল বললেন, তোমার থার্ড বেঙ্গলের দুই কোম্পানি যার যার অবস্থানে থেকে এসল্ট (Assault) করার পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত ফায়ার সাপোর্ট দেবে। এছাড়া গুর্খাদের FUP-(এফ ইউ পি, যেখান থেকে সরাসরি হামলা শুরু করা হয়) নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে তোমার সৈন্যরা। FUP সাধারণত শত্রুর অবস্থান থেকে ৬ শ/৮শ গজ দূরে রাখা হয়। আমার মনে হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সম্পূর্ণ একটি প্রথাগত (Conventional) আক্রমণ পরিচালিত হতে চলেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কোনো ভারতীয় পদাতিক ব্যাটালিয়নের অংশগ্রহণ এটিই প্রথম।

## বীরের জাতি গুর্খা

পাঠকের অবগতির জন্য গুর্খা রেজিমেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গুর্খারা হিমালয়ের এক পাহাড়ি উপজাতি। হাজার বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এদের। আনুগত্য ও সাহসিকতা গুর্খাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লড়াকু জাতি হিসেবে এদের পরিচিতি পৃথিবীর সর্বত্র। গুর্খারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বিনয়ী। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। অসংখ্য VC (Victoria Cross) ভিক্টোরিয়া ক্রস (ভিসি) এদের বীরদের গলায় মালা হয়েছে। এখনো কয়েকটি দেশে গুর্খারা Mercenary (ভাড়াটে সৈন্য) হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন ভারতীয়, বৃটিশ ও ব্রুনাই সেনাবাহিনী। মাতৃভূমি নেপালের সেনাবাহিনীতে তো রয়েছেই। আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার ফকল্যান্ট-যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনী একটি গুর্খা রেজিমেন্টকে



www.amarboi.org

তাদের আক্রমণের বর্শাফলক হিসেবে ব্যবহার করায় তা নেপালের সঙ্গে আর্জেন্টিনার একটি কুটনৈতিক যুদ্ধের সূচনা করে। ফকল্যান্ডেও গুর্খারা তাদের ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে প্রতিপক্ষকে পর্যদুস্ত করে ছাড়ে। বৃটিশরা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ঐ যুদ্ধে জিতে যায়।

এহেন গুর্খাদের ৫/৫ রেজিমেন্ট আমাদের সাহায্য করার জন্য রাধানগর ও ছোটখেল আক্রমণে যাচ্ছে। সবারই মনোবল তখন তুঙ্গে। মনে হলো চূড়ান্ত বিজয়ের আর বেশি দেরি নেই।

## শুরু হলো যুদ্ধ

৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের সিও লে. কর্ণেল রাওয়ের সঙ্গে শেষ রাতে তাদের আক্রমণের FUP (এফ ইউ পি) পর্যন্ত গেলাম। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগ থেকেই রাধানগর ও ছোটখেলে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর ওপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু হলো। সেই সঙ্গে গর্জে উঠলো আমার আলফা ও ডেলটা কোম্পানির মেশিনগানগুলো। মাঝে মাঝে আমাদের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানগুলো থেকেও গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচন্ড সম্মুখযুদ্ধ শুর হয়ে গেলো। ভারতীয় কামান এবং আমার দুই কোম্পানির মেশিনগানগুলো পরিকল্পনা মতো এই পর্যায়ে তাদের ফায়ার কভার বন্ধ করে দিলো। এবার পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণের পালা। গুর্খারা Assault line (এসল্ট লাইন) বানিয়ে বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর দিকে এগুচ্ছিল। তাদের কণ্ঠে রণধ্বনি 'আয়ো-গুর্খালি', যার অর্থ গুর্খারা এসে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গুর্খাদের হামলার ফলাফল আসতে শুরু করলো। অনেক আহত গুর্খা সেনাকে সরিয়ে আনতে দেখলাম। যে কোম্পানিগুলো রাধানগর আক্রমণে গিয়েছিল হতাহতের সংখ্যা তাদেরই বেশি। গুর্খাদের একটি কোম্পানি ওখানকার একটা মেশিনগানের Line of Fire (লাইন অফ ফায়ার) এ পড়ে গিয়েছিল। যার ফলে তারা আর এগুতেই পারেনি। এই কোম্পানিটি প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অন্য কোম্পানির অবস্থাও তথৈবচ। তারাও আর এগুতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে পেছনে ফিরে এলো।

## ছোটখেল দখল এবং আবার হাতছাড়া

ওদিকে ছোটখেলের পাক অবস্থানটি গুর্খারা দখল করে ফেললো। সেখানে অবস্থানরত পাকসেনারা পালিয়ে গিয়ে দূরের কাশবনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান



www.amarboi.org

নিলো। মাত্র আধ ঘন্টার ব্যবধানে এই দুই জায়গায় প্রচন্ড আক্রমণে গুর্খাদের ৪ জন অফিসার ও ৬৭ জন বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের সদস্য হতাহত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা গুর্খাদের এই চরম আত্মত্যাগ আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমরা তাদের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম।

ছোটখেল গুর্খাদের হাতে এলেও রাধানগর সম্পূর্ণ ভাবে পাকবাহিনীর দখলেই রয়ে গেলো। পাকসেনাদেরকে একচুল পরিমাণও টলানো গেলো না এই আক্রমণাভিযানে। গুর্খাদের আক্রমণের প্রচন্ডতা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে পাকসেনারা ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু করে দেয়। এতে আমাদেরও কয়েকজন সৈন্য হতাহত হলো।

ছোটখেলের অবস্থান ছিল রাধানগরের  পেছনে এবং এটিই ছিল পাকসেনাদের মূল প্রতিরক্ষা কেন্দ্র। ছোটখেল হাতছাড়া হওয়াতে পাকবাহিনী বিচলিত হয়ে পড়লো। কারণ, গোয়াইনঘাট যাওয়ার তাদের একমাত্র রাস্তাটি এখন বন্ধ। এজন্য প্রায় মরিয়া হয়েই  ঘন্টাতিনেক পর পাকবাহিনী অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করে আরো সংগঠিত হয়ে আর্টিলারির গোলাবর্ষণের সহায়তায় গুর্খাদের ছোটখেল অবস্থানে প্রতি-আক্রমণ করলো। প্রায় কুড়ি মিনিটের হৈ প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে গুর্খারা ছোটখেরের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে লুনিতে অবস্থানরত আমার ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে আশ্রয় নিলো। পাকবাহিনী ছোটখেল গ্রামে তাদের অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ফেললো। এই পাল্টা হামলাতেও দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলো।

## হতাশার কালো ছায়া

আমরা সবাই খুব মুষড়ে পড়লাম ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের এই বিপর্যয়ে। চারদিকে হতাশাব্যঞ্জক একটা অবস্থা। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর মনোবল একেবারে বিপর্যস্ত। এদিকে পাকসেনারা তাদের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নতুন উদ্যমে ডেল্‌টা কোম্পানির দুয়ারিখেল ও গোয়া গ্রামের অবস্থানগুলোতে তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় তারা এই দুই অবস্থানে হামলা চালালো। বিকেলের দিকে দুয়ারিখেলে অবস্থিত ডেল্‌টা কোম্পানির প্লাটুনটি লুনি গ্রামে পশ্চাদপসরণ করে সেখানকার অবস্থানটির শক্তি বৃদ্ধি করলো। এর মধ্যে খবর এলো রাত আটটায় ডাউকি বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে জেনারেল গিলের অপারেশনাল ব্রিফিং হবে। আমাকে যেতে হবে।



www.amarboi.org

## রাধানগর-ছোটখেল আক্রমণ: দ্বিতীয় পর্যায়

যথাসময়ে ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে পৌঁছলাম। মিত্রবাহিনীর অন্যান্য অফিসারও যথারীতি উপস্থিত। সবাই বিমর্ষ। পরিস্থিতি থমথমে। জেনারেল গিল ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের বিপর্যয়ের জন্য কাউকেই দোষারোপ করলেন না। তিনি শুধু বললেন, ছোটখেল অবস্থানটি ধরে রাখতে না পারার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এই অবস্থানটি দখল করতে গিয়ে গুর্খাদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। জেনারেল গিল গুর্খা রেজিমেন্টের সিও কর্ণেল রাওকে এজন্য সহানুভূতি জানালেন। তারপর সেদিনই (২৮ নভেম্বর) ভোররাত সাড়ে চারটায় দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আবারো রাধানগর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন তাকে। তাদের আক্রমণে সাহায্যকারী হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট গোলাবর্ষণ করবে। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর তিনটি এফএফ কোম্পানি এবং তৃতীয় বেঙ্গলের আলফা কোম্পানি নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে গুর্খাদের ফায়ার সাপোর্ট দেবে।

এরপর তিনি আমাকে লুনি, দুয়ারিখেল ও গোরা গ্রামে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সকল সেনা-সদস্যকে সংগঠিত করে একযোগে ছোটখেল আক্রমণ করে সেটা দখল করার নির্দেশ দিলেন। তবে আমাদের কোনো আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়া হবে না বলে গিল জানালেন। অর্থাৎ কোনো আর্টিলারি সাপোর্ট ছাড়াই আমাদের একটি প্রথাগত আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, যাকে নীরব আক্রমণ বলা চলে।

ঐ গ্রাম তিনটিতে তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি এবং অন্য দুটো প্লাটুন অবস্থান করছিল। অপারেশনের অর্ডার দিয়ে রাত প্রায় একটার দিকে আমি নবীর অবস্থানে পৌঁছলাম। গোরা গ্রামে তখনো থেমে থেমে দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলছিল। দুয়ারিখেল যে এরই মধ্যে পাকসেনাদের দখলে চলে গেছে সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সন্ধ্যার আগে সেখানে অবস্থানরত প্লাটুনটি পশ্চাদ পসরণ করে লুনি গ্রামে অবস্থানরত ডেল্টা কোম্পারি সঙ্গে একত্রিত হয়।

বাংকারে বসেই সব প্লাটুন কমান্ডারকে খবর পাঠালাম। তারা এলে গিলের নির্দেশের কথা জনালাম। প্রায় সবই একবাক্যে এই আক্রমণ কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা বললো। তাদের যুক্তি, গত প্রায় দেড় মাস ধরে অনবরত পালটা পাল্টি যুদ্ধ করে আমাদের সেনা-সদস্যরা খুবই পরিশ্রান্ত। অনেকেই আহত অথবা নিখোঁজ। সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফলে অনেক সময় অভুক্ত থেকেই তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে।



www.amarboi.org

কয়েকদিনের বিশ্রামের পরই একম একটা আক্রমণে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে বলে প্লাটুন কমান্ডাররা অভিমত ব্যক্ত করলো। তাদের বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। তবুও আমাদের এই আক্রমণে যেতেই হবে। আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য বিদেশী গুর্খারা আবারো রাধানগর আক্রমণে যাচ্ছে আর আমরা আক্রমণ স্থগিত রাখার জন্য যুক্তির অবতারণা করছি! অবমাননাকর ব্যাপার। সাবইকে উৎসাহিত করার জন্য বললাম, তোমাদের সঙ্গে আমিও এই আক্রমণে অংশ নেবো। রাত চারটার মধ্যে সবাইকে আমার বাঙ্কারের কাছে নিচু জমিটায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলাম।

## তৃতীয় বেঙ্গলের ছোটখেল দখল

ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেয়ার পর বাংকার থেকে বের হয়ে দেখলাম, কোম্পানির সদস্যরা সবাই আক্রমণে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। এখন নির্দেশের পালা। FUP-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এক সারিতে প্রায় একশো পঞ্চাশজন যোদ্ধা। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেই রাধানগরে ওপর মিত্রবাহিনীর কামানের প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর আমরা Extended line- (এক্সটেনডেড লাইন) এ ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলোর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। লাইনের একেবারে বাঁয়ে ছিলাম আমি। শত্রুর অবস্থান আর মাত্র তিনশো গজ দূরে। 'ইয়া হায়দার', 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে চারদিকে কাঁপিয়ে তৃতীয় বেঙ্গল বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে শত্রু অবস্থানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কয়েকটি বাঙ্কারে রীমিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হলো। তৃতীয় বেঙ্গলের সৈন্যরা তখন এক অজেয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কোনো বাধাই তাদেরকে আটকে রাখতে পারছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলোর পতন হলো। গুর্খারা যেই অবস্থান দখলের লড়াইয়ে মাত্র একদিন আগে পরাজিত হয়েছিল, আজ সেটা আমাদের হাতের মুঠোয়। তৃতীয় বেঙ্গল প্রমাণ করলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের অন্য যে-কোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় তাদের সাহস, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম।

পাকসেনারা পশ্চাদপসরণ করে দূরের কাশবনের আড়ালে পালিয়ে গেলো। তাদের বেশ কয়েকজন আমাদের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামের সর্বত্র পাকিস্তানি সৈন্যদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। ছোটখেল দখলের পর



www.amarboi.org

পাকসেনাদের প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ আর খাদ্য সামগ্রী আমাদের হাতে আসে, যা দিয়ে অন্তত কয়েক মাস যুদ্ধ করা সম্ভব। পাকসেনাদের পরিত্যক্ত বাঙ্কারগুলোতে চারজন ধর্ষিত মহিলার লাশ পাওয়া গেলো। অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর বর্বর পাকসেনারা পালানোর সময় তাদেরকে হত্যা করে যায়।

## আমি আহত হলাম

বিজয় আনন্দের আতিশয্যে কয়েকজন সৈন্য কয়েকটা খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। জ্বলন্ত খড়ের গাদার আগুনে এলাকাটা আরো আলোকিত হয়ে উঠলো। আমি পাকসেনাদের একটি বাঙ্কারের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখছি। বালির বস্তা, বাঁশ, ভারি কাঠ দিয়ে তৈরি বাঙ্কারগুলো। মর্টারের শেলও ওগুলোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলে মনে হলো। চারদিকে তখনো বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। আগুনের আলো লক্ষ্য করে পাকসেনারা দূর থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। হঠাৎ করেই ডান কোমরে প্রচন্ড এক আঘাত পেয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেলাম আমি। উঠতে চেষ্টা করেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম গুলিবিদ্ধ হয়েছি। শুয়ে থেকেই নড়াচড়া করে বুঝলাম হাড় ভাঙ্গেনি। বুলেটটা ভেতরেই রয়ে গিয়েছিল। প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছিল এ সময়। আমার ব্যাটালিয়নের ডাক্তার ওয়াহিদ তখন লুনিতে। কয়েকজন সহযোদ্ধা আমাকে ধরাধরি করে তার কাছে নিয়ে গেলো। আমার আগে আরো চারজন আহত সৈনিককে সেখানে আনা হয়েছে। ওয়াহিদ সবাইকে ফার্স্ট এইড দিলো। তীব্র যন্ত্রণা কমানোর জন্য আমাকে বেদনা নাশক ঘুমের ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। সেই অবস্থায় একটা চিঠিতে আমার কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। পাল্টা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে লিখলাম ওদেরকে। এই সাধারণ বিজয়গৌরব যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও ধরে রাখার নির্দেশ দিলাম। আরো বললাম, আমার আহত হওয়ার কথা যেন সৈন্যরা জানতে না পারে। কারণ, তাহলে তাদের মনোবল ক্ষুণ্ন হতে পারে। আহত অবস্থায় চিঠিটা লিখি বলে হস্তাক্ষর খুব খারাপ হয়েছিল। ঐ সময় আমার স্ত্রীকেও একটা চিঠি লিখি। সে তখন ব্যাটালিয়নের Line of Battle-(লাইন অফ ব্যাট্ল) এর সঙ্গে বাঁশতলার জঙ্গলে অবস্থান করছিলো। তারা যাতে কোনো দুশ্চিন্তা না করে সে জন্যই চিঠিটা লেখা।

## 'জেড ফোর্স'- ১ এবং ৮ বেঙ্গলের সিলেট গমন

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, পাক-ভারত সমর কৌশলের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে জেড ফোর্সকেও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তেলঢালার অবস্থান থেকে ১০ অক্টোবর '৭১ সিলেট রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের



www.amarboi.org

মুক্তিযুদ্ধ জোরালো রূপ ধারণ করেছিল। মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ও গেরিলা-যোদ্ধাগণ যুদ্ধের বাস্তব প্রশিক্ষণ শেষে এ সময়ে সত্যিকারের একটি গর্ব করার মত লড়াকু শক্তিতে পরিণত হয়। 'জেড ফোর্স'- কে সিলেট রণাঙ্গণে প্রেরণ করে সিলেটের যুদ্ধে গতিশীলতা আনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। কেননা এ সময়ে সিলেটে পাকিস্তানি সামরিক শক্তি দুটি পদাতিক ব্রিগেডকে ডিপ্লয়মেন্টে রেখে সিলেটে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ৪ ও ৫ নং সেক্টরের সেক্টর ট্রুপ্সের পাশাপাশি 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড টিকেও সিলেট রণাঙ্গনে পাঠানো হলে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এখানে উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্নেল এম.এ.জি.ওসমানী এবং বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন দেশের বিশেষ কোন একটি কৌশলগতভাবে মুক্তি বাহিনীর জন্য সুবিধাজনক একটি অঞ্চলকে পাকিস্তানি মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে।

উল্লেখ্য, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে (চুয়াডাঙ্গা) এরূপ মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যেগ নেয়া হয়েছিল। ফেনীর বিলোনিয়া বাল্‌জ এলাকা, এবং ত্রিপুরা বর্ডার সংলগ্ন রামগড়ে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ৩টি পরিকল্পনার কোনোটিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র কুড়িগ্রামের চিলমারী বন্দরের বিপরীতে রৌমারীতেই দুর্ভেদ্য মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়। রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে মূল ভূ-খন্ডের সড়ক সংযোগ ভাল ছিল না। উল্লেখ্য, পাক-ভারত যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিক পরিবর্তনের কারণে সিলেট ফ্রন্ট এর অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী স্বয়ং ৫ অক্টোবর '৭১ তেলঢালায় 'জেড ফোর্স'- এর হেডকোয়ার্টার পৌছেন। তিনি 'জেড ফোর্স' অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়াউর রহমানকে তাঁর পুরো ব্রিগেড নিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে ৫-৯ অক্টোবরের মধ্যে সিলেটের দিকে মুভ করার নির্দেশ দেন। ১০ অক্টোবরে এই ব্রিগেডের সর্বশেষ অংশটিও সিলেটে রওনা হয়ে যায়। সিলেট এলাকায় 'জেড ফোর্সের উপরিউক্ত যুদ্ধসমূহ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ-

## দক্ষিণগুল চা বাগান আক্রমণ-৮ বেঙ্গল, অক্টোবর ২য় সপ্তাহ '৭১

দক্ষিণগুল চা বাগান মৌলভীবাজার মহকুমার বড়লেখা থানায় অবস্থিত। এটি সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। এর পাশেই ভারতীয় সীমান্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানিবাহিনী শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। পাকিস্তানিদের ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট এখানে অবস্থান নিয়েছিল। চা বাগানটি সীমান্ত এলাকায়



www.amarboi.org

হওয়ায় এখান থেকে শত্রুবাহিনী ভারতীয় সীমান্তে আক্রমণ করত। ভৌগলিক অবস্থানরত কারণে দক্ষিণগুল চা বাগানের গুরুত্ব ছিল অনেক। আর সে কারণে দক্ষিণগুল চা বাগানের দখল নেয়া মুক্তিবাহিনীদের জন্য গুরুত্বপুর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি জেড ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়া ১ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ৪নং সেক্টরকে (মেজর সি আর দত্তের) শক্তিশালী করা হয়। ফলে মুক্তিবাহিনীর শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর আমিনুল হকের নেতৃত্বে সিলেটের চা বাগানগুলোর ওপরে আক্রমণ চালায়। পরিকল্পনা ছিল চা বাগানগুলো শত্রু মুক্ত করে সিলেটের দিকে অগ্রসর হওয়া। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রথমে আঘাত হানল কেজুরীছড়া চা বাগানের ওপর। এমনিভাবে সেক্টর ট্রুপ্স এবং 'জেড ফোর্স' পুরো সিলেট জেলার ওপর একটার পর একটা আঘাত হানতে শুরু করল এবং পাকিস্তানিদের পর্যুদস্ত করতে শুরু করল।

আর এই আক্রমণের ধারাবাহিকতায় দক্ষিণগুল চা বাগান আক্রমণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দক্ষিণগুল চা বাগানের ওপর আক্রমণ চালালো। শত্রুদের ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট ওখানে ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দক্ষিণগুলে ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারি দক্ষতার সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। দক্ষিণগুল জয়ের অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে ১০৫ আর্টিলারির সাফল্যজনক ব্যবহার অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ সিলেট সেক্টরে ক্যাপ্টেন রশীদের পরিচালনায় সর্বপ্রথম হয়েছিল। ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারিকে পরবর্তীকালে রওশন-আরা ব্যাটারি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

## অপারেশন ছাতক ৩য় বেঙ্গল (১৩-১৭ অক্টোবর '৭১)

### অপারেশনের প্রেক্ষাপট

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনের রেখে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ছাতক ও কোম্পানীগঞ্জ, ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে শ্রীমঙ্গল এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মৌলভীবাজার এলাকায় অপারেশন পরিচালনার জন্য নিয়োজিত করা হয়।



www.amarboi.org

## ছাতকের অবস্থান

সুরমা নদীর তীরবর্তী ছাতক শহর হচ্ছে সীমান্তবর্তী একটি গুরুত্বপুর্ণ নদীবন্দর। ভারত সীমান্ত থেকে ১০/১২ মাইল অভ্যন্তরে এই থানা শহরটির সঙ্গে নদী, সড়ক ও রেলপথে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ শহরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত দেশের শতকরা নব্বই ভাগ শতাংশ বোল্ডার, ভাঙ্গা পাথর, নুড়ি পাথর, প্রিগ্রাভেলস, সিঙ্গেলস ও মোটা বালু এই ছাতক থেকেই সরবরাহ হয়ে থাকে। ছাতক রেলস্টেশন থেকে দেশের বৃহত্তম পাথরের কোয়ারী ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত 'রোপওয়ে' তৈরি করা ছিল। ছাতক শহর সংলগ্ন সুরমা নদীর পশ্চিম তীরে ছিল দেশের একমাত্র সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান 'ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি'।

www.amarboi.org
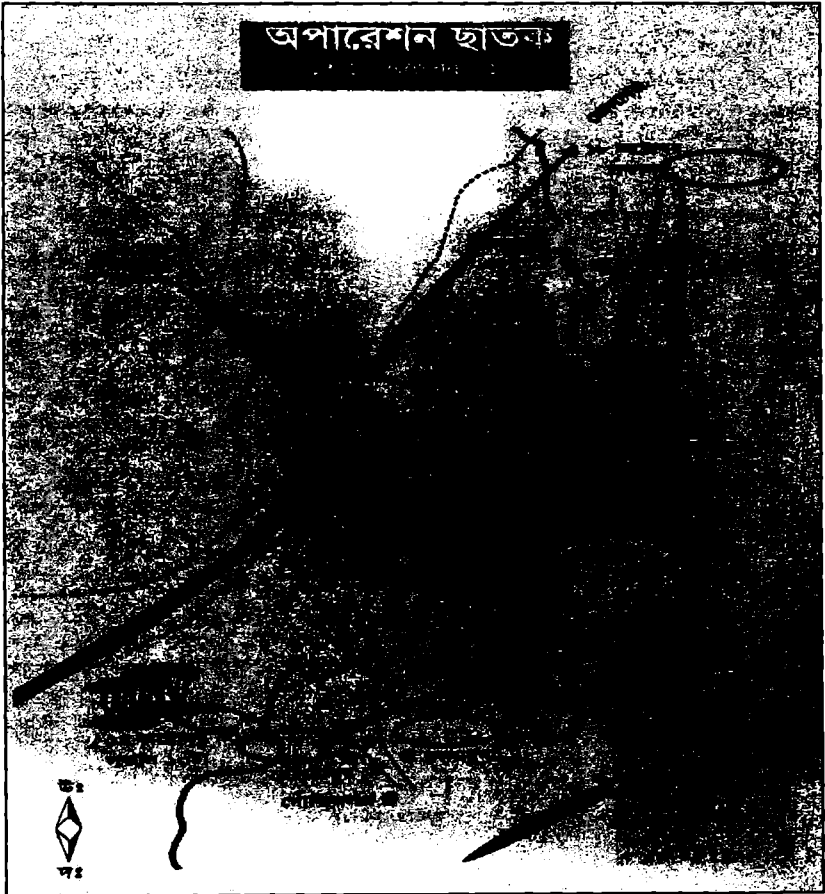
## পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান

ছাতক শহর থেকে ৩৫ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে সিলেট শহরে ছিল দখলকার বাহিনীর ২০২ ব্রিগেডটির হেডকোয়ার্টার। ঐ ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং শহর এলাকায় ছিল ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য। এদের সঙ্গে ছিল ১২ ফ্রন্টিয়ারর্স, ইপিসিএএফ এবং রাজাকার বাহিনীর দুই কোম্পানি শক্তিসম জনবল। মজবুত আরসিসি ঢালাই করা বাঙ্কার খননের মাধ্যমে সিমেন্ট ফ্যাক্টরিটি ঘিরে ওরা ফ্যাক্টরী এলাকার টিলাগুলোর ওপর অবস্থান নিয়েছিল। ফিল্ড টেলিফোন লাইন স্থাপন করে প্রতিটি বাঙ্কারের সঙ্গে ফিল্ড হেডকোয়ার্টারের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া ছাতকের সঙ্গে সিলেট সদরে ওদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে ও শক্তিশালী ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে যোগযোগ ছিল।

## মুক্তিবাহিনীর অবস্থান

পূর্বেই বলা হয়েছে ছাতকের উত্তরে সীমান্ত ঘেঁষে বাঁশতলা নামক স্থানে ৫ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। এই বাঁশতলাতেই ছিল শেলা সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টার। শেলা সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন হেলাল উদ্দিন। শেলা সাবসেক্টরের অধীনে ছিল কয়েকটি এফএফ কোম্পানি। এই সেক্টরের অধীনে কোনো নিয়মিত বাহিনী ছিল না। এমএফ এবং এফএফ মিলে এই সেক্টরের অধীনে ৫টি সাব সেক্টর মোটামুটি ৯/১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিল। এছাড়া প্রতিটি সাব-সেক্টরে যথেষ্ঠ সংখ্যক সহযোগী মুক্তিযোদ্ধার ছিল ।

## অপারেশনের পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

গারো পাহাড়ের তেলঢালা ক্যাম্প থেকে ভারতের গৌহাটি, শিলং ও চেরাপুঞ্জী হয়ে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা ১১ অক্টোবর বিকেলে ৫ সেক্টর হেডকোয়ার্টার বাঁশতলায় পৌছে। ১২ অক্টোবর দুপুরে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী বাঁশতলা ক্যাম্পে এসে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ১৪ অক্টোবর ছাতক আক্রমণের নির্দেশ দেন। এই আক্রমণে ৫ সেক্টর কমান্ডারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতার নির্দেশ দেন। ৫ সেক্টরের দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এই অপারেশন পরিচালনা করা হয়। নিজস্ব রেকি এবং পরিকল্পনা ছাড়াই ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই প্রথাগত আক্রমণে যেতে বাধ্য হয়।



www.amarboi.org

## আক্রমণে নির্দেশ ও দায়িত্ব বন্টন

আদিষ্ট হয়ে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনের আলফা এবং ক্যাপ্টেন [illegible] হোসেনের ব্র্যাভো কোম্পানিদ্বয়কে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীর মূল অবস্থানের ওপর আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব দেন। রৌমারীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আখতার স্টুডেন্ট কোম্পানিটিকে আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির রি-ইনফোর্সমেন্ট এবং রিয়ারে প্রটেকশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। শেলা সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন হেলালকে প্রয়োজনীয় গাইড সরবরাহ, রি-ইনফোর্সমেন্ট এবং এ্যাম্যুনিশন রিপ্লেনিশমেন্ট সহ আনুষঙ্গিক দায়িত্বগুলো পালনের নির্দেশ দেয়া হয়। অপারেশন চলাকালীন দোয়ারা বাজার হয়ে ওয়াপদার বেড়িবাধ ধরে যাতে শত্রুর রি-ইনফোর্সমেন্ট আসতে না পারে সেজন্যে কাট-অফ পার্টির দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। সড়ক পথে সিলেট শহর থেকে গোবিন্দগঞ্জ হয়ে ছাতক শহরে যাতে শত্রুর কোনো রি-ইনফোর্সমেন্ট আসতে না পারে সেজন্য ডেল্টা কোম্পানিকে ছাতক ও গোবিন্দগঞ্জের মাঝামাঝি মাধবপুর ও হাসনাবাদ এলাকায় সড়ক ও রেলপথকে অবরোধ করে আরেকটি কোম্পানিকে বাঁশতলা ক্যাম্প থেকে ১০/১২ মাইল পূর্ব ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রয়োজনীয় গাইড ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা নেবার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ সময় ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট (প্রকৌশলী) আ জ ম আলমগীর।

## যুদ্ধযাত্রা এবং চূড়ান্ত আক্রমণ

১২ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ভোলাগঞ্জ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে ব্যাটালিয়ণ টু-আই-সি এবং চার্লি কোম্পানি কমান্ডার মেজর মোহসীনকে আলফা, ব্র্যাভো, চার্লি এবং স্টুডেন্ট কোম্পানিগুলো সার্বিক প্রস্তুতির দায়িত্ব দিয়ে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলও ভোলাগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। শত্রুর মূল অবস্থানের পেছনে মাধবপুর-হাসনাবাদ এলাকায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে 'কার্ট-অফ-পার্টি' হিসেবে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়ার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়াবহ। এই অপারেশনটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক ভোলাগঞ্জে উপস্থিত হয়ে সার্বিক আয়োজন স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন। অতিরিক্ত ফায়ার সাপোর্ট হিসেবে তিনি এই কোম্পানির সঙ্গে ২টি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং ৪টি এইচএমজি-এর ডিটাচমেন্ট নিয়োজিত করেণ। গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে ডেল্টা কোম্পানির মুভ করার সকল ব্যবস্থা করে ১৩



www.amarboi.org

অক্টোবর দুপুরের পরপরই ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল বাঁশতলা ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

১৩ অক্টোবর বিকেলেই ডেল্টা কোম্পানি বরিডোর নামক গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যায়। এ সময় বড়িডোরে অবস্থান নিয়েছিল লেফটেন্যান্ট ইয়ামীন চৌধুরী এবং লেফটেন্যান্ট ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন দুটি এফএফ কোম্পানি। বরিডোরকে এই অপারেশনের রিয়ার এ্যাসেম্বলি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ঐ সময়কার ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট আলমগীর (ইঞ্জিনিয়ার) ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে কমান্ডার রশিদের নেতৃত্বাধীন এফএফ কোম্পানিটি নিয়ে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানান। সে মতে কমান্ডার রশিদকেও সন্ধ্যার মধ্যেই তার এফএফ কোম্পানি নিয়ে বরিডোরে পৌছার নির্দেশ দেন।

১৩ অক্টোবর সন্ধ্যার পর পরই ডেল্টা কোম্পাানি, ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার কোম্পানির দু'টি ডিটাচমেন্ট এবং রশিদের নেতৃত্বাধীন এফএফ কোম্পানি মাধবপুরের উদ্দেশে বুড়িডোর অবস্থান ত্যাগ করে প্লাটুনভিত্তিক দুটি কোম্পানি নির্দিষ্ট অবস্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। সুরমা নদীর উত্তর তীরে পারকুল গ্রামে পৌঁছতে ভোর হয়ে যায়। সাব-সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট আলমগীর ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গেই একই নৌকায় করে পারকুলে পৌছান। পারকুলে পৌছে দেখা গেল যে, ডেল্টা কোম্পানির ১০ প্লাটুন এবং কমান্ডার রশিদের নেতৃত্বাধীন এফএফ কোম্পানির কোনো হদিসই পাওয়া যাচ্ছিল না। ১০ প্লাটুনের প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার করম আলী। প্রাপ্ত সৈনিকদের নিয়েই বাকি ফোর্স নিয়ে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীর সংলগ্ন কালারুখা বাজার সংলগ্ন বোবরা গ্রামের মসজিদ এলাকায় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে হাসনাবাদ ও মাধবপুর এলাকায় রেল ও সড়কপথ অবরোধ করে অবস্থান নিয়ে নেয়। ১৪ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকেই শত্রুর তার ছাতক শহর অবস্থান থেকে এসে বার বার প্রতিহামলা চালায়।

ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে ২টি ৩ ইঞ্চি মর্টার বারবার স্থান পরিবর্তন করে শত্রুর ছাতক শহরের অবস্থানগুলোর ওপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। মেশিনগানগুলোর অবস্থানও এমনই ছিল যে, শত্রুর বার বার চেষ্টা করেও ডেল্টা কোম্পানির সৈন্যদের অবস্থানচ্যুত করতে পারছিল না। অন্যদিকে দুপুর গড়িয়ে যাবার পরও হাওরে নিরুদ্দেশ হওয়া সুবেদার করম আলীর প্লাটুন এবং রশিদের এফএফ কোম্পানি মাধবপুরে পৌছতে ব্যর্থ হয়। স্বল্পসংখ্যক শত্রু সৈন্য সড়ক, রেলপথ ধরে ছাতকের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে ডেল্টা কোম্পানির



www.amarboi.org

সৈন্যরা ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শত্রুর ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে সুরমা নদী অতিক্রম করে অপর পাড়ের পারকুল গ্রামে গিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। শত্রু অনবরত আর্টিলারি ও মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে পুরো পারকুল গ্রামটিকেই ঝাঝরা করে দিচ্ছিল। ঐ অবস্থায় প্রাপ্ত নৌকা নিয়ে এক প্লাটুন এক প্লাটুন করে ডেল্টা কোম্পানির সৈন্যরা পারকুলের অবস্থানও ছেড়ে দিয়ে বুড়িডোরের উদ্দেশে পশ্চাদাপসরণ করে।

ওদিকে মেজর মোহসীনের চার্লি কোম্পানি ১৩ অক্টোবর রাতেই তার অধীনস্থ চার্লি কোম্পানি নিয়ে টেংরাটিলা এলাকায় কাট-অফ-পার্টি হিসেবে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়ার জন্য বাঁশতলার অবস্থান ছেড়ে চলে যান। টেংরাটিলা এলাকায় কাট-অফ-পার্টি হিসেবে 'চার্লি' কোম্পানির প্রতিরক্ষা অবস্থান নেবার উদ্দেশে ছিল দোয়ারা বাজার হয়ে ওয়াপদার বেড়িবাঁধ এবং সুরমা নদীপথ ধরে পাকিস্তানের কোনো রি-ইনফোর্সমেন্ট যাতে ছাতকে না পৌছতে পারে। মেজর মীর শওকতের ৫ সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং শেলা সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৩ অক্টোবর সকাল বেলা পর্যন্তও টেংরাটিলায় পাকিস্তানি বাহিনীর কোনো প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল না। কয়েকটি নৌকায় করে মেজর মোহসীনের কোম্পানিটি ১৪ অক্টোবর প্রত্যুষে যখন টেংরাটিলা অবস্থানের ৫০ গজের মধ্যে পৌছে তক্ষুণি আকস্মাৎ একযোগে সবকয়টি নৌকার ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর গুলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এরকম পরিস্থিতির জন্য মেজর মোহসীনের কোম্পানি প্রস্তুত ছিলো না। ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। অস্ত্র ফেলে অনেকে নদী সাঁতরিয়ে প্রাণে বাঁচেন। মেজর মোহসীনও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নদী সাঁতরিয়ে এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। স্থানীয়ভাবে গ্রাম্য চিকিৎসকের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে নৌকা ও হাঁটাপথ ধরে ৪ দিন পর বাঁশতলা ক্যাম্পে ফিরে আসেন। এই কোম্পানির অধিকাংশ অস্ত্রই নদী ও হাওড়ের অথৈ পানিতে হারিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ডুবে শাহাদাত বরণ করেন ২২ জন। আহত হন বেশ কয়েকজন। জীবিতরা কোনো রকমে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় বাঁশতলা ক্যাম্পে ফিরে আসতে সক্ষম হন। পুরো 'চার্লি' কোম্পানি পরবর্তী অপারেশনের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে।

মূল আক্রমণকারী দল ক্যাপ্টেন আনোয়ারের আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি ১৪ অক্টোবর ভোর রাতেই ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি সংলগ্ন হাদার টিলায় অবস্থান নিয়ে নেয়। কমান্ডার আখতারের নেতৃত্বে স্টুডেন্ট কোম্পানি ও রিয়ার প্রটেকশন পার্টি হিসেবে বাংলাবাজার (পাকিস্তান বাজার) এলাকায় ওয়াপদার বেড়িবাঁধকে আড় করে অবস্থান নিয়ে নেয়। আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির আক্রমণে ফায়ার



www.amarboi.org

সাপোর্ট দেয়ার জন্য মিত্রবাহিনীর দেয়া ৮টি ৪.২ ইঞ্চি মর্টার কমান্ডার আখতারের 'স্টুডেন্ট কোম্পানি'র প্রতিরক্ষা এলাকায় ডিপ্লয় করা হয়।

১৪ অক্টোবর দুপুর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ঐ রাতে আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি অগ্রসর হয়ে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির চারদিকের দেওয়াল সংলগ্ন টিলার উঁচু স্থানগুলোতে অবস্থান নিয়ে নেয়। আলফা কোম্পানি ঐ পর্যায়ে শত্রুর সম্মুখবর্তী অবস্থানের ১০০ থেকে ১৫০ গজের মধ্যে পৌঁছে যায়। ১৫ অক্টোবর দিনভর দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় চলে। আলফা কোম্পানীর আর আর এর গোলার আঘাতে শত্রুর অনেকগুলো বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায়। সন্ধ্যার মধ্যেই আলফা কোম্পানী ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকায় ঢুকে পড়ে। ক্যাপ্টেন আকবরের ব্র্যাভো কোম্পানিও ঐ পর্যায়ে আলফা কোম্পানির কাছাকাছি গিয়ে অবস্থান নেয়।

১৪ অক্টোবর রাতেই সিলেট থেকে সড়কপথে ছাতকে শত্রুপক্ষের ব্যাপক রি-ইনফোর্সমেন্ট এসে যায়। মাধবপুর ও হাসনাবাদ এলাকা থেকে ডেল্টা কোম্পানি উইথড্র করে চলে আসার ফলেই এটা সম্ভব হয়। এদিকে চার্লি কোম্পানি টেংরাটিলায় অবস্থান না নিতে পারার কারণে ১৪ অক্টোবর বিকেল থেকেই দোয়রাবাজার হয়ে ওয়াপদার বেড়ি বাঁধ ধরে শত্রুর ৩৩ বালুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানিকে পেছন থেকে ঘিরে ফেলার জন্য অগ্রসর হয়। শত্রুর ৩টি হেলিকপ্টারের সাহায্যে ১৫ অক্টোবর সকাল থেকেই আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির অবস্থানের ওপর মেশিনগানের গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে।

১৬ অক্টোবর সকালে দেখা গেল শত্রু আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির ঠিক পেছনের উঁচু টিলাগুলোতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিতে শুরু করেছে। এদিন সকাল থেকেই শত্রুর সঙ্গে আলফা কোম্পানির সৈন্যদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। দিনভর ব্র্যাভো কোম্পানির ফায়ার সাপোর্ট দিয়ে যায়। সন্ধ্যার মধ্যেই পুরো সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকাটি আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির দখলে চলে আসে। কিন্তু আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি ঠিক পেছনেই উঁচু টিলাগুলোতে দিনভর শত্রুর সৈন্য সমাবেশ ক্যাপ্টেন আকবরকে চিন্হিত করে তোলে। সন্ধ্যার পরপরই ক্যাপ্টেন আকবর সর্বিক অবস্থান পর্যালোচনার জন্য ক্যাপ্টেন আনোয়ারের অবস্থানে পৌছান। আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির সঙ্গে চার্লি ও ডেল্টা কোম্পানির কোনো যোগাযোগ ছিল না। রিয়ারের সঙ্গেও যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।


www.amarboi.org

আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি তখন শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কোম্পানির নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন আকবর এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ার অবস্থান ছেড়ে পেছনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর সদস্য আকবরের পাহাড়ী চোরাপথগুলো জানা ছিল। আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি বাদারটিলায় অবস্থান নিলে আকবর স্বেচ্ছায় রাজাকার বাহিনী ছেড়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। আকবর গাইড করে আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানিদ্বয়কে কোথাও হাঁটু পানি আবার কোথাও গলাপানি হয়ে পেছনে ওয়াপদার বেড়িবাঁধ এলাকায় ভোরের আলো দেখার আগেই পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানি অবস্থান ছেড়ে চলে গেছে দেখে ১৭ অক্টোবর পাকিস্তানি বাহিনী এ দুটি কোম্পানিকে পেছন ধাওয়া করতে গিয়ে ওয়াপদার বেড়িবাঁধ ধরে ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানবাজার এলাকায় পৌঁছে এরা কমান্ডার আখতারের স্টুডেন্ট কোম্পানির মুখোমুখি হয়। উইথড্রয়ালের কোনো নির্দেশ না পাবার কারণে স্টুডেন্ট কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে অগ্রসরমান পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করে। এদিন বিকেলে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে এদের হাতাহাতি যুদ্ধ বেঁধে যায়। ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা নিজ নিজ বাঙ্কারে অবস্থান নিয়েই শত্রুর গুলির আঘাতে ঝাঝরা হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। ২৫/৩০ জনের মতো মারাত্মকভাবে আহত হন। জীবিতরা ৮টি ৪.২ ইঞ্চি মর্টারসহ ১৭ অক্টোবর রাতে পেছনে বাঁশতলা ক্যাম্পে পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়। শত্রু ১৮ অক্টোবর সকাল থেকেই পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে মুক্তিবাহিনীকে ধাওয়া করে সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ঐদিনই বিকেলের দিকে শত্রু ছাতকের দিকে ফিরে যায়। ৫ দিন স্থায়ী ছাতক অপারেশনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

## ফলাফল

ছাতক অপারেশনে উভয় পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই অপারেশনের সংবাদ ফলাও করে বিবিসিসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর এই আক্রমণের সংবাদে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর সদর দপ্তর রাওয়ালপিন্ডিও কেঁপে উঠেছিল। পর্যাপ্ত রেকি, ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে এক কোম্পানির সঙ্গে অন্য কোম্পানিগুলোর যোগাযোগ, রি-ইনফোর্সমেন্টের এবং পর্যাপ্ত ফায়ার সাপোর্টের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে এ ধরনের প্রথাগত আক্রমণে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত ছিল না তবে আমাদেরকে এ ধরণের অভিযানে প্রায়শই যেতে হয়েছিল।



www.amarboi.org

## ফুলতলা-সাগরনাল চা বাগান রেইড-১ বেঙ্গল ১৫ অক্টোবর '৭১

ফুলতলা চা বাগান মৌলভীবাজার মহকুমার কুলাউড়া থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাগানে পাকিস্তানি বাহিনী একটি শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করেছিল। শক্তি সামর্থও সংহত করে যথেষ্ট পরিমাণে। নিরীহ চা শ্রমিকরা তখন পাকিস্তানিদের নির্যাতনে ঘরবাড়ি ছেড়ে পলাতক। বস্তিতে থেকে যাওয়া বাদবাকি লোকজনের ওপরও চলে তাদের অমানুষিক অত্যাচার। এ অত্যাচারের কাহিনী ভারতীয় ভূখণ্ডে একদিন পৌঁছে যায়। সেখানে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর কর্মকর্তারা এদের সমুচিত শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা তৈরি করেন। ঠিক করেন আক্রমণের দিনক্ষণ।

দিনটি ছিলো ১৫ অক্টোবর। এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সঙ্গে তাদের প্রচলিত হালকা ধরনের অস্ত্র ও প্রচুর গোরাবারুদ। ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার ভেতরে ছিলো পুলিশ, ইপিআর, আনসার মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য। সঙ্গে ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি। সেক্টর ট্রুপস ও 'জেড ফোর্স' যৌথভাবে আক্রমণ করে। এফএফ বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাসুক আহমেদ। আর তাঁর সহকারীরা ছিলেন যথাক্রমে আব্দুল মোমিত আসুক, দেবাশিস মজুমদার (টিপু), আজমল আলী, মোবারক আহমেদ ও গৌরাঙ্গ দেব প্রমুখ।

অক্টোবরের মাঝামাঝি 'জেড ফোর্স' কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়া ১ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ৪ নং সেক্টরে সাহায্যার্থে আসেন। তাতে মুক্তিবাহিনীর শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর আমিনুল হকের নেতৃত্বে সিলেটের চা বাগানগুলোর ওপরে আক্রমণ চালায়। পরিকল্পনা ছিল চা বাগানগুলো শত্রু মুক্ত করে সিলেটের দিকে অগ্রসর হওয়া। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রথমে আঘাত হানল কেজুরীছড়া চা বাগানের ওপর। এমনিভাবে সেক্টর ট্রুপ্স এবং 'জেড ফোর্স' পুরো সিলেট জেলার ওপর একটার পর একটা আঘাত হানতে শুরু করল এবং পাকিস্তানিদের পর্যুদস্ত করতে শুরু করল। এরই ধারাবাহিকতায় সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বাগানে প্রবেশ করেন। চা বাগানের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে অগ্রসর হতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধারা। এই ভাবে একসময় পৌছে যান তারা নির্দিষ্ট স্থানে। চূড়ান্ত করা হয় প্রস্তুতি। তারপর রাত ৪ টায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি হায়েনাদের ওপর। যুদ্ধ চলে পরদনি ১১টা পর্যন্ত। যুদ্ধে কমপক্ষে ২৫ জন



www.amarboi.org

পাকিস্তানি সৈন্য প্রাণ হারায়। আহত হয় অনেকে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নগন্য।

## গোয়াইনঘাট সিজ অপারেশন ৩ বেঙ্গল (২৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহ '৭১)

গোয়াইন ঘাট অপারেশনের আংশিক বিবরণ আগে কেওয়া হয়েছে। বৃহত্তর সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট একটি সীমান্তবর্তী থানা সদর। সুরমা নদী (স্থানীয়ভাবে পিয়ং নদী বলে পরিচিত) এই থানা সদরটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। পূর্বপাড়ে রয়েছে বিএডিসি অফিস এবং থানা ফুড গোডাউনসহ বিভিন্ন সরকরী প্রতিষ্ঠান। পশ্চিম পাড়ে রয়েছে থানা হাসপাতাল, বাজার ও স্কুলসহ অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। ফেরি নৌকার সাহায্যেই দু' পাশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। পূর্ব পাড়ের সঙ্গে পাকা সড়ক পথে উত্তরে সীমান্তবর্তী সারিঘাট, শ্রীপুর, জৈন্তাপুর এবং তামাবিল চেকপোস্ট পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণে দরবস্ত, হরিপুর, খাদিমনগর এবং সিলেট শহরের সঙ্গেও ঐ একই পাকা সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। উত্তরে রাধানগর হয়ে ভারতীয় তামাবিল-ডাউকি-শিলং সড়কপথটি উর্ধ্বে ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এদিকে কাঁচা সড়ক পথে সালুটিকর ফেরিঘাট হয়ে সিলেট শহরের সঙ্গেও গোয়াইনঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

## গোয়াইনঘাটের সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব

সীমন্তবর্তী থানা সদর এবং সিলেট-তামাবিল-ডাউকি-শিলং এক্সিসের অতি নিকটে অবস্থানের কারণে একাত্তরে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে গোয়াইনহাট ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য একটি অতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী শহর। সিলেট শহরের প্রতিরক্ষার জন্য এই অবস্থানটি নিজ দখলে না রাখার কোনো বিকল্প ছিল না। সিলেট শহরের পতনের জন্য মুক্তিবাহিনীর বিবেচনায় এই থানা শহরটি যথাশীঘ্র শত্রুমুক্ত করার প্রয়োনীয়তা দেখা দেয়। বাণিজ্যিক দিক থেকেও এই থানা শহরটির গুরুত্ব ছিল অনেক। জাফলং এবং শ্রীপুর পাথরের কোয়ারী থেকে প্রাপ্ত বোল্ডার, সিঙ্গেলস, প্রি-গ্রাভেলস এবং মোটা বালি বর্ষাকালে এই গোয়াইনঘাট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নদীপথে ছাতক হয়ে চালান হতো। বর্ষাকালে তাই শত শত বার্জকে এই সারিঘাট ও গোয়াইনঘাটে সারিবদ্ধ হয়ে এ সকল কনস্ট্রাকশন মেটোরিয়ালস লোড করার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যেত।



www.amarboi.org

## পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান

বাংলাদেশ সীমান্তে যেসব সম্ভাব্য নিরাপদ পথ ধরে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় বাহিনী মুভ করতে পারে, সেসব যোগাযোগ পথগুলেকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় অনেকগুলো শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছিল। এসব Strong Hold-(স্ট্রংহোল্ড) এ প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়ে যাতে মাসের পর মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় তার সর্ববিধ ব্যবস্থাই তারা করে রেখেছিল। শিলং-ডাউকি-তামাবিল-সিলেট রূটে গোয়াইনঘাট ছিল ঐ ধরনের একটি সীমান্তবর্তী শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান। নদীর পূর্ব পাড়ে আজির উদ্দিন চেয়ারম্যানের বিশাল পাকা বিল্ডিংটিতে সদর দপ্তর স্থাপন করে নদীর তীর ঘেঁষে পুরো এলাকা নিয়ে ওরা আরও একটি শক্ত প্রতিরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলেছিল। তিন দিক দিয়ে ঘেরা সুরমা নদী Natural Major Obstacle (ন্যাচারাল মেজর অবস্ট্যাক্ল) হিসেবে পাকিস্তানিদের ঐ শক্ত প্রতিরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিল। পশ্চিমে ভোলাগঞ্জ ও কোম্পানীগঞ্জ উত্তরে রাধানগর, জাফলং বাজার, জৈন্তাপুর ও সারিঘাট এবং পূর্বে দরবশত, মুক্তারপুর ও কানাইঘাট পর্যন্ত এলাকার প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর ছিল এই গোয়াইনঘাটে। সীমান্ত বর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল এই গোয়াইনঘাট থেকেই। আজিরউদ্দিন চেয়ারম্যান বাড়ির সদর দপ্তরের ঠিক উল্টো দিকে পাকা সড়কের পাশেই ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ফিল্ড এবং মিডিয়াম আর্টিলারি গানের অবস্থান। সীমান্তবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোতে ফায়ার সাপোর্ট দেবার জন্যই এখানে আর্টিলারির গান জড় করা হয়েছিল। আজির উদ্দিন চেয়ারম্যান বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে পাকিস্তানি বাহিনী একটি হেলিপ্যাডও তৈরি করে নিয়েছিল। জরুরীভিত্তিতে হেলিপ্টারযোগে অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং অতিরিক্ত সেনাদল পাঠানোর জন্যই ঐ হেলিপ্যাডটি তৈরি করা হয়েছিল। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি এবং ১২ একেএফ (আজাদ কাশ্মীর ফোর্স), পাঞ্জাব রেঞ্জার ও টোচি স্কাউট্স ব্যাটালিয়নের মিশ্রিত এক কোম্পানি সৈন্য সার্বক্ষণিকভাবে গোয়াইনঘাটের প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিল। এদের সঙ্গে ছিল এক কোম্পানি সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর সদস্য। তা ছাড়া সীমান্তবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোতে রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠানোর জন্য ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য সার্বক্ষণিকভাবেই প্রস্তুত রাখা হতো।



www.amarboi.org

আর্টিলারির দুটি ব্যাটারির স্থানীয়ভাবে প্রতিরক্ষা কাজে কিছু সৈন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছিল। এই এলাকার সার্বিক প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ২০২ তম ব্রিগেডটি। এই ব্রিগেডের সদর দপ্তর ছিল খাদিমনগরে এবং ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ।

## মুক্তিবাহিনীর অবস্থান

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই ডাউকি, তামাবিল ও মুক্তারপুর এলাকায় ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মুত্তালিব, ইপিআর বাহিনীর সুবেদার মেজর বি আর চৌধুরী, সুবেদার মুজিবুর রহমান, সুবেদার মোশাররফ এবং জাফলং চা বাগানের ম্যানেজার নাজিম কয়েস চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা রেইড ও এ্যামবুশ ধরনের ছোট খাটো অপারেশন পরিচালনা করে যাচ্ছিল। এদের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ডাউকি বিএসএফ-এর মেজর রাও। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ডাউকি এলাকায় ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর ৫/৫ গুর্খা এবং ২৫ আসাম রেজিমেন্ট দুটি এসে অবস্থান নেয়। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে হাদারপার এলাকা থেকে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা, ডেল্টা এবং ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার কোম্পানিকে তামাবিলে নিয়ে আসা হয়। এই ব্যাটালিয়নের ব্র্যাভো এবং চার্লি কোম্পানী দুটিকে ব্যাটালিয়ন টু-আই-সি মেজর মোহসীনের কমান্ডে ছাতক সংলগ্ন বাংলাবাজার এলাকায় রেখে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল ডাউকিতে এসে অবস্থান নেন। এই এলাকাটি ছিল ৫নং সেক্টরের অধীনে। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল ছাতক শহর বরাবর উত্তরে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন বাঁশতলায় । এই সেক্টরটিকে ডাউকি বা মুক্তারপুর, ভোলাগঞ্জ, শেলা বা বাঁশতলা, বালাট-বরচরা এবং টেকেরঘাট নামের এই ৫টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল। গোয়াইনঘাট থানা এলাকাটি ছিল ডাউকি বা মুক্তারপুর সাব-সেক্টরের অধীনস্থ।

## গোয়াইনঘাট অপারেশন

১৩ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পরিচালিত ছাতক অপারেশনের পর ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা, ডেল্টা ও হেডকোয়ার্টার কোম্পানিকে ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর ক্যাম্পে একত্রিত করা হয়। ব্যাটালিয়নের ব্র্যাভো চার্লি কোম্পানিদ্বয় থেকে যায় ৫ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার বাঁশতলা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। ভোলাগঞ্জে অবস্থানকালেই গোয়াইনঘাট অপারেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল এই অপারেশন পরিচালনার



www.amarboi.org

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অপারেশনের ফরওয়ার্ড এসেম্বলি এরিয়া হিসেবে হাদারপারকে নির্বাচিত করা হয়। ঐ এলাকায় লেফটেন্যান্ট ইয়ামীন চৌধুরীর এফএফ কোম্পানিটি অপারেশনে নিয়োজিত ছিল। লেংগুরা গ্রামের দক্ষিণে ব্রিজহেড তৈরির মাধ্যমে নদী অতিক্রম করে শত্রুর নদীর পূর্বপাড়ের অবস্থানসমূহে আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় লেফটেন্যান্ট মঞ্জুরের নেতৃত্বে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা এবং লেফটেন্যান্ট ইয়ামীনের এফএফ কোম্পানিদ্বয়কে।

আগে থেকেই লেংগুরা গ্রামের নিরাপত্তা এবং নদী পারাপারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নৌকা সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয় লেফটেন্যান্ট ইয়ামীনের এফএফ কোম্পানীকে। আক্রমণ চলাকালীন নদীর পশ্চিম তীরে গোয়াইনঘাট এলাকা এবং ঘাটের উত্তরে গোয়াইন গ্রামের পূর্ব প্রান্তে গোয়াইনঘাট-রাধানগর-সড়ক পথটিকে ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে রেখে ডেল্টা কোম্পানিটিকে অবস্থান নিতে বলা হয়। ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক গোয়াইন গ্রামের পশ্চিমে পিরোজপুর গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে আক্রমণকালীন এবং উইথড্রয়ালের সময় প্রয়োজনীয় ৩ ইঞ্চি মর্টারের ফায়ার সাপোর্ট ও রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানান। ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যার পরপরই ৩০০ সদস্যের লেফটেন্যান্ট ইয়ামীনের কোম্পানিটি কয়েকজন গাইড রেখে ডেপুটি কমান্ডারের নেতৃত্বে কাইরাই অবস্থান থেকে মাঠের ধানক্ষেতের আইল ধরে লেংগুরা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। রাত ৯টার দিকে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেল্টা, আলফা এবং হেডকোয়ার্টার কোম্পানির প্রায় ৪০০ সৈনিক হাদারপার-কাইরাই-গোয়াইনঘাট কাঁচা সড়কপথ ধরে এগিয়ে চলে।

রাত ১১ টার দিকেই ডেল্টা কোম্পানির অগ্রবর্তী দলটি গোয়াইনঘাট সংলগ্ন গোয়াইন গ্রাম এলাকায় পৌঁছে যায়। গোয়াইন গ্রাম এলাকায় পৌঁছেই কালভার্ট পাহারারত কয়েকজন রাজাকার ডেল্টা কোম্পানির অগ্রবর্তী দলটির হাতে বন্দি হয়। এদের কাছে থেকে শত্রুর জনবল, অস্ত্রবল এবং অবস্থান সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে এফএফ কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ইয়ামীন চৌধুরীও এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ এলাকায় আগমণের সংবাদটি স্থানীয় রাজাকাররা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীকে গোপনে পৌঁছে দেয়। গোয়াইনবাজার এলাকায় পৌঁছে জানা যায় যে, লেংগুরা গ্রামের এফএফ কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা নদী অতিক্রমের জন্য একটি নৌকাও সংগ্রহ করতে পারেননি। ডেল্টা কোম্পানিকে নদীর পশ্চিম তীর ধরে গোয়াইন গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্লাটুনভিত্তিক প্রতিরক্ষা অবস্থান নেওয়ার



www.amarboi.org

নির্দেশ দিয়ে লেঃ ইয়ামীন আগত গাইডদের সঙ্গে নিয়ে লেংগুরা গ্রামের উদ্দেশ্যে সরেজমিনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চলে যায়। কিন্তু নদী অতিক্রমের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে বিষয়টি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ককে জানানোর জন্য তিনি গোয়াইন গ্রামের সড়ক এলাকায় ফিরে আসেন। এখানে আলফা কোম্পানির সৈনিকেরা রাস্তাকে আড়াল করে অপেক্ষা করছিল। অগত্যা ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক গোয়াইন বাজারের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে হাসপাতাল এলাকার দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত নদীর তীর ধরে লেফটেন্যান্ট ইয়ামীনের এফএফ কোম্পানিটিকেও প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে দিনের বেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করে রাতে নদী অতিক্রম করে অপর পাড়ে শত্রুর অবস্থানে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়।

২৪ অক্টোবর ১৯৭১। তখন ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের মতো হবে। সুরমা নদীর পূর্ব তীরের প্রতিটি পাকিস্তানি অবস্থান থেকে নদীর পশ্চিম তীরে মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অবস্থানের উপর একযোগে ৩ ইঞ্চি মর্টার, মেশিনগান, এলএমজি এবং এমনকি ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। শত্রুর নদীর পূর্বপাড়ের অবস্থানগুলো থেকে নদীর পশ্চিম তীরে মুক্তিবাহিনীর কোনো অবস্থানই ১৫০ থেকে ২৫০ গজের অতিরিক্ত ছিল না। মুক্তিবাহিনী তখনও প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো মজবুত বাঙ্কার খনন করে তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। দুপুর পর্যন্ত একটানা গুলিগোলা বিনিময়ের পর শত্রু গোয়াইন গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত, লেংগুরা গ্রামের দক্ষিণ এবং সালুটিকর থেকে এসে পশ্চিমদিক হয়ে একযোগে ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করে। অদূরে যাতিগাঁ গ্রাম সংলগ্ন মাঠে হেলিকপ্টারের সাহায্যে এক দল কমান্ডো বাহিনকেও পেছন দিক হয়ে আক্রমণ পরিচালনার জন্য নামিয়ে দেয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর হামলা এবং প্রতিহামলা চলে। পুরো গোয়াইনঘাট এলাকা একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ নেয়। শত্রুর ফায়ার পাওয়ার এতই ব্যাপক ছিল যে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কোনো একটি অবস্থানেও টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। কোনো কোনো স্থানে শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁধে যায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি শিকার করে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা হাদারপার এলাকায় পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২৩-২৪ অক্টোবর পরিচালিত গোয়াইনঘাট অপারেশনটি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

## গোয়াইনঘাট অপারেশন (দ্বিতীয় পর্ব)

দীর্ঘ এক মাস স্থায়ী রাধানগর সিজ অপারেশনের পর ২৮ নভেম্বর মেজর শাফায়াত জামিলে ৩ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন পরিচালিত অপারেশনে পাকিস্তানি



www.amarboi.org

বাহিনীর রাধানগর কমপ্লেক্সের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর ছোটখেল অবস্থানটির পতন ঘটে। মিত্রবাহিনীর কোনো ফায়ার সাপোর্ট ছাড়াই তৃতীয় বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন শত্রুর এই শক্ত অবস্থানটি দখল করে নিতে সক্ষম হয়। অথচ মাত্র এক দিন আগে ২৬ নভেম্বর ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি ব্যাপক আর্টিলারির ফায়ার সাপোর্ট নিয়েও এই স্থানটি দখলে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। গুর্খাদের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক। ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল পরবর্তিতে বুলেটবিদ্ধ হন যে ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে।

## গোয়াইনঘাট অপারেশনের নির্দেশ

১ ডিসেম্বর ১৯৭১। এমএফ ও এফএফ কমান্ডার এবং ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইকো, ডেল্টা ও আলফা কোম্পানির সিনিয়র জেসিওগণ পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত অস্ত্রগুলো ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি কোম্পানি এবং এমএফ ও এফএফ কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয়েছিল। এ সকল অস্ত্র পেয়ে মুক্তিবাহিনীর ফায়ার পাওয়ার বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ৩০ নভেম্বর রাতের মধ্যে এমএফ (পুলিশ, আনসার ইত্যাদি আধাসামরিক বাহিনী) ও এফএফ (ছাত্র যুবক ইত্যাদি দেশ প্রেমিক যোদ্ধা) কোম্পানিগুলো শত্রুর গোয়াইনঘাট অবস্থানটিকে ঘিরে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। রাধানগরকে শত্রুমুক্ত করার ফলে মুক্তিবাহিনীর সকল সৈনিকের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল।

## ধলই বিওপি অপারেশন-১ বেঙ্গল, ২৮ অক্টোবর '৭১

মুক্তিযুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ আমাদের বিজয়ের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল। ধলই যুদ্ধ ছিল এমনি একটি স্মরণীয় যুদ্ধ যা বাংলাদেশের সামরিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ২৭-২৮ অক্টোবরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সমন্বিত শক্তি ধলই বিওপি দখলের জন্য যুদ্ধ শুরু করে। ৫ দিনের তুমুল যুদ্ধের পর ধলই বিওপি মুক্তিবাহিনীর হাতে আসে। এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে গিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে।

## ধলই বিওপির অবস্থান

ধলই ছিল বৃহত্তর সিলেট জেলার (মৌলভীবাজার মহকুমা) একটি সীমান্তবর্তী বিওপি। অদূরেই ছিল ৪নং সেক্টরের কমলপুর সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার। এই



www.amarboi.org

বিওপির সামনে দিয়েই বয়ে গেছে পাহাড়ী নালা ধলইখাল। খালের পরই ছিল ভারতীয় ভূখন্ড। ধলই বিওপি'র চারপাশেই ছিল চা বাগান। ছোট ছোট পাহাড়ী টিলা, ঘন বাঁশবন, বেশিকিছু নালা, খানাখন্দ, চা বাগানের শ্রমিকদের কয়েকটি গ্রাম-বসতি নিয়ে ধলই বিওপি ছিল প্রকৃতপক্ষেই প্রতিরক্ষার জন্য আদর্শ। বিওপি থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরেই ছিল ভারতীয় সীমান্ত। ধলই বিওপি থেকে শ্রীমঙ্গল শহরের দূরত্ব প্রায় ২০ মাইলের মতো।

## পাকিস্তানী বাহিনীর অবস্থান

বৃহত্তর সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার কমলগঞ্জ সীমান্তে ধলই বিওপি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সবচেয়ে দূর্ভেদ্য ঘাঁটি। বিওপি'র চারদিকে কাঁটাতার ও মাইনফিল্ড স্থাপন এবং কংক্রিট বাঙ্কার তৈরির মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী এখানে গড়ে তুলেছিল একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান। এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর দুই কোম্পানি নিয়মিত সৈন্য দীর্ঘদিন ধরে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলেছিল। শিলং-জোয়াই-আমবাসা-ধলই-কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল রুটে মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্যই পাকিস্তানি বাহিনী ধলই বিওপি এলাকায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ধলই বিওপি কে কেন্দ্র করে ধলই চা বাগান, চা বাগানের বাংলো, ফ্যাক্টরি, কুলি লাইনসহ এক বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ধলই-শ্রীমঙ্গল এলাকা কভার করার জন্য প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিল। ৩০ ফ্রন্টিয়ারর্স ফোর্স রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি, এক কোম্পানী রাজাকার ও টোচি স্কাউটস্ এর দুই কোম্পানিসহ এই প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের শক্রর জনবল ছিল এক ব্যাটালিয়ন। মুক্তিযুদ্ধের কয়েক মাসে পাকিস্তানিরা ধলই বিওপিকে প্রকৃতপক্ষেই এক মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। ধলই বিওপির নিজস্ব স্থাপনাসহ ধলই চা বাগান, অফিসারদের বাংলো, চা ফ্যাক্টরি, কুলি লাইন আরো দুটি ছোট বিল্ডিং নিয়ে সামগ্রিক ডিফেন্স পজিশন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানকার কংক্রিটের বাঙ্কারগুলো মিডিয়াম কামানের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মত ছিল না। তদুপরি দুর্বল স্থানসমূহে পাকিস্তানিরা মাইন স্থাপন করে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। পাকিস্তানিরা এই প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। তাদের সার্বক্ষণিক এবং নিয়মিত টহলের কারণে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষে ধলই-এর পাকিস্তানিদের শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে পরিস্কার কোনো ধারণা করা সম্ভব ছিল না।



www.amarboi.org

## মুক্তিবাহিনীর অবস্থান

ধলই বিওপি'র অদূরেই ছিল ৪নং সেক্টরের কমলপুরে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার। এপ্রিল-মে মাস থেকেই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এই অঞ্চলে ছোটখাটো এ্যামবুশ ও রেইড ধরণের অপারেশন চালিয়ে আসছিল। ১২ অক্টোবর ভারতীয় সীমান্ত শহর আমবাসা সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় গারো পাহাড়ের তেলঢালা ক্যাম্প থেকে জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এনে একত্রিত করা হয়। এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দীন। জেড ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়াউর রহমানও ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে এই এলাকায় আসেন। সিলেট জেলার কমলগঞ্জের উল্টো দিকে ভারতীয় সীমান্ত এলাকার ভেতরে স্থাপন করা হয়েছিল এই ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর। এখানে আসার পর এই ব্যাটালিয়নে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এমএজি ওসমানীর এডিসি ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী এসে যোগ দেন। এছাড়া ভারতে সদ্য কমিশন প্রাপ্ত আরও দু'জন অফিসার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার ও সেঃলেঃ আনিসও যোগ দেন। এই এলাকায় পৌঁছার ২ দিন পরই ১৪ অক্টোবর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে খাজুরী চা বাগানে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর রেইড অপারেশনে পাঠানো হয়। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে মিত্রবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার এসডিএস যাদবের নেতৃত্বে ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড কমলপুর এলাকায় এসে অবস্থান নেয়। এ সময়ে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাহসী কোম্পানি কমান্ডারগণ ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহবুব আলফা কোম্পানি, ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন ব্র্যাভো কোম্পানি, লেফটেন্যান্ট এম এ কাইয়ুম চৌধুরী চার্লি কোম্পানি এবং বি জে পাটোয়ারী ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন। ধলই বিওপি আক্রমণের পূর্বে মধ্য অক্টোবরে একটি মিটিং বসে। এই মিটিংয়ে উপস্থিত হন মিত্রবাহিনীর ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার যাদব, জেড ফোর্স কমান্ডার লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমান, ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দীন প্রমুখ অফিসার। এই মিটিংয়েই ২৬ অক্টোবরে ধলই বিওপি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ধলই অপারেশনের মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। এই রেজিমেন্টকে সহযোগিতা করবে ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড।

## ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ধলই আক্রমণ

সিদ্ধান্ত হলো ২৬ অক্টোবর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ধলই আক্রমণ করবে। জেড ফোর্স কমান্ডার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর



www.amarboi.org

জিয়াউদ্দীন ২৮ অক্টোবর ভোররাতে ধলই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ২৭ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্নেল এম এ জি ওসমানী ধলই অপারেশনের প্রস্তুতি জানার জন্য ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাম্পে আসেন। তাকে জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমান এবং ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মেজর জিয়াউদ্দীন সার্বিক প্রস্তুতির কথা অবহিত করেন। মেজর জিয়াউদ্দিন জেড ফোর্সের অধিনায়কের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ব্রিফিং নিয়ে ধলই বিওপি দখলের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেণ। যেহেতু ধলই বিওপি ঘন বাঁশবন, চা বাগান প্রভৃতি দ্বারা ঘেরা সেহেতু সকল দিক থেকে ধলইতে আঘাত হানা ছিল কঠিন। সামগ্রিকভাবে অনুসন্ধান ও রেকি করার পর দেখা গেল, যে ফাঁকা স্থানটুকু দিয়ে আক্রমণ করা সম্ভব সেটি জলাশয়, লতাপাতা, গাছগাছড়ায় ঢাকা, এমনকি দিনের আলোতেও এই পথে আক্রমণ চালানো ছিল কঠিন। ধলই বিওপিটি ছিল এর চারপারেশর এলাকা থেকে উঁচু স্থানে। এটি ছিল পাকিস্তানিদের আরেকটি সুবিধা। এই সব দিক বিবেচনা করে মেজর জিয়াউদ্দিন কনভেনশনাল যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা দেখেননি। তিনি ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী এবং লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে চার্লি কোম্পানিকে ধলই বিওপি আক্রমণের দায়িত্ব প্রদান করেন। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে আলফা, ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ব্র্যাভো এবং মেজর বি জে পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানিকে পাত্রখোলা চা বাগান এলাকায কুলি লাইন, টুইনহার্ট আক্রমণ ও ব্লকিং পজিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। বিওপিতে আক্রমণ পরিচালনার পর শ্রীমঙ্গল থেকে যাতে শত্রুর কোনো রি-ইনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে সে জন্য মেজর বিজে পাটোয়ারীর ডেল্টা কোম্পানিকে ধলই-শ্রীমঙ্গল সড়কপথ অবরোধ করে অবস্থান নিতে বলা হয়। ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্র্যাভো কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়া হয় ধলই বিওপি'র পেছনে কুলি লাইনে অবস্থানকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের সঙ্গে অন্যান্য অবস্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। ক্যাপ্টেন মাহবুবের আলফা কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়া হয় ধলই বিওপি আক্রমণকালে টুইন হার্ট ও রেড হার্ট এলাকার পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থানে অনবরত গুলি নিক্ষেপ করে এঙ্গেজ্‌ড করে রাখা। যাতে এরা ধলই বিওপি অবস্থানে প্রতি আক্রমণ চালাতে না পারে। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিহামলা প্রতিহত করার জন্য মিত্রবাহিনীর একটি ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মেজর চৌধুরীর নেতৃত্বে মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিটের ২৫ সদস্যের একটি ডিটাচমেন্ট ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্র্যাভো কোম্পানির অবস্থানে পাঠানোরও সিদ্ধান্ত হয়। ধলই অপারেশনকে কেন্দ্র করে



www.amarboi.org

সীমান্তবর্তী গ্রাম মোহনপুরে ধলই-আমবাসা সড়কের পাশে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এই ক্যাম্পের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ধলই নদী।

২৭ অক্টোবর সন্ধ্যার পরপরই আলফা, ব্র্যাভো এবং ডেল্টা কোম্পানি পাত্রখোলা চা বাগানের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। ২৮ অক্টোবর ভোর ৩টা ৩০ মিনিটের সময় চার্লি কোম্পানি এফইউপি (FUP) অবস্থানে নিরাপদে পৌঁছে যায়। শত্রুর অবস্থান থেকে (FUP) এর অবস্থান ছিল ৬০০ গজ দূরে। শত্রুর ধলই বিওপি'র প্রতিরক্ষা অবস্থানের বাম দিকে একটি প্লাটুন নিয়ে আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব নেন কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী এবং ডান দিকের অবস্থানে আক্রমণকারী প্লাটুনটির নেতৃত্ব দেন সুবেদার আবুল হাশেম। ডেপ্থ প্লাটুনের দায়িত্বে থাকলেন লেফটেন্যান্ট কাইয়ূম চৌধুরী। এসল্ট ফরমেশনে যাওয়ার আগেই প্লাটুন দুটি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শত্রুর নিক্ষিপ্ত গুলি ও গোলার ব্যাপকতা এমনই ছিল যে আক্রমণকারী প্লাটুন দুটির অগ্রযাত্রা থম্‌কে যায়। ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী ফায়ার এ্যান্ড মুভ পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। ফায়ার এ্যান্ড মুভ পদ্ধতিতে এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন নূর তার প্লাটুনটি নিয়ে শত্রুর অবস্থানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান। এ সময় ক্যাপ্টেন নূর এবং প্লাটুন হাবিলদার মকবুল শত্রুর গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এহেন পরিস্থিতিতে প্লাটুনটির অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। ওদিকে সুবেদার আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন প্লাটুনটিও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না। উঁচু টিলার ওপর স্থাপিত শত্রুর একটি এলএমজি'র অনবরত গুলি নিক্ষেপের কারণে এই প্লাটুনটির অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছিল। সুবেদার হাশেম ঐ এলএমজি পোষ্টটি নিষ্ক্রীয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হতাহতের সংখ্যাও তাতে বাড়তে থাকে। বিষয়টি ডেপ্থ প্লাটুনকে জানানো হলে লেফটেন্যান্ট কাইয়ূম এক সেকশনের একটি 'সুইসাইড ডিটাচমেন্ট' পাঠান। এই ডিটাচমেন্টের অসম সাহসী সিপাহী হামিদুর রহমান শত্রুর এলএমজি পোস্টটি নিষ্ক্রীয় করার জন্য এগিয়ে যান। দুটি এলএমজি'র ফায়ার কভারে সিপাহী হামিদুর ক্রলিং করে শত্রুর এলএমজি পোস্টের ১০ গজের মধ্যে পৌঁছেই বাঙ্কার লক্ষ্য করে ৩৬ এইচ.ই. হ্যান্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। শত্রুর এলএমজি'টি গ্রেনেড বার্স্ট করলে উড়ে যায়। এলএমজি সহ পোস্টটি নিরব করেই সিপাহী হামিদুর রহমান বাঙ্কারের ওপর চড়াও হয়ে যান। এ সময় পার্শ্ববর্তী শত্রুর অন্য অবস্থান থেকে গুলির আঘাতে সিপাহী হামিদুরের সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এলএমজি গ্রুপের দু'টি এলএমজি'র ফায়ার কভারে সুবেদার হাশেমের প্লাটুন এমতাবস্থায় ফর্মি আপ পজিশন (FUP) এলাকায় যেতে বাধ্য হয়। ওদিকে ক্যাপ্টেন নূরের



www.amarboi.org

নেতৃত্বাধীন প্লাটুনটিও আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়ে (FUP) এলাকায় গিয়ে অবস্থান নেয়। আহত ক্যাপ্টেন নূর পাকিস্তানি অবস্থানে পুনঃ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এরই মধ্যে অপারেশনটির কো-অর্ডিনেটর ডেপ্‌থ প্লাটুনের দায়িত্বে নিয়োজিত লেফটেন্যান্ট কাইয়ূম জেড ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ওয়াকিটকি সেটের সাহায্যে যোগাযোগ করলে তিনি এ দিন আক্রমণে যেতে নিষেধ করেন। আর এভাবেই ২৮ অক্টোবর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শত্রুর ধলই বিওপি দখলের অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই আক্রমণে নায়েক সুবেদার ইব্রাহিম, হাবিলদার সোবহান, হাবিলদার মকবুল, সিপাহী হামিদুর রহমানসহ ১৫ জন সৈনিক হতাহত হন।

ওদিকে ২৮ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকেই আলফা, ব্র্যাভো ও ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোর ওপর শত্রপক্ষের অনবরত প্রতিহামলা চলতে থাকে। এদিন শত্রুপক্ষ ধলই বিওপিতে শ্রীমঙ্গল থেকে রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বারবার প্রতিআক্রমণ চালাতে গিয়ে শত্রুপক্ষের অনেকেই হতাহত হয়। মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিটের কমান্ডার মেজর চৌধুরী ওপি হিসেবে ঐ দিন দায়িত্ব পালন করেন। মেজর চৌধুরীর দেয়া গ্রিড রেফারেন্স অনুযায়ী মিত্রবাহিনীর নিক্ষিপ্ত গোলা পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এদিন সন্ধ্যার পরপরই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবকয়টি কোম্পানিকেই মোহনপুরের ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আর এর মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যর্থ ধলই বিওপি অপারেশন।

## মিত্রবাহিনীর জাট ব্যাটালিয়নের ধলই আক্রমণ

মিত্রবাহিনী কোনোভাবেই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ধলই আক্রমণের ব্যর্থতা মেনে নিতে পারল না। মিত্রবাহিনীর ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার যাদব জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমানের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করে ঐ এলাকায় অবস্থানরত দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল দালালকে তাঁর ব্যাটালিয়ন নিয়ে ঐদিনই দুপুরের পর ধলই বিওপি আক্রমণের নির্দেশ দেন। কর্ণেল দালাল শত্রুর অবস্থান, জনবল ও অস্ত্রবলের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে এদিন অপারেশনে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কর্নেল দালাল ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি'র অনুমতি নিয়ে ২৯ অক্টোবর রাতে ৫টি প্যাট্রোল পার্টি পাঠিয়ে শত্রুর জনবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে যথাসম্ভব অবহিত হলেন। ধলই বিওপি, টুইন হার্ট, রেডহার্ট এবং কুলি লাইনে শত্রুর অবস্থান নিশ্চিত হয়ে ৩০/৩১ অক্টোবর রাতে তিনি দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়ন নিয়ে শত্রুর অবস্থানগুলোতে দুটি ফেজে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।



www.amarboi.org

প্রথম ফেজের আক্রমণ (মিত্র বাহিনী) এই আক্রমণে, দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের আলফা কোম্পানিকে ধলই বিওপি'র পেছনের রাস্তা অবরোধ করে ৩০ অক্টোবর রাতের মধ্যেই অবস্থান নিতে বলা হয়। ব্র্যাভো এবং চার্লি কোম্পানিদ্বয় কে যথাক্রমে কুলি লাইন ও টুইন হার্ট আক্রমণ ও দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়।

## দ্বিতীয় ফেজের আক্রমণ

ডেল্টা কোম্পানিকে ৩০ অক্টোবর গভীর রাত এবং ৩১ অক্টোবর ভোর ৪টার মধ্যেই কুলি লাইন ও টুইন হার্ট এলাকা দুটি ব্র্যাভো ও চার্লি কোম্পানি দখল করে নিতে সক্ষম হল। টুইন হার্ট দখল করে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার আগেই পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে মিডিয়াম ও ফিল্ড আর্টিলারির ফায়ার কভারে ব্যাপক পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এই প্রতিআক্রমণে চার্লি কোম্পানির অধিনায়ক মেজর জে পি এস সিং সহ বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের ৩৫ জন সৈনিক হতাহত হন। এই কোম্পানিটির কমান্ড এ্যান্ড কন্ট্রোল মারাত্মক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী চার্লি কোম্পানিকে পিছু ধাওয়া করে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত নিয়ে যায়। এই পর্যায়ে ধলই বিওপি আক্রমণের পরিবর্তে ডেল্টা কোম্পানিকে রেড হার্ট এলাকাটি আক্রমণ ও দখল করে নেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার যাদব নিজেই পুরো অপারেশনটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চার্লি কোম্পানি কর্তৃক টুইন হার্ট আক্রমণ এবং দখল করে নেয়ার কারণে ঐ এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা রেড হার্ট এলাকায় এরই মধ্যে এসে সেখানকার সদস্যদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা অবস্থানে যোগ দেয়। ৩১ অক্টোবর ভোরবেলায় ডেল্টা কোম্পানি আদিষ্ট হয়ে 'রেড হার্ট' এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে। রেড হার্ট এলাকায় এরই মধ্যে পাকিস্তান বাহিনী একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তানি বাহিনী দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের ডেল্টা কোম্পানির আক্রমণ প্রতিহত করে। ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক মেজর প্রিতম সিং আহত হন। এছাড়া এই কোম্পানির বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের ২৫ জন নিহত এবং ৪২ জন আহত হন। দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল দালালও এদিন পাকিস্তানি বাহিনীর আর্টিলারির গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হন। ব্র্যাভো কোম্পানির দখলিকৃত কুলি লাইন এলাকায় এই আক্রমণের সময় ব্রিগেডিয়ার যাদব স্বয়ং এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। শত্রুর মর্টারের গোলার স্লিন্টারের আঘাতে তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হন। ৪ রাজপুত রাইফেলস্-এর এক কোম্পানি সৈন্য দ্রুত এসে ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার যাদবসহ নিহত এবং আহত সৈন্যদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিগুলোও এ কাজে নিয়োজিত হয়।



www.amarboi.org

ধলই বিওপি'র ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ আর হলো না। ৩১ অক্টোবর দুপুর থেকেই ব্র্যাভো কোম্পানির কুলি লাইন অবস্থানের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী উপর্যুপরি প্রতিআক্রমণ চালাতে থাকে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে হলেও জাট ব্যাটালিয়ন ঐ অবস্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ব্রিগেডিয়ার যাদবের স্থলে ব্রিগেডিয়ার কে পি পান্ডে এসে ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেডের হাল ধরেন। এই আক্রমণে দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের ১৫০ জন সৈন্য হতাহত হয়। এই রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানিই অপারেশনের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়ে। জাট ব্যাটালিয়নের এই বিপর্যয়ে মিত্রবাহিনীর সকল স্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

## রাজপুত রাইফেলস-এর ধলই বিওপি আক্রমণ

মিত্রবাহিনীর চতুর্থ কোরের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল সগৎ সিং ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেডের নতুন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার পান্ডেকে যে কোনো মূল্যে ধলই আক্রমণ এবং দখলের নির্দেশ পাঠান। কোর কমান্ডার সগৎ সিং ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ফরওয়ার্ড এসেম্বলি এরিয়া মোহনপুর ক্যাম্পে অবস্থান নিয়ে নিজেই এই অপারেশনটি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ব্রিগেডিয়ার পান্ডে দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানিদ্বয়কে ধলই বিওপি আক্রমণের নির্দেশ দেন। আক্রমণের দিন ধার্য হয় ১ নভেম্বর ভোর ৪ টায়। দুটি আর্টিলারি রেজিমেন্টের ৩০ মিনিটব্যাপী ব্যাপক আর্টিলারির গোলা নিক্ষেপের পর পূর্বদিকে হয়ে ৭ রাজপুতানা রাইফেলস্ এর দুই কোম্পানি সৈন্য ধলই বিওপি'র ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। ৭ রাজপুত রাইফেল্স ধলই বিওপি'র একটি অংশ দখলে সক্ষম হয়। সুদৃঢ় বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যরা দিনভর গুলি নিক্ষেপ করে চলেছিল। ২ নভেম্বর ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়কের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী একটি আত্মঘাতী প্রতিহামলা চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ঐ প্রতিহামলায় ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের টু-আই-সি সহ বহুসংখ্যক শত্রু সৈন্য হাতহত হয়। ৩ নভেম্বর সূর্য ওঠার আগেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে ধলই এলাকা ত্যাগ করে। আর এরই মধ্য দিয়ে ৩ নভেম্বর ধলই বিওপি এবং পত্রখোলা চা বাগান এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। ২৮অক্টোবর ধলই বিওপি'র একটি এলএমজি পোস্টের পাশে বুলেটবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকা সিপাহী হামিদুর রহমানের লাশটি ৩ নভেম্বর সকালে উদ্ধার করে মোহনপুরের মুক্তবাংলার মাটিতে নিয়ে দাফন করার ব্যবস্থা করে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথী সৈনিকেরা। সিপাহী হামিদুর রহমানের অসম সাহসিকতার জন্য সুবেদার আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন প্লাটুনের ৩০ জন সৈনিক ঐদিন



www.amarboi.org

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সিপাহী হামিদুর রহমানকে বাংলাদেশে সরকার 'বীর শ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে।

বৃহত্তর সিলেট জেলার ডাউকি-তামাবিল সীমান্তের রাধানগের মতোই ধলই বিওপি ছিল সীমান্তবর্তি পাকিস্তানি বাহিনীর একটি 'স্ট্রংহোল্ড'। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর স্ট্রং পয়েন্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কনসেপ্ট এমনই ছিল যে, রিয়ারের সঙ্গে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও এসব অবস্থান থেকে যাতে মাসের পর মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় তার সকল ব্যবস্থাই রাখা হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দীর্ঘ ৯ মাস সময়ে পাকিস্তানিবাহিনী সীমান্তের প্রতিটি স্ট্রং পয়েন্টের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছিল।

জেড ফোর্সের ১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ধলই আক্রমণের আংশিক সফলতাকে সম্বল করে আক্রমণ পরিচালনা করে মিত্রবাহিনীর দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নকেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। পুরো জাট ব্যাটালিয়নটিই যুদ্ধের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ৭ রাজপুতানা রাইফেলস এবং দ্বিতীয় জাট ব্যাটালিয়নের অবশিষ্ট দুই কোম্পানি সৈন্যের যৌথ অভিযানের প্রাক্কালে পাক বাহিনী ট্যাক্টিকাল রিট্রিট করে। ফলে ৩ নভেম্বর ধলই বিওপি ও তৎসংলগ্ন পাত্রখোলা চা বাগান এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। যদিও এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধলই অপারেশনের অভিজ্ঞতা দারুন কাজে লেগেছিল।

**জুড়ি-লাতু রেললাইন ধ্বংস ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (৭/৮ নভেম্বর '৭১)**

জুড়ি ও লাতু মৌলভিবাজার মহকুমার বড়লেখা থানার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অবস্থানগত দিক থেকে লাতু বড়লেখা থানার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। লাতুর উত্তরে সিলেট জেলা অবস্থিত। এখানে একটি রেলস্টেশন রয়েছে। অপরদিকে বড়লেখা থানার দক্ষিণ-পশ্চিমে জুড়ি অবস্থিত। জুড়ি বড়লেখা ও কুলাউড়া থানার সীমান্ত এলাকা। জুড়ি ও লাতুর মধ্যে সড়ক ও রেলযোগাযোগ রয়েছে। রেলপথটি লাতু ও জুড়িকে বড়লেখা থানার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই রেলপথ ব্যবহার করে পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ করত। সে কারণে এই রেলপথ ধ্বংস মুক্তিবাহিনী জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

'জেড ফোর্স' জুড়ি-লাতু রেললাইনের ব্রিজটি ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কারণ ব্রিজটি ধ্বংস করতে পারলে জুড়ি ও লাতুর মধ্যকার রেল-যোগাযোগ

-১১



www.amarboi.org

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেকটা অসুবিধার মধ্যে পড়বে। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ৪নং সেক্টর ট্রুপস যৌথভাবে ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৭ নভেম্বর রাতে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২ প্লাটুন সৈন্য এবং সেক্টর ট্রুপস ব্রিজটি ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্রিজটি ১ মাইলেরও কম দূরত্বের মধ্যে তারা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়। শত্রুবাহিনী তাদেরকে প্রতিরোধ করে। ফলে ব্রিজটি তারা ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়। পরে মুক্তিবাহিনী দক্ষিণগুল চা বাগান আক্রমণ করে। কারণ চা বাগানে তখন পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। দক্ষিণগুল চা বাগানে তখন ১ প্লাটুন নিয়মিত পাকিস্তানি সৈন্য এবং ২ প্লাটুন রাজাকার অবস্থান করছিল। মুক্তিবাহিনী চা বাগানটির ফ্যাক্টরি ঘিরে ফেলে। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি বিনিময় হয়। ৩ ঘন্টাব্যাপী গোলাগুলি চলতে থাকে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ব্যাপক আর্টিলারি ব্যবহার করে। এ যুদ্ধে আনুমানিক ১৩/১৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয় এবং আর্টিলারির গোলায় অনেক আহত হয়। মুক্তিবাহিনী ১৫ জন রাজাকারকে ধরে ফেলে। আর্টিলারির গোলার আঘাতে চা বাগানের ফ্যাক্টরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চা বাগানটি তখন শত্রুদের বালুচ রেজিমেন্টের দখলে ছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কাছে তাদের বিপর্যয় ঘটে। মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই চা বাগানটি তাদের দখলে নিয়ে আসে।

## দিলখুশা রেইড ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (৭/৮ নভেম্বর '৭১)

দিলখুশা মৌলভীবাজার মহকুমার বড়লেখা থানার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী এখানে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। এখান থেকে শত্রুবাহিনী সীমান্ত এলাকাগুলোতে আক্রমণ করত। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কারণে দিলখুশা থেকে শত্রুবাহিনী বিতাড়িত করা এবং এর নিয়ন্ত্রণ নেয়া মুক্তিবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি ৪নং সেক্টরের অধীনে ছিল। সেক্টর ট্রুপস এবং 'জেড ফোর্স' যৌথভাবে দিলখুশা আক্রমণ করে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়া ১ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ৪নং সেক্টরে এসে সেক্টরটির দায়িত্ব তাঁর কমন্ডের আওতায় আনেই। ফলে



www.amarboi.org

মুক্তিবাহিনীর শক্তি, ওজন ও কৌশলিপরিচালনা বল সমহারে বৃদ্ধি পায়। ৭ নভেম্বর রাতে মেজর আমিনুল হকের নেতৃত্ব ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২ প্লাটুন ট্রুপ্স যৌথভাবে দিলখুশা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। ফলে দ'্ পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি হয়। এতে শত্রুবাহিনী ৮১ মিলিমিটার মর্টার এবং এলএমজি হতে গুলিবর্ষণ করে। অপরদিকে মুক্তিবাহিনী ৩ ইঞ্চি মর্টার, এইচএমজি, এলএমজি এবং রাইফেল থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ করে। যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর আহত/নিহতদের স্বপক্ষে অপসারণ বান্ধব ইক্যুপমেন্ট থাকায় তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক সংখ্যা নিরুপন করা যায়নি।

## সোনারুপা চা বাগান আক্রমণ ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (৮ নভেম্বর '৭১)

সোনারূপা চা বাগান মৌলভীবাজার মহকুমার বড়লেখা থানায় অবস্থিত। সোনারূপা চা বাগানের উত্তর-পূর্বে বড়লেখা থানা এবং পশ্চিমে কুলাউড়া থানা অবস্থিত। এ চা বাগানের পাশ দিয়ে সড়কপথ ও রেলপথ চলে গেছে। রেলপথটি মৌলভীবাজার মহকুমার সর্ব উত্তর-পূর্বে বর্ণী থেকে শুরু করে বড়লেখা থানা হয়ে সোনারূপা চা বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল থানা হয়ে হবিগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অপরদিকে সড়কপথটি বড়লেখা, কুলাউড়া, রাজনগর থানাকে মৌলভীবাজার মহকুমার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। চা বাগানটির সঙ্গে সড়ক ও রেলপথে আশপাশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী এখানে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এখান থেকে তারা আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করত এবং সড়ক ও রেলপথে কুলাউড়া, বড়লেখা প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। সোনারূপা চা বাগানের পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করা এবং চা বাগানের দখল নেয়া মুক্তিবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাজেই মুক্তিবাহিনী চা বাগানের পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি ৪ নং সেক্টরের আওতাভুক্ত ছিল। অভিযান কালে জিয়া ৪নং সেক্টরের ট্রুপস ও 'জেড ফোর্স' তাঁর কমান্ডে নিয়ে যৌথভাবে এ আক্রমণ করে।



www.amarboi.org

সিলেট অভিযান শুরুর প্রাক্কালেই বলা হয়েছে যে, অক্টোবরের প্রথমার্ধ থেকে ৪নং এবং ৫নং সেক্টরের করুণ অবস্থার ঘন ঘন আর্তবার্তা পেয়ে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্ণেল এম এ জি ওসমানী জরুরী বার্তা পাঠিয়ে অক্টোবরের ৫ তারিখে জেড ফোর্স ব্রিগেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়ার হেড কোয়ার্টার তেলঢালায় এসে হাজির হন। অবস্থার বিপজ্জনক পরিস্থিতি এ'থেকেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। জিয়া ১ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাথে নিয়ে সিলেট ডাওকি সড়কের দক্ষিণ-পূর্ব অক্ষে ৫নং সেক্টরের সরাসরি দক্ষিণে ৫নং সেক্টরের নিম্নভাগে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ৪নং সেক্টর অবস্থিত ৪নং সেক্টরের উত্তর পূর্ব জুড়ে সুদীর্ঘ ভারতীয় ভুখন্ড। এখানকার চা বাগান সমূহের শক্ত পাক ডিফেন্স স্ট্রংহোল্ড গুলোর আক্রমণে সাহায্যার্থে রওয়ানা হয়ে যান। জিয়াউর রহমান বর্ডারের অপর পার্শ্বে অস্থায়ী কৌশলগতভাবে এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কম ঝুঁকিপূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য কয়েকটি স্পটে ব্যাট্ল এবং মেডিক্যাল সাপ্লাই সহ হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে ১ ও ৮ বেঙ্গলের যুদ্ধ কমান্ড করছিলেন। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর আমিনুল হকের নেতৃত্বে দুই ফ্রন্টে সমান্তরালে চা বাগানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দিতে থাকেন। কেননা ঐ অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনী শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। পরিকল্পনা ছিল চা বাগানগুলো শত্রুমুক্ত করে সিলেটের দিকে অগ্রসর হবে।

৭ নভেম্বর রাতে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ণ কমান্ডার আমিনুল হক ২ প্লাটুন সেনা এবং ৪ নং সেক্টর থেকে ২ কোম্পানী এফএফ নিয়ে যৌথভাবে সোনারূপা চা বাগান আক্রমণ করে। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় এবং প্রচুর গুলি বিনিময় হয়। উক্ত সংঘর্ষ ২ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। এতে শত্রু পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অবশেষে পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং সোনারূপা চা বাগান মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

## আটগ্রাম ঘেরাও অভিযান (৯ নভেম্বর '৭১)

আটগ্রাম সিলেট জেলার জকিগঞ্জ ৭ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। সিলেট জেলা সদর থেকে সোজা পশ্চিমে এবং জকিগঞ্জ থানা সদর থেকে উত্তরে ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি এর অবস্থান। এর দক্ষিণ পাশ দিয়ে চলে গেছে জকিগঞ্জ-সিলেট সড়ক এবং উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহমান সুরমা নদী। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকা ৪নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।



www.amarboi.org
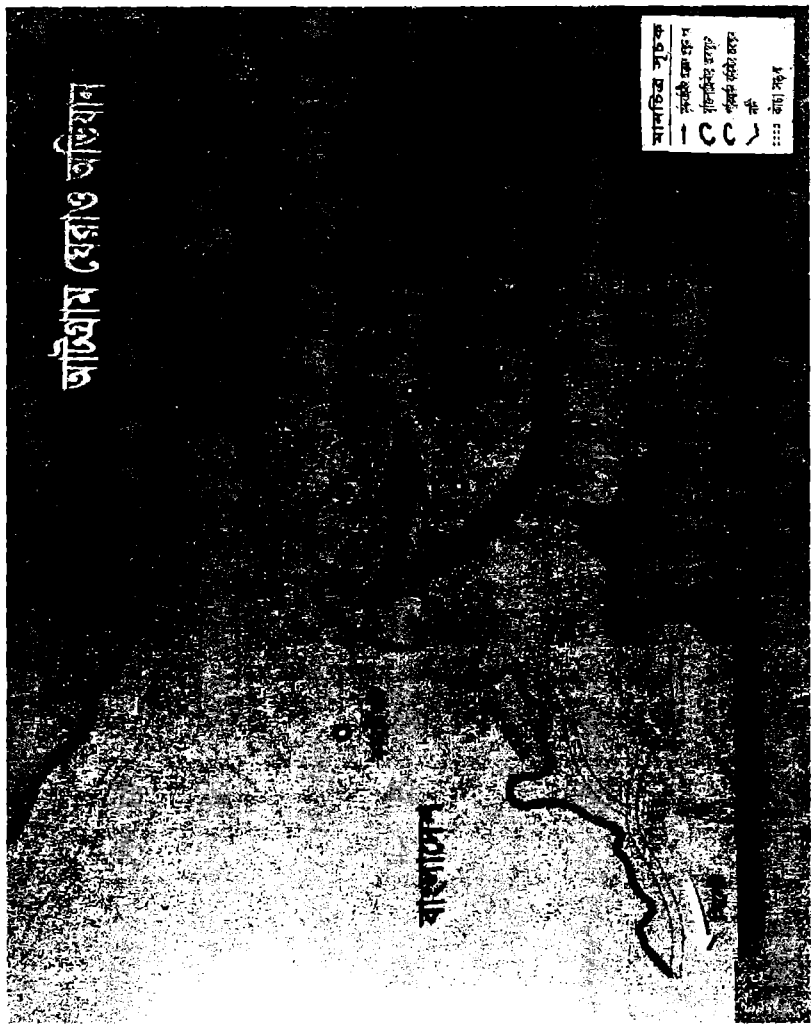
ভৌগলিক অবস্থান ও কৌশলগত দিক দিয়ে আটগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকে আটগ্রাম বিওপি অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান হিসেবেও পরিচিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনী উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ এই আটগ্রাম নিজ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া ছিল। এর ফলে আটগ্রাম অনেকবার উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। কিন্তু অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ কৌশলে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম দিকে ছিল বড়ই দুর্বল। তারা পাকিস্তানি বাহিনীর



www.amarboi.org

বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে গেলেও স্থায়ীভাবে আটগ্রামের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সুপ্রশিক্ষিত পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের এ দুর্বলতার সুযোগে আটগ্রাম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে।

আটগ্রাম ঘাঁটিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী তাদের যাতায়াত ও চলাচল ব্যবস্থা সুগম করার জন্য ১৯৭১ সালের এপ্রিলে আটগ্রাম থেকে দক্ষিণে জকিগঞ্জ পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করে। ফলে সীমান্তবর্তী আটগ্রাম-সিলেট-আটগ্রাম সড়ক ছাড়াও জকিগঞ্জ সড়কের মাধ্যমে সিলেটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এসব পথে যাতায়াতে বাধা দেয়া, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, শত্রুর সীমা সঙ্কোচন প্রভৃতির জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অনেক অপারেশন করে। কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি শিকার হওয়ার পরও পাকিস্তানি বাহিনী এই এলাকায় তাদের যাতায়াত অব্যাহত রাখে এবং ঘাঁটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। পরে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ৩১ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি, খাওয়ার স্কাউট্সের এক কোম্পানি এবং এক কোম্পানি রাজাকার মোতায়েন করে আটগ্রামকে একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলে। সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনারা অত্যন্ত কৌশলে বিভিন্ন অপারেশন ও অভিযান চালাতে থাকে। সে সময় এক অন্ধকার রাতে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক আটগ্রাম ও জকিগঞ্জ থেকে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় রেললাইনের ওপর মাইন পুঁতে রাখে ফলে দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে সাধারণ যাত্রীরা হতাহত হয়। যুদ্ধে এহেন মোড় নেওয়ায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার চিন্তিত হয়। এদিকে আটগ্রামে পাকিস্তানিদের উপস্থিতির কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত আক্রমণ ও অভিযান চালনায় ক্রমাগতভাবে বিঘ্ন ঘটছিল। এমতাবস্থায় জেড নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে জেড ফোর্সের ৪নং সেক্টরে উপস্থিতি মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান ও আক্রমণে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

জিয়া ৪ নং সেক্টর কমান্ডারকে অনতিবিলম্বে আটগ্রামে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। তিনি ক্যাপ্টেন এনামকে দুই কোম্পানী এফ.এফ. নিয়ে আটগ্রামে অভিযান চালানোর আদেশ দেন। কিন্তু বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন এনামকে কমলপুর যুদ্ধে পাঠানো হলে আটগ্রাম অভিযানে ৪ নং সেক্টরের লেফটেন্যান্ট জহির ও লেফটেন্যান্ট গিয়াস দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এদের নেতৃত্বে ৪টি কোম্পানি অভিযানে অংশগ্রহণ করে।



www.amarboi.org

আক্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট জহিরের নেতৃত্বাধীন দুটি কোম্পানি সুরমা নদী অতিক্রম করে দর্পণ নগর গ্রামে সিলেট থেকে আটগ্রামে শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাহত করা এবং আটগ্রাম থেকে শত্রুসেনাদের সিলেট পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এর ফলে জকিগঞ্জ-আটগ্রাম সড়ক শত্রুমুক্ত রাখা এবং আটগ্রামের দক্ষিণে অবস্থান নিয়ে শত্রুকে অবরুদ্ধ করা সহজতর করা সম্ভব হয়। রাইফেল, সাব-মেশিনগান, ভারি মেশিনগান ও অন্যান্য ভারি অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধারা যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ৯ নভেম্বর সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই লেফটেন্যান্ট জহিরের দল লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। সুরমা নদী পার হতে পর্যাপ্ত সংখ্যক নৌকার অভাব দেখা দেয়। এতে একটু বিঘ্ন হলেও সাধারণ জনগণের সহযোগিতায় তারা সে বাধা অতিক্রম করে নিজ নিজ অবস্থানে পৌঁছে যায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী জহিরের কোম্পানি পাকিস্তানি বাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটি পাশে রেখে এবং মূল ঘাঁটির সামনে রাস্তার দু'পাশের অবস্থান নিয়ে ফাইনাল আঘাত হানার জন্য ওঁত পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। লেফটেন্যান্ট গিয়াস এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাসহ শত্রু অধিকৃত আটগ্রাম-জকিগঞ্জ সড়ক মুক্ত রাখার জন্য অগ্রসর হন।

ক্যাপ্টেন রব এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আটগ্রামের পার্শ্ববর্তী গোটাগ্রামে পৌঁছে। এখানে রাজাকারের একটি ক্যাম্প ছিল। ক্যাপ্টেন রব এই ক্যাম্পে হানা দেন। রাজাকাররা তখন ছিল শান্তিপূর্ণ ঘুমের মধ্যে। অতর্কিত হামলায় রাজাকাররা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং আত্মসমর্পণ করে। ১২ জন রাজাকারকে বন্দি করে ক্যাপ্টেন রব সেখানেই অবস্থান নেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের রাস্তার দুপাশে দ্রুত বাঙ্কার খুঁড়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই ক্যাম্পের ১জন পলাতক রাজাকার কৌশলে আটগ্রাম পৌঁছে সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানী সেনাদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য আক্রমণের খবর দেয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাভিযানের খবর পেয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগেই ১০ নভেম্বর ভোর সাড়ে ৬টায় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের গোটাগ্রামের অবস্থানের ওপর আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল বেশ সাহসের সঙ্গে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর প্রকৃত অবস্থান ও সংখ্যা সম্পর্কে পাকিস্তানিদের জানা ছিল না। তারা মুক্তিবাহিনীকে গালিগালাজ করতে করতে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে অগ্রসর



www.amarboi.org

হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন রব তাঁর বাহিনীকে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পাকিস্তানি সেনারা রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে আসামাত্র ক্যাপ্টেন রব গুলিবর্ষণের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ শুরু হয়। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে পাকিস্তানী সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাকস্তানী আরেকটি দল আটগ্রাম-জকিগঞ্জ সড়ক ধরে গোটাগ্রামের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এটা টের পেয়ে মুক্তিবাহিনী আটগ্রাম-জকিগঞ্জ সড়কের দু'পাশ থেকে ৪টি এলএমজি এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তানিদের ওপর আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই ১৮ জন পাকিস্তানি নিহত হয়। অন্যরা রাস্তার পাশের একটা নালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে জকিগঞ্জ থেকে অগ্রসরমান পাকিস্তানি বাহিনীর একটি ট্রাককে মাইনের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হয়। আরও দু'একটি ছোটখাটো শত্রু আক্রমণ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিহত করা হয়।

এরপর পাকিস্তানি বাহিনী সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকে পুনরায় আর্টিলারির সহায়তায় সন্ধ্যার দিকে আক্রমণ করে। এ সময় পাকিস্তানি বাহিনী বিপুলসংখ্যক অসামরিক বাঙালিদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে তাদের পেছনে পেছনে এগিয়ে আসতে থাকে। শত্রুরা মুক্তিবাহিনীর কাছাকাছি হওয়ামাত্রই মুক্তিবাহিনীর সব অস্ত্র একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

দু'দিনের সংঘর্ষে পাকিস্তানি বাহিনীর ৪০ জনেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়। ১২ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ২ জন শহীদ ও ৫ আহত হন। এরপর প্রায় ১১ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর, ২০/১১ নভেম্বর 'জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ৪ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধদের যৌথ আক্রমণে আটগ্রাম শত্রুমুক্ত হয়।

প্রায় ১০/১১ দিন ধরে সংঘর্ষ ও আটগ্রাম শত্রুমুক্ত হওয়ার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুক্তিকামীদের সাহস, আগ্রহ ও উদ্দীপনা বেড়ে যায়।

**চারগ্রাম অপারেশন** (২১ নভেম্বর '৭১)

চারগ্রাম সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম। জকিগঞ্জ থানা সদর থেকে উত্তর দিকে এর অবস্থান। চারগ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সুরমা নদী, তারপর ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্ত এলাকা। আবার জকিগঞ্জ-সিলেট সড়কটিও এই চারগ্রামকে স্পর্শ করে গেছে। ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সীমান্ত পকেট প্রভৃতি কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় চারগ্রাম এলাকাটি সামরিক গুরুত্ব লাভ করে।



www.amarboi.org

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিক থেকেই এই অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি বাহিনী নিজ নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে শক্তিশালী আধুনিক সাজে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর মারণাস্ত্রের সামনে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে তুলনামূলক সফলতা অর্জন করলেও অস্ত্র, সংগঠন ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তা তারা স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে সমর্থ হন নাই। সেসময় মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সীমান্ত এবং মুক্ত এলাকাগুলোতে অবস্থান গ্রহণ করে। তারপর শত্রুর মোকাবিলায় নতুন করে সংগঠিত হয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে। অন্যদিকে এপ্রিলের শেষ থেকে মে-জুন  মাস পর্যন্ত সারাদেশে



www.amarboi.org

পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন ঘটাতে থাকে এবং হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথাগত ও গেরিলা অভিযানের মাধ্যমে বিরামহীন আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। ধাপে ধাপে আক্রমণ চলার পর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের গতি ও প্রকৃতি আরও সংগঠিত হয় এবং শত্রুর ওপর চাপ বেড়ে যায়। যদিও প্রথম থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের সহযোগীতা পায়, তবে নভেম্বর মাসে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় যুদ্ধে অংশিদার হতে থাকে।

অক্টোবর থেকে অর্থাৎ ১০ অক্টোবর তেলঢালা ছেড়ে এখানে এসে পৌছেই জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমান সিলেট এলাকায় অসংখ্য অপারেশনে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। অন্যদিকে নভেম্বর মাসের শেষ থেকেই শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করার লক্ষে কাজ শুরু করে।

সে সময় ২১ নভেম্বর জেড ফোর্সের সাথে যুক্ত হয়ে ৪/৫২ গুর্খা ব্যাটালিয়ন এবং জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গভীর রাতে সুরমা নদী অতিক্রম করে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি আটগ্রামের ওপর আক্রমণ চালায় এবং আটগ্রাম দখল করতে সক্ষম হয়। তবে এই যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়। এতে ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজর ও ৬ জন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সহ বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আটগ্রাম ও চারগ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী দুটি ঘাঁটি।

আটগ্রাম দখলের পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে চারগ্রাম দখল করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ঐ একই দিনে অর্থাৎ ২১ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ওয়াট জেড ফোর্স কমান্ডার কর্নেল জিয়াকে চারগ্রামে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাতে অনুরোধ করেন। সংগত কারণ যে, আটগ্রাম যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের সম্মুখীন হয়ে তারা চারগ্রাম অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে কিছুটা হতাশাবোধ করছিল। যা হোক জিয়াউর রহমান এহেন পরিস্থিতির পটভূমিতে ব্রিগেডিয়ার ওয়াটের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেণ। তিনি তাঁর আটগ্রাম হেডকোয়ার্টারে এক কনফারেন্স ডাকেন। তিনি ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্র্যাভো কোম্পানিকে চারগ্রাম পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। সে সময় আটগ্রামের কাছেই চারগ্রাম ইন্সপেকশন বাংলো এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী



www.amarboi.org

এক প্লাটুন অতিরিক্ত নিয়মিত সৈন্য অবস্থান করছিল। শত্রু এলাকার তিনদিকে ৩০০-৫০০ গজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমতল এলাকা, ধান ক্ষেত, ফলে ফিল্ড অফ ফায়ার অত্যন্ত পরিস্কার।

এছাড়াও একপাশে সুরমা নদী অপর পার্শ্বে অনেকটা দূরে কুশিয়ারা নদী প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার ফলে শত্রু যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ২১ নভেম্বর বিকেলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্র্যাভো কোম্পানি ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে চারগ্রাম আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় বাহিনীর উপর আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়ার নির্দেশ দওয়া হয়। ভারতীয় বাহিনী যথবিহিত পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের ওপর আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এই সুযোগে ব্র্যাভো কোম্পানি FUP (Forming up post) (একত্রিত হওয়ার কেন্দ্র) যাওয়ার চেষ্টা চালায়। অপরদিকে শত্রু সৈন্যরা অনড় হয়ে বাঙ্কারে বসে থাকে এবং মেশিনগান ও রাইফেল দিয়ে অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে। FUP এফইউপি যাওয়ার আগে দুজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এমতাবস্থায় দিনের আলোতে FUP যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়। যাতেকরে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা যেন অহেতুক বৃদ্ধি না পায়। তাই মুক্তিযোদ্ধারা রাতের বেলায় FUP যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়। FUP এ মুভ করার প্রস্তুতি লগ্নে কোম্পানি কমান্ডার ভোর ৪টায় তার কোম্পানিকে শেষবাবের মত ব্রিফ করেন।

মুক্তিযোদ্ধারা শেষ রাতে অত্যন্ত কৌশলে FUP এ পৌঁছে যায়। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা 'নারায়ে তাকবীর' বলে ভারতীয় আর্টিলারির সাহায্য ছাড়াই তীব্র বেগে শত্রুর অবস্থানের ওপরে গুলি করতে করতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর অবস্থানের এরিয়ায় ঢুকতে থাকে। ১০০ গজ দূরে থাকতেই শত্রুর এলএমজি ও রাইফেল সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মুক্তিবাহিনী শত্রুর  ঘাঁটিতে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি প্যারা মিলিটারির প্রায় ২০ জনকে আহত অবস্থায় বন্দি করে। বাকিরা পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ৫ জন আহত হয়। শত্রুর ঘাঁটি দখল করেই কাউন্টার এ্যাটাকের জন্য মুক্তিবাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী তখন পলায়নরত। চারগ্রাম দখল হওয়ার পর 'জেড ফোর্স' কমান্ডার কর্নেল জিয়া ও মিত্রবাহিনীর ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল গনজালভেস চারগ্রামে আসেন। মিত্রবাহিনীর জেনারেল এই যুদ্ধের জন্যে 'জেড ফোর্স' এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।



www.amarboi.org

## মৌলভীবাজারের সীমান্ত এলাকায় কামানযুদ্ধ ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (২৫/২৬ নভেম্বর '৭১)

২৫/২৬ নভেম্বর '৭১ রাতে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি শক্তিসম্পন্ন ১টি দল পাকিস্তানিদের মৌলভীবাজার সীমান্তের অবস্থানে রেইড করে। ২৫/২৬ নভেম্বরের সেই রাতেই ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ১টি প্লাটুন পাকিস্তানিদের ১টি রোড ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়। ২ ঘন্টা ধরে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির বিনিময় হতে থাকে। পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর ৩ জন সৈন্য মৃত্যুবরণ করে, আরো ৫ জন সৈন্য গুরুতর আহত হয়। এদের সহযোগী দুই রাজাকারও নিহত হয়। অপরদিকে মুক্তিবাহিনী ছিল অক্ষত। ২৫/২৬ নভেম্বরের সেই রাতেই ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরেকটি প্লাটুন বড়লেখা থানা রেইড করে। এতে পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর ১জন সৈনিক মৃত্যুবরণ করে। থানার ওসি গুরুতর আহত হয়। ২৬ নভেম্বরে মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের রওশন আরা আর্টিলারি/মর্টার ব্যাটারি থেকে পাকিস্ত ানিদের প্লাটুন পজিশন এবং কোম্পানি হেডকোয়ার্টার পজিশনগুলোতে গোলাবর্ষণ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর গোলায় পাকিস্তানিদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ব্যাপক। পাকিস্তানিরাও ২৬ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর মকুমটিলা বিওপি এবং এর চারপাশে ১টি ফিল্ডগান থেকে ৪০ রাউন্ড গোলা নিক্ষেপ করে। যদিও এতে মুক্তিবাহিনীর তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

## চূড়ান্ত অভিযানে 'জেড ফোর্স' (২১ নভেম্বর- ১৭ ডিসেম্বর '৭১)

সিলেট অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর দুর্বল তৎপরতার মুখে পাকিস্তানি বাহিনী এই এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ক্রমেই বারিয়ে তুলছিল। ফলে জনগণের মধ্যে হতাশার জন্ম হয়। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট বিমানবন্দর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নেয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল বিধায় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী 'জেড ফোর্স' কে সিলেট অঞ্চলে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ছাড়াও বঙ্গবীর কর্ণেল ওসমানীর সিলেটের ব্যাপারে নস্টালজিয়া ত ছিলই। ৫ অক্টোবর '৭১ এ কর্ণেল ওসমানী নিজে 'জেড ফোর্স' এর সদর দপ্তর তেলঢালায় এসে তার সিদ্ধান্তের কথা জানান। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'জেড ফোস' ৬ অক্টোবর হতে ১০ তারিখ অবধি ক্রমান্বয়ে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হতে থাকে। এই ফোর্স সিলেট অঞ্চলে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে, ১ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৪ নং সেক্টরে কর্ণেল জিয়াউর রহমান এর কমান্ডে এবং ৩ বেঙ্গল অধিনায়ক মেজর শাফায়েত জামিল ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ৫নং সেক্টরাধীন শ্রীমঙ্গল ও শমসের নগরের চা বাগান এলাকায়



www.amarboi.org

পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের উপরে আঘাত হানার নির্দেশ দেন। ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মিত্রবাহিনীর ইকো সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে।

উল্লেখ্য যে, 'জেড ফোর্স'-এর আগমনে সিলেট অঞ্চলের যুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ৪ ও ৫ নং সেক্টর এলাকায় 'জেড ফোর্স' বিভিন্ন যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ অঞ্চলে 'জেড ফোর্সের' বড় যুদ্ধগুলোর মধ্যে- চারগ্রাম যুদ্ধ, আটগ্রাম যুদ্ধ, কানাইঘাট যুদ্ধ, ধলই যুদ্ধ, এমসি কলেজ যুদ্ধ ছাতক যুদ্ধ, গোয়াইনঘাট যুদ্ধ, লামাকাজি ঘাট যুদ্ধ, ছোটখেল যুদ্ধ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চূড়ান্ত যুদ্ধে 'জেড ফোর্সের' ৩টি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন অক্ষে সিলেট শহর দখলে অগ্রসর হয়।

## সিলেট বিজয়ে 'জেড ফোর্স'

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে সিলেটের অবস্থান। সিলেটের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এলাকা বন, পাহাড়, উঁচু টিলায় ঘেরা। পশ্চিমে মেঘনা নদীর অবস্থান সিলেটকে দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। সিলেট এলাকাটি মুলত নিম্নভূমি। এর যত্রতত্র জলাশয়, পুকুর,হ্রদ, খাল, বিল, হাওড় বাওড় দেখা যায়। সিলেটের ভুপৃষ্ঠ এলাকা আবার উচুঁ-নিচু পাহাড়, টিলায় সমৃদ্ধ। এই পাহাড়গুলোর উচ্চতা



www.amarboi.org

গড়ে ১০০ থেকে ২০০ ফুট। ছাতক, জকিগঞ্জ, চরখাই, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুলাউড়া, শমশেরনগর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো সড়ক, রেল, নৌপথে সিলেটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সিলেটের সর্বত্রই চা বাগান পরিলক্ষিত হয়। সুরমা-কুশিয়ারা নদী দুটো সিলেটকে বেষ্টন করে আছে। যে কোনো প্রতিরোধকারী বাহিনীর কাছে সিলেটের ভূ-প্রকৃতি স্বর্গতুল্য।

সিলেটে পাকিস্তানি বাহিনীর ১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ২০২ ও ৩১৩ দুটি পদাতিক ব্রিগেড প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল মিলিশিয়া, প্যারা-মিলিশিয়া এবং রাজাকার বাহিনী নিয়ে গঠিত আরেকটি এ্যাডহক ব্রিগেড। ২০২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড সিলেট অঞ্চলে, ৩১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড মৌলভীবাজার অঞ্চলে নিয়োজিত ছিল।

## 'জেড ফোর্স' এবং যৌথবাহিনীর দায়িত্ব ও অভিযান

পাকিস্তানি সামরিক শক্তি মূলত সিলেটের পূর্ব ও উত্তর এলাকা থেকে আগত পথগুলোর ওপরই সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা রেখেছিল। পাকিস্তানিদের কাছে অচিন্ত নীয় দক্ষিণ এলাকা থেকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে ভড়কে দেয়া কিংবা সাফাল্য অর্জন করা সহজতর ছিল। মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হলে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মিত্রবাহিনী মৌলভীবাজার দখলের পাশাপাশি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটের মধ্যবর্তীতে ১৪ ডিভিশনকে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারত। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিংবা মিত্রাবাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল সিলেট অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত পাকিস্তানি ৩১৩ ও ২০২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড দুটিকে আক্রমণের মাধ্যমে পরাস্ত করা ও সেই সঙ্গে এরা যাতে পশ্চাদপসরণ করে ভৈরবের ১৪ ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ডিভিশনের শক্তি বাড়াতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা।

পরিকল্পনা গৃহীত হয় সম্ভাব্য সহজসাধ্য সবগুলো রুট ধরে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মিত্রবাহিনী উত্তর এবং পূর্বদিক থেকে একযোগে সিলেট আক্রমণ করবে। পূর্বদিকে ব্রিগেডিয়ার আর সি ভি আপ্তের নেতৃত্বাধীন ব্রিগেড ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে শমশের নগর-মৌলভীবাজার-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হয়। ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড ব্রিগেডিয়ার সি এ কুইনের নেতৃত্বে কুলাউড়া-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হবে। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে করিমগঞ্জ-চরখাই-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হতে বলা হয়। উত্তরে ইকো সেক্টরে ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকে এবং ৪ নং সেক্টরে অধিনায়ক মেজর সি আর দত্তকে জৈন্তাপুর-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হতে বলা হয়। ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট



www.amarboi.org

এবং তার সঙ্গে ৫ নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীকে গোয়াইনঘাট, ছাতক শত্রুমুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। নভেম্বরের শেষদিকে এসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যৌথবাহিনীর চূড়ান্ত অভিযানের সহায়তায় মুক্তিবাহিনী সীমান্ত এলাকাগুলোতে আক্রমণ জোরদার করে যতটা সম্ভব সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা শত্রুমুক্ত করবে।

## 'জেড ফোর্সের' ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযানের ধারা শমশেরনগর-শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট অক্ষ:

৩০ নভেম্বরে (১৯৭১) জেড ফোর্সের ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে কৈলাশহর-শমশেরনগর অক্ষ ধরে অগ্রসর হতে শুরু করে। ৮১ মাহার ব্রিগেডের ১০ মাহার রেজিমেনট চা বাগানের ভেতর দিয়ে অভিযান চালায়। এদিন দুপুরের মধ্যেই তারা পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত ঘাঁটি চাতলাপুর দখল করতে সক্ষম হয়। ৩ পাঞ্চাব রেজিমেন্ট ১ ডিসেম্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ৪ কুমাউন রেজিমেন্ট (১ কোম্পানি কম) ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দুটি অতিরিক্ত কোম্পানিকে সঙ্গে নিয়ে শমশেরনগরে আক্রমণ চালায়। শমশেরনগরের ২ কি.মি. পূর্বে পাকিস্তানিরা তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এখানে তদের সঙ্গে সারা রাত ধরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যৌথবাহিনী এয়ার ফোর্সের সাহায্য নেয়। শেষ পর্যন্ত ২ ডিসেম্বরের শেষ রাতে শমসেরনগর যৌথবাহিনীর হাতে আসে। শমসেরনগরের পতনের পর পাকিস্তানি বাহিনী আগোছালোভাবে পশ্চাদপসরণ করে তাদের শক্তিশালী ডিফেন্স মৌলভীবাজার পৌঁছে যায়।

৫ ডিসেম্বরে ৩ পাঞ্চাব রেজিমেন্ট মুন্সিবাজার হস্তগত করে। বাম প্রান্তে মেজর এ জে এম আমিনুল হকের নেতৃত্বে জেড ফোর্সের ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ফেরেটগাড়ি শহরের একটি স্কোয়াড্রন সন্তোষজনক অগ্রগতি আনয়ন করে।

### আলীনগর চা বাগান আক্রমণ (১ ডিসেম্বর '৭১)

মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানায় আলীনগর চা বাগান অবস্থিত। মৌলভীবাজার শহর থেকে দক্ষিণে এর অবস্থান। আলীনগর চা বাগানের পশ্চিমে কমলগঞ্জ, উত্তরে রাজনগর এবং উত্তরপূর্বে কুলাউড়া থানা অবস্থিত। এটি সড়ক ও রেলপথে কমলগঞ্জ থানার সঙ্গে সংযুক্ত। রেলপথটি বড়লেখা, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল থানাকে আলীনগর চা বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।



www.amarboi.org

মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এখান থেকে তারা আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় নির্যাতন চালাত। আক্রমণ করত মুক্তিবাহিনীর ওপর। এখান থেকে তারা রেলপথে বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ করত। অবস্থানগত কারণে চা বাগানটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৮ বেঙ্গল আলীনগর চা বাগানের ঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টর এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা আলীগন চা বাগানে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। তারাও পাল্টা আক্রমণ করে। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে এবং চা বাগানটি মুক্তিযোদ্ধা দের দখলে আসে। এই বাহিনীটি ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে ভানুগাছা এলাকা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়িত করে। অতঃপর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শ্রীমঙ্গলের দিকে অগ্রসর হয়।

**শ্রীমঙ্গল পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ** (৮ ডিসেম্বর '৭১)

শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা। এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন এখানে বেড়াতে আসে। মৌলভীবাজার মহকুমা শহর থেকে দক্ষিণে এর অবস্থান। শ্রীমঙ্গল থানার পূর্বে কমলগঞ্জ থানা এবং পশ্চিমে হবিগঞ্জ মহকুমা অবস্থিত। সড়কপথে শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার মহকুমা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি বাহিনী শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে স্থানটি ছিল গুরুত্বপুর্ণ। সে কারণে শ্রীমঙ্গল থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়িত করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এখান থেকে তারা বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করতো। ৮ ডিসেম্বর 'জেড ফোর্স'-এর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শ্রীমঙ্গল পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। এতে শত্রুবাহিনী পিছু হটে এবং সিলেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে এবং সুরমা নদীর তীরে গিয়ে মুক্তিবাহিনী শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যুহ গড়ে তোলে। ৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই তারা ভানুগাছা এলাকা থেকেও পাকিস্তানিদেরকে বিতাড়িত করেছিল। এভাবে শ্রীমঙ্গল এলাকা থেকেও পাকিস্তানিদেরকে বিতাড়িত করে যখন মেজর আমিনুল হকের এই বাহিনীটি ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছে, সেই মুহুর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটি ওয়্যারলেস মেসেজ এই বাহিনীর ওয়্যারলেস সেটে ধরা পড়ে। এই মেসেজ পাকিস্তানি ১৪ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল



www.amarboi.org

মাজিদ খান তাঁর অধীনস্থ ব্রিগেড কমান্ডারকে আশুগঞ্জের দিকে সরে এসে ২৭ পাকিস্তানি ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হতে আদেশ করেন। কেননা আশুগঞ্জ ডিফেন্ড কারার মত প্রয়োজনীয় শক্তি সেখানে ছিল ন।

### বড়টিলা যুদ্ধ (৮ ডিসেম্বর '৭১)

মৌলভীবাজার মহকুমা সদর থেকে কিছু দূরে বড়টিলা অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় মৌলভীবাজারে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার। মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী মৌলভীবাজার দখলের উদ্দেশ্যে ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টার দিকে শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে কালেঙ্গায় অবস্থান নেয়। এখানে বড়টিলা নামক স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে মিত্রবাহিনীর ২৭ জন সেনা নিহত হয়। ৫ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা চলতে থাকে। এই হামলায় পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে হামলা প্রতিরোধ করতে তারা ব্যর্থ হয়।

ইতোমধ্যে 'জেড ফোর্স'র ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৮১ ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হয়ে এর ১০ মাহার রেজিমেন্টের সহযোগিতায় মৌলভীবাজার দখলে আনার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮/৯ ডিসেম্বরের রাতে ব্রিগেড আর্টিলারি সাপোর্ট নিয়ে মৌলভীবাজারের ওপর আক্রমণ শুরু করে। এভাবে এক ব্রিগেড শক্তির জোরালো আক্রমণ, সেই সঙ্গে আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট ও এয়ার রেইডের সমন্বিত আক্রমণে মৌলভীবাজারের পাকিস্তানিরা সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়ে যায়। পাকিস্তানিদের গোলাবারুদে আগুন ধরে গেলে তাদের দুরবস্থা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মিত্রবাহিনী মৌলভীবাজার দখল করে নিতে সক্ষম হয়। মৌলভীবাজার থেকে বেঁচে যাওয়া পাকিস্তানিদের ৩১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের অবশিষ্টাংশ সিলেটের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। কেননা ইতোমধ্যেই মুক্তিবাহিনী মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কপথের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ফেলে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়র দিকে পশ্চাদপসরণ না করে সিলেটে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। মৌলভীবাজার থেকে পলায়নের সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ পাকিস্তানিদের এলোপাতাথাড়ি গুলিতে বহু মানুষ নিহত ও জখম হন। সিলেট যাওয়ার পথে তারা শেরপুরে অবস্থান নেয়। পরে তারা এ অবস্থান নিরাপদ নয় মনে করে সিলেট চলে যায়।



www.amarboi.org

পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে এ সময়ের যুদ্ধে একদিকে ছিল মিত্রবাহিনী এবং অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী। মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মেজর দায়ান এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মির্জা আজিজ আহমেদ বেগ। তারা দেওয়ানবাগ চা বাগান দিয়ে মৌলভীবাজারে প্রবেশ করেন।

এদিকে জেড ফোর্স ব্রিগেড কমান্ডার লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমানর ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে মুক্তিবাহিনী তার দলের নেতৃত্ব দেন।

মৌলভীবাজারে পাকিস্তানিদের পতনের পর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রেলপথ ধরে ফেঞ্চুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড শেরপুর-সাদীপুরের ফেরি সাইট এবং দাউদপুর এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। ১০ ডিসেম্বরে জেড ফোর্সের সহায়তায় ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড সাদীপুর ও শেরপুর ঘাট দুটির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১১ ডিসেম্বরে যৌথবাহিনীর ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। ১৩ ডিসেম্বরে এই বাহিনী সিলেটের ৩ মাইল দক্ষিণে দাউদপুরে পৌঁছে যায় এবং সেই রাতেই দাউদপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন গার্ড ব্যাটালিয়নের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়। ১৩ ডিসেম্বরে ডিভিশনের অধিনায়ক ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেডের অধিনায়ককে তাঁর ব্রিগেডসহ আগরতলা দিকে সরে আসার আদেশ দেন। ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণে রেখে ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেডের অধিনায়ক আগরতলার দিকে চলে যান। ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট তখন শেরপুর-সাদীপুর ফেরি সাইট ও দাউদপুর এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর ১৩ ডিসেম্বর সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে সিলেট রেলস্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

## মিত্রবাহিনীর ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডের অগ্রাভিযান

সীমান্ত থেকে পাকিস্তানি মুক্ত করার পর ব্রিগেডটি ধর্মনগর-কুলাউড়া-ফেঞ্চুগঞ্জ অক্ষ ধরে অগ্রসর হতে থাকে এবং এই ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন ধর্মনগর কপনা পাহাড়-কুলাউড়া অক্ষ ধরে অগ্রসর হয়। গাজীপুর চা বাগান এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এই এলাকাটি ছিল সীমান্ত থেকে ১০ কি.মি. পশ্চিমে। গাজীপুর চা বাগান এলাকায় যৌথবাহিনীর দুটি আক্রমণ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসহ পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক প্রতিহত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৫ ডিসেম্বর '৭১-এ ৫৬ গুর্খা ব্যাটালিয়ন গাজীপুর দখল করে। ৫ ডিসেম্বরেই মিত্রবাহিনীর গার্ড ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক পাকিস্তানিদের



www.amarboi.org

কপনা পাহাড়ের ডিফেন্সে আঘাত হানেই এবং বিশেষ কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই তা দখল করেন। কপনা পাহাড় এবং গাজীপুর দখলে আসার পর যৌথবাহিনীর এই বিগ্রেডটি কুলাউড়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। এখানে এসে তারা আবিস্কার করে যে, পাকিস্তানিরা তাদের ডিফেন্স ইতোমধ্যেই উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ফলে ৬ ডিসেম্বরের দুপুরের মধ্যেই কুলাউড়ায় যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। গাজীপুরে পাকিস্তানিদের ২২ বালুচের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। গাজীপুরে তুমুল যুদ্ধের সময় ২২ বালুচ রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার-এর কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, সেই সঙ্গে ব্রিগেড সদর দপ্তরের সঙ্গেও এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কুলাউড়াতে ২২ বালুচ রেজিমেন্টের এই বিক্ষিপ্ততার কারণে ফেঞ্চুগঞ্জ অক্ষও উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

কুলাউড়া পর্যন্ত শত্রুমুক্ত হওয়ার পর যৌথবাহিনীর ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক ধরে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। পথিমধ্যে ৫৯ ব্রিগেড পাকিস্তানিদের কয়েকটি ছোটখাটো প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জে পাকিস্তানি ডিফেন্সের মুখোমুখি অবস্থানে পৌঁছে যায়। এই ব্রিগেডের সঙ্গে অভিযান চালায় ৬ রাজপুত রেজিমেন্ট। ৪ রাজপুত অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে অপারেশন চালায় এবং ৬ ডিসেম্বর কোনো রকম বাধার সম্মুখীন না হয়েই ব্রাহ্মণবাজার দখল করে। ব্রাহ্মণবাজার আয়ত্তে এলে ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডকে কৈলাশ শহর কব্জা করতে বলা হয়। এই পর্যায়ে এসে যৌথবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, পাকিস্তানি বাহিনী সিলেট-মৌলভীবাজার থেকে পশ্চাদপসরণ করে রি-ইনফোর্সমেন্টের জন্য আশুগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সিলেট দখলের জন্য যৌথবাহিনী পূর্ব পরিকল্পনামাফিক পাকিস্তানিদের পশ্চাদপসরণের আগেই ৮ ডিসেম্বর সিলেটের সন্নিকটে মিয়াপাড়ায় হেলিকপ্টারযোগে সেনা অবতরণ করায়। এই অভিযানের জন্য ৪/৫ গুর্খা ব্যাটালিয়নকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানিরা মিয়াপাড়ার অবস্থানটি ছেড়ে দেয়। ইতোমধ্যে মুক্তিবাহিনীর 'জেড ফোর্স'র ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সিলেটের সন্নিকটে পৌঁছে গিয়েছে। পরে এই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতেই সিলেট পাকিস্তানি শক্তির পতন ঘটে। উল্লেখ্য, হেলিকপ্টারযোগে অবতরণ করা ৪/৫ গুর্খা সেনাদের জন্য দুটি কামানও সরবরাহ করা হয়েছিল। এতে তাদের শক্তি বেড়ে যায়। এই ছাত্রীসেনাদের সঙ্গে মূল বাহিনীর অন্যান্য অভিযানকারী সৈন্যদের সংযোগ স্থাপন করাটা ছিল অত্যন্ত জরুরী। অথচ যৌথবাহিনী সেটি ত্বরিতগতিতে করতে ব্যর্থ হয়। ৩/৪ দিন ধরে হেলিবোর্ন ফোর্স অত্যন্ত ভীতিজনক অবস্থায় মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যায়।



www.amarboi.org

এদের সঙ্গে লিংক আপের জন্য কুলাউড়া-ফেঞ্চুগঞ্জ অক্ষ ছিল সহজতর এবং নিকটতম। অতঃপর ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডকে (এটি তখন কৈলাশশহরে সমবেত হয়েছিল) ফেঞ্চুগঞ্জ অভিমুখে রওনা হতে এবং ছত্রীসেনাদের সঙ্গে সংযোগ স্থপন করতে বলা হয়। এদিকে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফেঞ্চুগঞ্জের দিকে এগিয়ে আসছিল। ১০ ডিসেম্বর ৬ রাজপুত রেজিমেন্টও রেলপথ ধরে ফেঞ্চুগঞ্জের দিকে এগিয়ে আসছিল। ১০ ডিসেম্বর ৬ রাজপুত রেজিমেন্ট ফেঞ্চুগঞ্জ শহরের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে পৌছে দেখে যে, পাকিস্তানিরা ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে ইতোমধ্যে সরে পড়েছে আর কুশিয়ারা নদীর উপরের ব্রিজটিও তারা অক্ষত অবস্থায়ই রেখে গেছে। এভাবে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জে যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩ ডিসেম্বর ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড ঝড়োগতিতে অগ্রসর হয়ে মংলা বাজার দখল করে নেয়। এখানে পাকিস্তানিদের ১ কোম্পানি সৈন্য ডিফেন্সে নিয়োজিত ছিল। ইতোমধ্যে মুক্তিবাহিনীর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে একটি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে সিলেটের দিকে রেলপথে লজিষ্টিক সাপোর্ট বহন করাও সম্ভব হয়। ১৩ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড সিলেট শহর ৩/৪ মাইলের মধ্যে পৌছে যায়। উক্ত স্থানটিতে পাকিস্ত ানিদের ১ কোম্পানি সৈন্য ডিপ্লয়মেন্টে ছিল। পরদিন ভোরে জায়গাটি মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রাবাহিনীর ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডের বাম প্রান্তের অন্যতম ব্যাটালিয়ন হিসেবে অপারেশনে অংশ নিয়েছিল। ১৫ ডিসেম্বরে সিলেট রেলস্টেশন যৌথবাহিনীর হাতে এসে যায় এবং সিলেট শহরটি তখন যৌথবাহিনীর এক ব্রিগেডেরও অধিক সৈন্য দ্বারা পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

## জেড ফোর্স ও ইকো সেক্টরের অভিযানের ধারা জৈন্তাপুর-সিলেট সীমান্ত

উত্তরে ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকের নেতৃত্বে ৫/৫ গুর্খা রাইফেলস, ৮৬ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ব্যাটালিয়ন এবং ৫নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর ট্রুপস নিয়ে গঠিত ইকো সেক্টর বাহিনী ডাউকি থেকে জৈন্তাপুর-দরবশত-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হয়। ইকো সেক্টর ব্রিগেডটির মূল আক্রমণের ধারা পরিচালিত হয় জৈন্তাপুর-সিলেট অক্ষ বরাবর। জৈন্তাপুরে পাকিস্তানিদের খুব জোরালো কোনো ডিফেন্স



www.amarboi.org

ছিল না। ব্রিগেডের অগ্রবর্তী কলামের হাতে জৈন্তাপুরের পতন ঘটার পর প্রতিরোধকারী পাকিস্তানী সৈন্যরা সারি নদীর দিকে পশ্চাদপসরণ করে।

৭ ডিসেম্বর ব্রিগেডের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর সারি নদীর ঘাট এলাকা থেকে প্রচন্ড রকম ফায়ারিং শুরু হলে যৌথবাহিনীর অগ্রগতি থেমে যায়। ফলে ৫ গুর্খা ব্যাটালিয়ন এবং মুক্তিবাহিনী পূর্বদিক থেকে বাহু প্রসারিত করে পাকিস্তানি সেনাদেরকে আক্রমণ করে। পাকিস্তানিরা সারিঘাটে টিকতে না পেরে ব্রিজটি বিধ্বস্ত করে দিয়ে নদীর ঘাট এলাকা থেকে সরে যায়। মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় যৌথবাহিনীর আর্টিলারির সরঞ্জামগুলো নদীর অপর পাড়ে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়। সারি নদীর দক্ষিণ তীর থেকে পাকিস্তানিদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে এই বাহিনীর অগ্রগতি থেমে যায়। পাকিস্তানিরা যৌথবাহিনীর গতিকে মন্থর করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সারি নদীর উপরস্থ ব্রিজ ভেঙ্গে দিয়েছিল। ১০ ডিসেম্বর ইকো সেক্টর বাহিনী এক প্রচন্ড আক্রমণ পরিচালনা করে। তুমুল যুদ্ধের পর ১১ ডিসেম্বরের ভোরে হেমো এলাকা থেকে পাকিস্তানিদেরকে বিতাড়িত করে দিয়ে স্থানটি যৌথবাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। পথিমধ্যে পাকিস্তানিদের আরো কিছু প্রতিরোধমূলক পকেট বিধ্বস্ত করে দিয়ে ১৫ ডিসেম্বর সিলেট হতে প্রায় ৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত খাদিমনগরে পৌঁছে যায়। পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের পরবর্তী ডিফেন্স খাদিমনগরে সরে এসে এখানকার ডিফেন্সকে মজবুত করে তুলে ছিল। এই ঘাঁটি দখল করার জন্য মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী দুই দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। খাদিমনগরে কাছাকাছি ঈদগাহ থেকে পাকিস্তানি বাহিনী যৌথবাহিনীকে 'পিন ডাউন' করে ফেলে। যৌথবাহিনী কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছিল না। এমতাবস্থায় ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যার অন্ধকারে ইপিআরের হাবিলদার গোলাম রুসুল কিছু গ্রেনেড সহকারে একা ক্রলিং করে পাকিস্তানি ডিফেন্সের কাছাকাছি এসে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। এই গ্রেনেড আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু হাবিলদার গোলাম রসুল আর ফিরতে পারেননি। পাকিস্তানি বাহিনীর সে সময়ের পর্যুদস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী একযোগে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ চালায়।

৫ গুর্খা ব্যাটালিয়ন বিএসএফের একটি কোম্পানিকে সঙ্গে নিয়ে ১৫/১৬ ডিসেম্বরের রাতে খাদিমনগরের পাকিস্তানিদের ডিফেন্সে জোড়ালো আঘাতটি



www.amarboi.org

হানে। পাকিস্তানিরা সিলেটের নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করে খাদিমনগর থেকে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করে সিলেটের দিকে চলে আসে। ৫ গুর্খা রাইফেলস ও মুক্তিবাহিনী খাদিমনগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

## জেড ফোর্সের (৩ বেঙ্গল ) অভিযানের ধারা

চূড়ান্ত অভিযানে জেড ফোর্স দুই দিক দিয়ে সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়।

ক) জাফলং-ছোটখেল-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ-সালুটিকর-সিলেট
খ) ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ-লামাকাজিঘাট-সিলেট।

ক) জাফলং-ছোটখেল-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ-সালুটিকর-সিলেট

এই অক্ষে ৩ বেঙ্গল চূড়ান্ত অভিযানে অগ্রসর হয়। সীমান্তবর্তী জাফলং-ছোটখেল বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই বাহিনীর জয়যাত্রা শুরু হয়। চূড়ান্ত অভিযানে ছোটখেল বিজয় (২৯-৩০ নভেম্বর) ছিল মুক্তিবাহিনীর ৩ বেঙ্গল (জেড ফোর্সের) এক অসাধারণ বিজয়। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ২৭/২৮ নভেম্বর মিত্রবাহিনীর ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট ছোটখেল দখল করে পাক বাহিনীকে পর্যুদস্থ করে ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট করে। ২৯ নভেম্বরের রাতে মুক্তিবাহিনীর দেড় শতাধিক সৈনিক পাকিস্তানিদের ডিফেন্সে ফের আঘাত হানে। আচম্‌কা তীব্র আক্রমণে অপ্রস্তুত পাকিস্তানিরা তাদের বহু সৈন্য হারায় । বেশকিছু সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। ছোটখেল করায়ত্ত হওয়ার পর ৩ বেঙ্গল ডাউকি সাব-সেক্টর বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে রাধানগর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়।

## গোয়াইনঘাট যুদ্ধ (৪ ডিসেম্বর '৭১)

বৃহত্তর সিলেট ও দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আশুগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সিলেট-তামাবিল সড়কটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। ভারত সীমান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে জাফলং-সিলেটের মধ্যবর্তী স্থানে গোয়াইন নদীর তীরবর্তী গোয়াইনঘাট ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই কোম্পানীগঞ্জ থেকে পাকিস্তানিরা সরে এসেছিল। সেখান থেকে তারা গোয়াইনঘাটে এসে এর ডিফেন্সকে মজবুত করে তুলেছিল। গোয়াইনঘাট থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে সিলেট বিমানবন্দরের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই গোয়াইনঘাট, নন্দীরগাঁ, কোম্পানীগঞ্জ এবং সালুটিকর ফেরিঘাট



www.amarboi.org

পাকিস্তানি বাহিনী নিজ আয়ত্তে রাখে। মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্স অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ৮৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নকে সঙ্গে নিয়ে গোয়াইনঘাটের ওপর আঘাত হানে। গোয়াইনঘাট আক্রমণে ৫নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর তরুণ অফিসার লেফটেন্যান্ট এস এম খালেদের নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য গোয়াইনঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। জেড ফোর্সের ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি সরাসরি গোয়াইনঘাট আক্রমণ করে। লেফটেন্যান্ট খালেদের কোম্পানি 'কাট অফ' পার্টি হিসেবে পজিশন গ্রহণ করে।

## খাইরাই আক্রমণ ডিসেম্বর '৭১

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার একটি স্থান খাইরাই। সিলেট শহরের উত্তরে এটি অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি ৫নং সেক্টরের ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীনে ছিল। মেজর এসএম খালেদ ও তাহেরউদ্দিন আকুঞ্জি ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে আসেন যথাক্রমে অক্টোবরের ১৫ ও ৩১ তারিখ। তখন ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন। বাউন্ডারি রাখা হয়েছিল গৌরীনগর রোডকে। এর পূর্বদিক ছিল মেজর এস এম খালেদের দায়িত্বে। আর গৌরীনগর রোডের পূর্বদিকেই হচ্ছে খাইরাই। খাইরাই-এ পাকিস্তানি বাহিনী শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যুহ ছিল। মুক্তিবাহিনীর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্য সেই মুহূর্তে আক্রমণ না করে তারা আরও সুসংগঠিত হয়ে আক্রমণটি পরিচালনা করে। তখন পূর্বদিকে ডিসকিবাড়ীতে একটি প্লাটুন ছিল, মেজর এস এম খালেদ সেখানে তাদের সাথে মিলিত হয়ে প্লাটুনটিকে আরো পূর্বে ভেদেরগাঁওয়ে নিয়ে গেল। ওখানে বসে ছোট ছোট অপারেশন করত যেমন রাজাকারদের আক্রমণ করা ও পাকিস্তানি সেনাসদস্যদের যাতায়াত পথে এ্যামবুশ করা। স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্যে তাদের অপারেশন ছিল সীমাবদ্ধ। চূড়ান্ত অভিযানের সময় ৩ বেঙ্গল এর চার্লি কোম্পানি ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর ট্রুপসের সঙ্গে এসে মিলিত হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর স্ট্রেংথ বেড়ে যায়।

খাইরাই স্কুলে পাকিস্তানি বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ছিল। মুক্তিবাহিনী ৫ ডিসেম্বর নোয়াপাড়ায় সর্বপ্রথম শত্রু ডিফেন্স মোকাবেলা করে। সেখানে পাকিস্তানিরা এলএমজি ফায়ার করে। তারপর যখন মেজর এস এম খালেদ ডিলেইন পাজিশনের ওপর ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে চার্জ করেন, ততক্ষণে পাকিস্তানি



www.amarboi.org

সেনাবাহিনী চলে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা চার্জ করে ওঠে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল যে পাকিস্তান আর্মি ডিফেন্স ছেড়ে চলে গেছে।

মুক্তিবাহিনী সেখানেই রি-অরগানাইজ হয়ে এগুতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত দুই বাহিনী খাইরাই পৌঁছে গেল। পাকিস্তানিদের হেডকোয়ার্টারের ২৫ গজ দূরের একটা এলাকায় পৌঁছে বাঙ্কার খনন শুরু করে সামনের দিকে যখন রেকি করতে শুরু করল তখন পাকিস্তানি সেনারা সন্ধ্যায় আবছা আঁধারে মুক্তিবাহিনীদের ওপর মর্টার আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল বলে তখনি প্রতিআক্রমণ না করে খাইরাই-এর পেছনে এসে রাত সাড়ে ৪টা (৬ তারিখ)। মেজর এস এম খালেদের নেতৃত্বে সেক্টর ট্রুপস এবং জেড ফোর্সের ৩ বেঙ্গল এর একটি কোম্পানি যৌথভাবে খাইরাই-এর ওপর ফায়ার শুরু করে। এটা ঠিক আক্রমণ নয়, এটা হচ্ছে পলায়নপর সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার চিরাচরিত কৌশল।

পাকিস্তানি সেনারা তখন সালুটিকর থেকে আর্টিলারি সাপোর্ট পেতে শুরু করে। প্রায় ৫টার দিকে পাকিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত আর্টিলারি শেল মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে খাইরাই এর চর্তুপার্শ্বে এসে পড়তে থাকে। এই শেলের কভারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। পরে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটা লাশ সেখানে দেখতে পায়। ভোর ৬টায় খাইরাইর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের ডিফেন্স তুলে নেয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ৮ জন শহীদ হন। দুজন সিভিলিয়ানও শহাদাত বরণ করেণ। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ডিফেন্স থেকে প্রায় ৬ হাজার এম্যুনিশন, ৬টা রাইফেল, ফিল্ড টেলিফোন এবং প্রচুর পরিমাণ মেশিনগানের গুলি ও কিছু মর্টারের রাউন্ড হস্তগত করে।

### চালিতাবাড়ী দখলাভিযান (৯ ডিসেম্বর '৭১)

জেড ফোর্সের একটি অংশ ৯ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ-সিলেট সীমান্তের চালিতাবাড়ী দখল করে নেয়। এই দলটি সালুটিকর বিমানবন্দরের প্রায় ২ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু পাকিস্তানিদের স্থাপিত বাধা বিঘ্নের কারণে তারা আর সম্মুখে অগ্রসর হতে না পেরে ছাতকে ফিরে গিয়ে ব্যাটালিয়নের ব্র্যাভো ও চার্লি কোম্পানি দুটি সঙ্গে একত্রিত হয়। অতঃপর তারা আবারো সিলেটমুখী অভিযান শুরু করে।



www.amarboi.org

## সালুটিকর এয়ার স্ট্রীপ (৬-১৭ ডিসেম্বর '৭১)

সিলেট শহরের মধ্যস্থল আন্দরকিল্লা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৭/৮ কিলোমিটার দূরে সালুটিকর এয়ারস্ট্রিপ অবস্থিত। সুরমা নদীর উভয় পাড় ঘেঁষে রয়েছে সালুটিকর ফেরিঘাট এলাকা। ফেরিঘাট সংলগ্ন নয়টিলার দক্ষিণ দিক ঘেঁষেই সালুটিকর ঘাঁটি এলাকা।

সালুটিকর বিমানঘাঁটি ছিল দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বেসামরিক বিমানবন্দর। সামরিক অবস্থাণের কারণে সালুটিকর ফেরিঘাট ও সালুটিকর বিমান বন্দর ঘাঁটি এলাকা Figure 1টি আক্রমণ করা প্রয়োজন ছিল। প্রথমে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড আক্রমণকারী দলগুলোকে চাইতবাড়ী, জলুরপাড় এবং বেতুরকুল এলাকায় সমবেত করার সিদ্ধান্ত নেয় । সেখান থেকে তারা সালুটিকর ফেরিঘাট, কচুয়ারপাড়, দারিকান্দি এবং চৌধুরীকান্দি এলাকাগুলো দখল করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এর পর তারা সুরমা নদী অতিক্রম করে নয়টিরা এলাকায় বিশেষ বিশেষ টিলা দখল করে। একই সঙ্গে নদীর উত্তর পাড়ের অবস্থানগুলোর শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শহর প্রতিহামলা প্রতিহত করার সর্বাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
এরপর তারা সুরমা নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ পাড়ের অবস্থানগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রদবদল এনে শত্রুর যে কোনো প্রতিহামলা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ।

সালুটিকর ফেরিঘাট এবং বিমানঘাঁটি এলাকার অপারেশনাল রিয়ার হেডকোয়ার্টার ছিল গোয়াইনঘাটে। আর সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর রিয়ার এবং লিয়জোঁ হেডকোর্টার ছিল রাধানগরে। বিএসএফ ও ঐ অবস্থানে থাকবে। গোয়াইনঘাঁটের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকবে ২৫ আসাম রেজিমেন্ট ও ২টি এসএফ কোম্পানি। এই দুটি এফএফ কোম্পানির একটি মুজাহিদ ক্যাপ্টেন দাউদের নেতৃত্বে সারিঘাট ও দরবশত এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেবে। হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বাধীন এফএফ কোম্পানিটি অবস্থান নেবে গোয়াইনঘাট-সারিঘাট সড়ক পথের মাঝামাঝি। সুবেদার মোশাররফের নেতৃত্বাধীন ৩০০ সদস্যের এফএফ কোম্পানি তামাবিল-সিলেট সড়কপথ অবরোধ করে বাঘের সড়ক এবং হরিপুর বাজার ও ব্রিজ এলাকায় গিয়ে



www.amarboi.org

প্রতিরক্ষা অবস্থান নেবে। এই কোম্পানিটি চা বাগান ও পাহাড়ী গোপন পথ ধরে চিকনাগুলে অবস্থানরত পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর ওপর যথাযথ রেইড ও এ্যামবুশ ধরণের অপারেশন পরিচালনা করবে। গোয়াইনঘাটের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারের নিরাপত্তার জন্যই এই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে সুবেদার মোশাররফকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট ইয়ামীন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর অন্য একটি কোম্পানি লেংগুরা গ্রামকে রিয়ার হেডকোয়ার্টার করে লক্ষীনগর ও সেউরারকান্দি এলাকা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। নদী অতিক্রম করে পূর্ব-দক্ষিণ পাড়ের কয়েকটি স্থানেও মজবুত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার পাশাপাশি নদীর অপর পাড়ে নিয়মিত প্যাট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করবে। মুক্তিবাহিনীর অন্য একটি কোম্পানি চাইতবাড়ী, জলুরপাড় এবং বেতুরকুল অবস্থানে থেকে নদীর অপর পাড়ের কয়েকটি স্থানে এক সেকশন সমকক্ষ শক্তির কয়েকটি প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলবে। এসব অবস্থানের একটির সঙ্গে অন্যটির যোগাযোগ স্থাপন করবে পর্যাপ্ত প্যাট্রোলিংয়ের মাধ্যমে। ৩ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা, ডেল্টা, ইকো ও হেডকোয়ার্টার কোম্পানি এবং লেফটেন্যান্ট মতিউরের এফএফ কোম্পানি মূল আক্রমণকারী দল হিসেবে ৫ ডিসেম্বর রাতেই লেফটেন্যান্ট রউফের অবস্থানে পৌঁছে যাবে। সেখানে পৌঁছে তাঁরা বিভিন্ন কোম্পানির অবস্থানগুলো সচক্ষে দেখে সন্ধ্যার মধ্যে অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে ঐসব স্থানে গাইড করে পৌঁছানোর জন্য গোয়াইঘাটে ফিরে আসবে। পরদিন ৬ ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট রউফের মুক্তিযোদ্ধারা এসব কোম্পানিকে নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আলফা কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার কোম্পানি অবস্থান নেবে জলুরপাড় গ্রামে। ডেল্টা কোম্পানি অবস্থান নেবে চাইতবাড়ী গ্রামে এবং ইকো কোম্পানি অবস্থান নেবে বেতুরকুল গ্রামে। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানি অবস্থান নেবে সেউরারকান্দি গ্রামে এবং অন্যটি কোম্পানির একটি বড় অংশ পাঠানো হবে লক্ষীপুর গ্রামে অবস্থান নেবার জন্য। নদী অতিক্রম করে পূর্ব-দক্ষিণ পাড়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক অবজারভেশন পোস্ট স্থাপন করে নদীর দক্ষিণ পাড়ঘেষে এক মাইলের মধ্যে কোনো পাকিস্তানি আক্রমণকারী দল যাতে না আসতে পারে, তার ব্যবস্থা করবে। ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যার মধ্যেই ছোটখেল ও রাধানগর দখলের মাধ্যমে প্রাপ্ত



www.amarboi.org

সকল এম্যুনিশন গোয়াইনঘাট বাজার ও হাসপাতাল এলাকায় এনে জমা করবে। ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যার মধ্যেই ব্যাটালিয়ন সুবেদার মেজর হারিছ মিঞা রাধানগর অবস্থান ছেড়ে গোয়াইনঘাটে চলে আসবে। আর ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যার মধ্যেই সুবেদার আলী নেওয়াজ গোয়াইনঘাটের অপারেশনাল রিয়ার হেডকোয়ার্টার সরিয়ে জলুরপাড় গ্রামে নিয়ে যাবে। অন্য দুটি এফএফ কোম্পানি আক্রমণকারী দলগুলোর সঙ্গে যে কোনো সময় যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। মিত্রবাহিনীর ৪.২ ইঞ্চ মর্টারগুলো ছোটখেল অবস্থান থেকে সরে গিয়ে কর্নী গ্রাম সংলগ্ন কাইরাই-গোয়াইনঘাট সড়কে এসে অবস্থান নেবে। ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টেটিও সরে আসবে কর্মী ও যাতীগাঁ এলাকায়। লেফটেন্যান্ট তাহের আকঞ্জির নেতৃত্বাধীন দুটি এফএফ কোম্পানিকে কাইরাই-সালুটিকর সড়কপথ ধরে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয়া হয়। লেফটেন্যান্ট খালেদের এফএফ কোম্পানিকে কোম্পানীগঞ্জ-সিলেট সড়কপথ ধরে সালুটিকর ফেরিঘাটের দিকে অগ্রসর হতে বলা হয়।

প্রতিটি কোম্পানি থেকে একজন প্লাটুন কমান্ডারের নেতৃত্বে মোট ৬ জনের একটি দল রেকি সম্পন্ন করে ৬ ডিসেম্বর চাইতবাড়ী অবস্থানে ফিরে আসার পর তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে সালুটিকর ফেরিঘাট এবং বিমানঘাঁটি এলাকায় আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ৬ ডিসেম্বর রাত ৮টায় আলফা কোম্পানির সৈনিকরা সালুটিকরের উদ্দেশে যাত্রা করে। এক এক করে মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেকটি কোম্পানি সালুটিকর পৌঁছে তাদের পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবস্থান নেয়।

৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে ৩০/৩৫ জনের একটি নিয়মিত পাকিস্তানি প্যাট্রোল পার্টি ফেরি পার হয়ে নদীর পাড়ঘেঁষে আলফা কোম্পানির অবস্থানের দিকে আসছিল। কাছে আসতেই আলফা কোম্পানির সৈনিকেরা ওদের তাক করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এ আক্রমণ থেকে পাকিস্তানিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু এরপর নদীর অপর তীরের প্রতিটি পাকিস্তানি অবস্থান থেকেই একযোগে মুক্তিবাহিনীর সবগুলো অবস্থানে আর্টিলারি, মর্টার এবং মেশিনগানের গুলি নিক্ষেপ শুরু হয়। শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শেষ না হবার কারণে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে



www.amarboi.org

কোনো প্রত্যুত্তর দেয়া হয় না। এভাবে এদিন কয়েক দফা পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রতিবারই মুক্তিবাহিনী প্রত্যুত্তরে বিরত থাকে।

৭ ডিসেম্বর সুবেদার বদির নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নদীর দক্ষিণ পাড়ের ৩টি টিলায় অবস্থান নেয়। কারণ নদীর উত্তর পাড়ের অবস্থানগুলোর নিরাপত্তার জন্য দক্ষিণ পাড়ের টিলাগুলো প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়া মুক্তিবাহিনীর জন্য খুব জরুরি ছিল। অবস্থানটির গুরুত্ব আঁচ করে সেখানে দুটি মেশিনগানও দেয়া হয়। এই অবস্থানের মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি মেশিনগানের ফায়ার কভার ছাড়াও ৪টি ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং ৪টি আর আর-এর ফায়ার কাভারেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া প্লাটুনটিকে পার্শ্ববর্তী অন্য দুটি টিলাতে অবস্থান নেবার জন্য আরো এক প্লাটুন সৈন্য পাঠানো হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়। রাতভর টিলায় অবস্থানরত প্লাটুনটির জন্য এ্যমুনিশন পাঠানো হয়। ৩ ইঞ্চি মর্টার রাখা হয় নদীর তীরঘেষে ফরেস্ট ডাকবাংলোর অবস্থানের কাছে। আর বাকিগুলো পাঠানো হয় আলফা কোম্পানি অবস্থানে। টিলা ৩টিতে মুক্তিবাহিনী খুব মজবুত বাঙ্কার খননের সাহায্যে অবস্থান নেয়। বামদিকের টিলার একেবারে বামে এবং ডান দিকের টিলার একেবারে ডানে মেশিনগান দুটি স্থাপন করা হয়। এই দুটি টিলার অবস্থান থেকে সালুটিকর বিমানঘাঁটির রানওয়ে একেবারে মেশিনগান রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। সে কারণে যে কোনো কিছুর বিনিময়ে টিলা ৩টির অবস্থান ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নদী পারাপারের জন্য অনেকগুলো নৌকা সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন রাখা হয়। নদীর দুই তীরে খুটি পুঁতে পাটের রশি দিয়ে সংযোগ করা হয়। এসকল রশির সঙ্গে প্রতিটি নৌকা সংযুক্ত কার হয়। ব্যবস্থা যাতে নদীর উভয় পাড় থেকে রশি ধরে টান দিলে নৌকা দিয়ে নৌকা পরাপার করা যেত।

৮ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে পাকিস্তানিরা নদীর তীর ঘেঁষে তৈরি করা তাদের ফাস্ট লাইন ডিফেন্সের অবস্থানে আসছিল। তখনই আলফা কোম্পানির অবস্থান থেকে এদের উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া হয়। পাকিস্তানিরা পিছু হটে নিকটস্থ টিলাগুলোতে অবস্থান নিতে চাইলে সেখানে ৩টি টিলায় অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী একযোগে গুলি ছোঁড়ে। প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তানিরা অপ্রস্তুত হলেও মুহূর্তের মধ্যেই তারা নিজেদের সুসংগঠিত করার কাজে লেগে যায়। পিছু হটে গিয়ে তারা সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ সড়কের আড়ালে অবস্থান নেয়। এই সড়কের



www.amarboi.org

হিংগিরপুল এলাকায় রাস্তার আড়ালে বেশ কিছু আর্টিলারির গানকে অবস্থান নিতে দেখা যায়। দুপুর প্রায় ১২টায় পাকিস্তানিরা নদীর তীর ঘেঁষে মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অবস্থানেই ব্যাপক আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। অন্তত ৬টি হাউইটজার গানের গোলার আঘাতে নদীর উত্তর পাড়ের প্রতিটি অবস্থানেই তীব্রতর হতে থাকে। অন্যদিকে টিলাগুলোর ওপরও ওরা মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। ব্যাপক ফায়ার কভারের মাধ্যমে পাকিস্তানিরা মুক্তিবাহিনীর টিলাগুলোর অবস্থানের ওপর বারবার আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রতিবারই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। একটানা ৩০/৪০ মিনিট আর্টিলারির গোলা নিক্ষেপের পর পাকিস্তানি বাহিনী এদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৭/৮ বার Assault Formation করে টিলাগুলোর ওপর চড়াও হতে চেস্টা করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর অবস্থান টিলাগুলোর উপরে থাকার কারণে তাদের অবিরাম গুলির আঘাতে প্রতিবারই শক্রর বহুসংখ্যক সৈন্য হতাহত থাকে। সন্ধ্যার পাকিস্তানি বাহিনী আর কোনো আক্রমণ পরিচালনা করেনি। মুক্তিযোদ্ধারাও দিনভর নদীর উত্তর পাড়ের অবস্থান থেকে পাকিস্তানিদের ওপর ব্যাপক মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। সন্ধ্যার পর পরই মুক্তিবাহিনীর অবস্থানগুলোর মধ্যে কিছু রদবদল আনা হয়। পাকিস্তানিদের পরবর্তী হামলা প্রতিহত করার লক্ষ্যেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়। সন্ধ্যার পর হাবিলদার আবুল খায়েরের নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন নদীর অপর পাড়ের আরো ৩টি টিলায় প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়ে দেয়। নদীর অপর পাড়ের প্রতিটি টিলার প্রতিরক্ষা অবস্থানে রাতভর পর্যাপ্ত এ্যামুনিশন পাঠানো হয়। লেফটেন্যান্ট মতিউরের এফএফ কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা একাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। সুরমা নদীর দক্ষিণ পাড়ের টিলাগুলোতে দুটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেবার কারণে উত্তর পাড়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য লেফটেন্যান্ট মতিউরের এফএফ কোম্পানিটিকে চৌধুরীকান্দির ফরেস্ট ডাকবাংলো পর্যন্ত নদীর উত্তর তীর ধরে তার প্রতিরক্ষা অবস্থান বিস্তৃত করার নির্দেশ দেয়া হয়।

৯ ডিসেম্বর সকাল ৮টা থেকেই পাকিস্তানিরা ব্যাপক আর্টিলারির গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। সকাল ১১টার দিকে পর্যাপ্ত আর্টিলারি, ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগানের ফায়ার কভারে ওরা কেনরীর পাড়া এলাকা হয়ে মুক্তিবাহিনীর



www.amarboi.org

জলুর পাড় এলাকায় অবস্থিত রিযার হেডকোয়ার্টার অবস্থানের ওপর হামলা করে বসে। পাকিস্তানি বাহিনীর মর্টার ও মেশিনগানের গোলার ব্যাপকতায় মুক্তিবাহিনী কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার ওয়াহেদের ত্বরিৎ প্রচেষ্টায় মোটামুটি সবই একত্রিত হয়ে শত্রুদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। বিকেল ৪টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই আক্রমণে উভয় পক্ষের কমবেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা বাইলকান্দি, টুকেরবাজর, বুচারকান্দি এবং শতকুড়ির কান্দি হয়ে কইয়ারপাড়, চাইতবাড়ী, জলুরপাড় এবং বেতুরকুল এলাকার অন্তত ১০টি স্থানে একযোগে হামলা চালায়, যাতে করে ওরা ফায়ার কভারের আড়ালে যে কোনো পয়েন্টে নদী অতিক্রম করে ব্রিজহেড তৈরি করা। আর ব্রিজহেড তৈরি করতে পারালে মুক্তিবাহিনীর অগ্রযাত্রা থমকে যেত। মুক্তিবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে ৩ ঘন্টার একটানা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ১০টি স্থানেই ব্রিজহেড তৈরিতে বাধা দিয়ে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এই দিন পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিকেল ৪টার দিকে এ সকল অবস্থান থেকে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে।

১১ ডিসেম্বর বিকের ৩টা ৩০ মিনিটের দিকে পাকিস্তানিরা সালুটিকর ফেরিঘাটের পশ্চিমদিকে নদী অত্রিক্রম করে শত্রু সুরমা নদীর তীরঘেঁষে সালুটিকর ফেরিঘাট এলাকা থেকে কচুয়ার পাড় গ্রামের পুর্ব সীমানা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অবস্থানের ওপর ব্যাপক আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করে। অতি দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর প্রতিহামলায় টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। একইভাবে তারা নদীর অপর পাড়ের মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অবস্থানেও আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে টিকতে না পেরে পিছু হটে। এদিনও ব্রিজহেড তৈরির সকল চেষ্টা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ব্যর্থ করে দেয়।

১২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর অবস্থানগুলোর ওপর আর্টিলারি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও তার পাল্টা জবাব দেয় আরআর এবং মর্টারের গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে। এদিন দুপুর ১২টার দিকে পাকিস্তানিদের একটি শক্তিশালী দল মুক্তিবহিনীর অবস্থানের পেছন দিক থেকে এই আক্রমণ পরিচালনা করে। শত্রুর এই দলটি সালুটিকর



www.amarboi.org

ফেরিঘাটকে ডানে রেখে নদী অতিক্রম করে উত্তরে নন্দীরগাঁ এলাকায় গিয়ে সমবেত হয়। সেখান থেকে পাকিস্তান বাহিনীর এই সেনাদলটি পেছন দিকে থেকে মুক্তিবাহিনীর সমালুটিকর ফেরিঘাট, কচুয়ার পাড়া, দারিকান্দি ও চৌধুরী কান্দি অবস্থানগুলোর ওপর একযোগে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়। সকাল ১০টা থেকেই একটানা আর্টিলারির গোলা মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অবস্থানের ওপর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনীর এই দলটি খুব নিকটে এসে পেছন দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অবস্থানের ওপর গোলা গুলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে। মুক্তিবাহিনী এর প্রত্তোত্তর না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একমাত্র সুবেদার আলী আকবরের দারিরকান্দি গ্রামের অবস্থানে এই সিদ্ধান্ত জানতে পারে নাই। এদিন সকাল ৯টার দিকে মিত্রবাহিনীর ই-১ সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রাজ সিং এবং ডাউকি বিএসএফ-এর মেজর রাও সালুটিকর ফরেষ্ট ডাকবাংলা অবস্থানে এসে গোলা-গুলির মধ্যে আটকে পড়েন। পেছন দিক থেকে ব্যাপক পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে কর্নেল রাজসিং তার সেন্ট্রি এবং বিএসএফ-এর মেজর রাও থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কর্নেল রাজ সিং ফরেস্ট ডাকবাংলোর বাঙ্কারে অবস্থান নেই। পাকিস্তানি বাহিনী সুবেদার আলী আকবরের দারিরকান্দি গ্রামের প্রতিরক্ষা অবস্থান ওভার-রান করে অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার এর দিকে অগ্রসর হয়। দারিরকান্দি গ্রামের প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে সুবেদার আকবরের দিকে অগ্রসর হয়। দারিরকান্দি গ্রামের প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে সুবেদার আলী আকবরের প্লাটুন শত্রুর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য ব্যাপক গুলি-গোলা নিক্ষেপ করেন। শত্রুর জনবল এবং ফায়ার পাওয়ারের তুলনায় এতই বেশি ছিল যে, তিনি বেশিক্ষণ ঐ স্থানে টিকে থাকতে পারলেন না। সুবেদার আলী আকবরের প্লাটুনের একজন সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন এবং অন্য দুজন গুলিবিদ্ধ হন। সুবেদার আলী আকবর অবস্থান ছেড়ে নিকববর্তী একটি মুশ্‌তাক বাগানে উঁচু আইলের আড়াল নিয়ে নিরব অবস্থান নেই। দারিরকান্দি দখলের পর শত্রু নদীর তীরবর্তী চৌধুরী কান্দি এবং কচুয়াপাড় অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পুরো ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী নিশ্চুপ থাকায় শত্রু নিশ্চিত হয় যে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই ধারানার বশবর্তী হয়ে শত্রু সারি বেঁধে নিশ্চিন্তে নিজ নিজ অস্ত্র কাঁধে রেখে অসতর্ক ভাবে ফরেস্ট ডাকবাংলার অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শত্রুর কলামটি যখন ডাকবাংলো অবস্থান থেকে নিকটবর্তী হলে বাঙ্কারে অবস্থানকারী কর্নেল রাজ সিং ফায়ার ওপেন করার জন্য উদগ্রিব হয়ে ওঠেন। শত্রুর সম্মুখের সৈন্যটি যখন ডাকবাংলো বাংকারের ১০ গজের মধ্যে চলে আসে, তখনই ফায়ার ওপেন



www.amarboi.org

করা হয়। পাকিস্তানি সেনারা ত্বরিত দৌড়ে গিয়ে নিরাপদ অবস্থান নিতে দেখা যায়। মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা সকল অবস্থান থেকে একযোগে আক্রমণ চালায়। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা এক রক্ষক্ষয়ী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শত্রুর কিছুসংখ্যক সৈন্য পার্শ্ববর্তী ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যেরা দ্রুতবেগে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। কয়েকজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দি হয়। সন্ধ্যার আগে আগেই মেজর রাও এবং অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল রাজ সিং গোয়াইনঘাটের উদ্দেশে সালুটিকর অবস্থান ত্যাগ করেন। লেফটেন্যান্ট মতির একটি প্লাটুন গোয়াইনঘাট পর্যন্ত কর্নেল রাজ সিংকে পৌঁছে দেয়। ১৭ ডিসেম্বর এই সালুটিকর বিমানঘাঁটি এলাকাতেই আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর দুটি ব্রিগেডের সৈন্যদের একত্রিত করা হয়েছিল। এখান থেকেই তাদের ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বস্তুতপক্ষে ৭ ডিসেম্বর থেকেই এক এক করে শত্রুর প্রতিটি সীমান্তবর্তী শক্তিশালী ঘাঁটির পতন হতে শুরু করে। এ দিন থেকেই শত্রুর দূরবর্তী অবস্থানগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তারা দূরবর্তী অবস্থানগুলো ছেড়ে সিলেট শহরের দিকে পিছিয়ে আসতে শুরু করে।

সালুটিকর অপারেশনের সংবাদ চারদিকে দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র দু'মাইলের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে শুনে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের মধ্যে এক অভূতপূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানি নিজ নিজ ইউনিটের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য শত্রু নিধনে ঝাপিয়ে পড়ে।

উত্তর এবং পশ্চিমদিকে থেকে 'জেড ফোর্সে'র ব্র্যাভো ও চার্লি কোম্পানি এবং ৫নং সেক্টর ট্রুপস সিলেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

## তোয়াকিবাজার সংঘর্ষ (৬ ডিসেম্বর '৭১)

তোয়াকিবাজার এলাকাটি সিলেট জেরার কোম্পানীগঞ্জ থানার একটি স্থান। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি ৫নং সেক্টরের ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীনে ছিল। গৌরীনগর রোডের পূর্বদিকে স্থানটি অবস্থিত।

৬ ডিসেম্বর ভোর ৬টায় জেড ফোর্সের ৩ বেঙ্গল এর 'এ' এবং 'বি' কোম্পানি খাইরাইয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প দখলের পর চার্লি কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা তোয়াকিবাজারের দিকে রওনা হয়। তোয়াকিবাজারে কোম্পানি



www.amarboi.org

হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে পাইকরাজ এবং জাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পাইকরাজ ও জাঙ্গাইলের মাঝামাঝি স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেখানে তারা বাঙ্কার করে অবস্থান নিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর বাঙ্কারের কাছাকাছি পৌঁছা মাত্র তারা ফায়ার ওপেন করে। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত আশে পাশের নিচু জমির আইলের আড়ালে নিরাপদ পজিশন নিয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাল্টা গুলি চালায়। এ সকল যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী সঙ্গে অনেক রাজাকারদেরকেও সঙ্গি করত। উভয় পক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধে ১০/১২ জন পাকিস্তানি সেনা এবং প্রায় সমসংখ্যক রাজাকার হতাহত হয়।

### সুনামগঞ্জ ও ছাতক দখল (৬-৭ ডিসেম্বর '৭১)

বালাট সাব-সেক্টর ট্রুপস ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ শহর দখল করে নেয়। সেই দিনেই মুক্তিবাহিনী ছাতকের ওপরেও তীব্র আক্রমণ চালায়। ৫নং সেক্টর মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানী এবং জেড ফোর্সের ৩ বেঙ্গল এর ক্যাপ্টেন মোহসীন ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বাধীন ব্র্যাভো ও চার্লি কোম্পানি দুটি এবং শেরা সাব -সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ছাতক আক্রমণ করেন। এই সম্মিলিত আক্রমণে ৭ ডিসেম্বর ছাতক শহর পাকিস্তানি দখল মুক্ত হয়।

৭ ডিসেম্বর ছাতক মুক্ত হওয়ার পর ছাতক-সিলেট অক্ষ বরাবর জেড-ফোর্সের ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২৫ আসাম রেজিমেন্ট এবং ৫নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট শহরের উপকণ্ঠ গোবিন্দগঞ্জ ও লামাকাজি ঘাটে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়।

### গোবিন্দগঞ্জ অপারেশন (১২-১৪ ডিসেম্বর '৭১)

সিলেট শহর থেকে পশ্চিমদিকে লামাকাজি ঘাট। এই ঘাটের ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে গোবিন্দগঞ্জ টি জংশন। গোবিন্দগঞ্জ থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে ছাতকের দিকে এবং অন্যটি সুনামগঞ্জে। সিলেট-ছাতক; সিলেট-সুনামগঞ্জ অ্যাক্সিসে গোবিন্দগঞ্জ টি-জংশন সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূণ ছিল। কাছাকাছি লামাকাজি ঘাটসহ এই এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সিলেট শহরকে রক্ষার জন্য সর্বশেষ প্রতিরক্ষাব্যূহ। সুনামগঞ্জ ও ছাতক এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর সব কটি ইউনিট এখানে এসেই প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়।



www.amarboi.org

গোবিন্দগঞ্জে পতনের মানেই হলো ক্রমে পূর্ব দিকে লামাকাজিঘাট নিরাপত্তাহীন ও হাতছাড়া হওয়া। আর এর পরপরই সিলেট শহর আক্রান্ত হওয়া। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় গোবিন্দগঞ্জ অবস্থানগত কারণে ব্যাপক সামরিক গুরুত্ব লাভ করে। আর এ জন্যই এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী অবস্থান গড়ে ওঠে। ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্ত এলাকা ছেড়ে ক্রমে শহর ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও ক্রমে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গোবিন্দগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্ত অবস্থান ছিল। ঐ অবস্থানটি শত্রুমুক্ত করা না গেলে সিলেট শহর অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছিল না।

www.amarboi.org
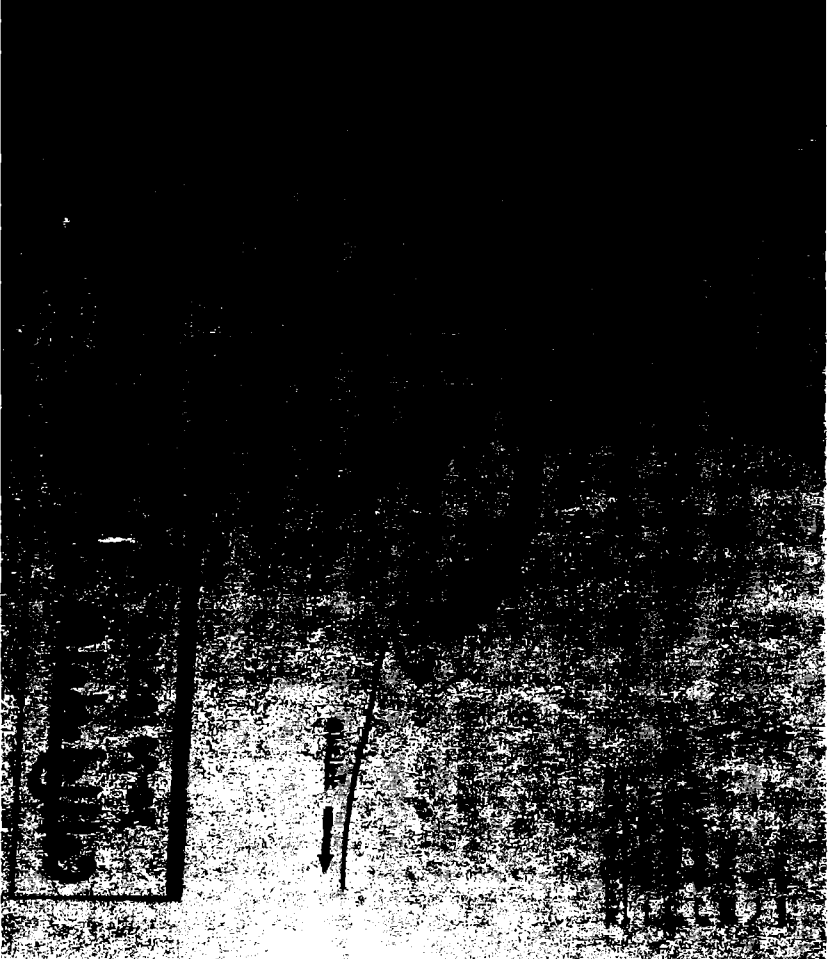
গোবিন্দগঞ্জে পাকিস্তানিদের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য অবস্থান করছিল। ফলে যৌথবাহিনী সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হতে পারছিল না। ১৩ ডিসেম্বর ছাতক-ওয়াপদার গেস্ট হাউসে ৫ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকতের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্নেল রাজ সিং এবং জেড ফোর্সের ৩ বেঙ্গল গোবিন্দগঞ্জ আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। সে অনুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর রাতে ৩ বেঙ্গলের ১টি কোম্পানী, এফএফ কোম্পানিসমূহ এবং গোবিন্দগঞ্জ টি-জংশন এলাকায় অবস্থান্‌কারী মিত্রবাহিনীর ইউনিটসমূহ এই আক্রমণে সম্পৃক্ত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা ডান দিক থেকে টার্গেট অভিমুখে আক্রমণ চালাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। লেঃ ফখরুলের নেতৃত্বে এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ইতোমধ্যে টি-জংশনের দক্ষিণের গ্রামটিতে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। ঐ গ্রামের পূর্বদিকে রেলসেতু এলাকা পর্যন্ত এরা ততক্ষণে শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ঐ গ্রামটিতেই তাদের FUP (Form Up Position) নির্ধরিত ছিল। Assault Line- এর অবস্থান FUP এ পৌছার পরই প্রয়োজন মোতাবেক স্থির করা হবে সিদ্ধান্ত হল।

## লামাকাজি যুদ্ধের প্রস্তুতি (১৫ ডিসেম্বর '৭১)

সিলেট শহরটি মোটামুটি তিন দিক থেকেই নদীতে ঘেরা । সিলেট শহর থেকে উত্তর দিকে কোম্পানিগঞ্জ যাওয়ার পথে ছিল সুরমা নদীর ওপর সালুটিকর ফেরিঘাট, পুর্বদিকে মৌলভীবাজার, চরখাই, করিমগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোপালগঞ্জ / ফেঞ্চুগঞ্জ যেতে ছিল শহর সংলগ্ন ইংরেজ আমলে সুরমা নদীর ওপর নির্মিত একটি লোহার ব্রিজ। পশ্চিমদিকে ছাতক ও সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে ছিল শহর সংলগ্ন সুরমা নদীতে লামাকাজি ফেরিঘাট। একমাত্র সিলেট তামাবিল সড়কপথে সিলেট শহর থেকে বের হতে কোনো ফেরি ছিল না। লামাকাজি ঘাট থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ছিল গোবিন্দগঞ্জ টি-জংশনটি। গোবিন্দগঞ্জ থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে ছাতকের দিকে এবং অন্যটি সুনামগঞ্জে। সিলেট-ছাতক এবং সিলেট-সুনামগঞ্জ যাতায়াত পথে গোবিন্দগঞ্জ টি-জংশনটি এবং লামাকাজি ঘাটটি ছিল সামরিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ।



www.amarboi.org

এই দুটি সংযোগ সঙ্গমে গোবিন্দগঞ্জ টি-জংশন এবং লামাকাজি ঘাট এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সিলেট শহরকে রক্ষার জন্য সর্বশেষ প্রতিরক্ষাব্যুহ। সুনামগঞ্জ এবং ছাতক এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর সব কয়টি ইউনিটই এখানে এসে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। গোবিন্দগঞ্জ এবং লামাকাজি ঘাটের পতনের অর্থই ছিল সিলেট শহরেরও পতন। কেননা এই এ্যাক্সিসে সিলেট শহরে ঢুকে পড়ার জন্য আর কোনো প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না। যে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় Major Obstacle এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে ১৫ ডিসেম্বর পাক সামরিক কমান্ডের সিদ্ধান্তে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত সীমান্ত এলাকা থেকে সাজ সরঞ্জামসহ সব সৈন্য প্রত্যাহার করে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ক্যাজুয়াল্টি এড়িয়ে ঢাকায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছিল। তাই ১৫ ডিসেম্বরের মুক্তি বাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা তেমন একটা গুরুত্ব বহন করেনা।

১৫ ডিসেম্বর ৩ বেঙ্গল এবং ফখরুলের এফএফ কোম্পানি লামাকাজিঘাট অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে যে পাকিস্তানি বাহিনী সমস্ত সীমান্ত থেকে তাদের ঘাঁটি গুটিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা আনুমানিক দুপুর ২.৩০ মিনিটে তারা দেখতে পায় পাকিস্তান বাহিনী তাদের সাজ সরঞ্জামসহ সিলেট শহরের দিকে চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা কোন রকম আক্রমণে যাওয়া অর্থহীন বিবেচনা করে। ৩ বেঙ্গলের তিনটি কোম্পানি নিয়ে মেজর মোহসীন ঘাটপাড়ের উদ্দেশে প্রকাশ্যে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের ওপর দিয়ে রওয়ানা হয়। ঘাটে পৌছানোর ৩০০ গজ থাকতেই এ দলটি বিকট দুটি আওয়াজের শব্দ পায়। তারা দেখতে পায় ঘাটে নোঙ্গর করা দুটি ফেরিকে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে পাকিস্তানিরা ডুবিয়ে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত ঘাটের পাড়ে পজিশন নিচ্ছে দেখে তারা অবশিষ্ট ফেরিগুলোতে তারা বিস্ফোরক লাগান বন্ধ করে। এ পর্যায়ে মেজর মোহসীন নদীর এপার থেকে পাকিস্তানিদের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের দৌড়াদৌড়ি করে ফায়ারিং পজিশনে যেতে



www.amarboi.org

দেখে ফেরিঘাট ত্যাগ করে সিলেটের দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনী সারিবদ্ধভাবে সিলেট শহরের দিকে চলে গেল।

৩ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ১৬ তারিখে সিলেট শহরে প্রবেশ করে যখন পাকিস্তানি বাহিনী ইতোমধ্যেই যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে ফেলেছে।

৫ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ৩ বেঙ্গল সৈনিকেরা সেখানেই রইলেন। ছোটখেল যুদ্ধে আহত ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল এসে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে যোগদেন এবং চূড়ান্ত বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ৫ নম্বরের কিছু অংশকে বিশ্বনাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

## ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযানের ধারা কানাইঘাট-চরখাই-এমসি কলেজ-সিলেট

'জেড ফোর্সের ১ম বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফোর্স নভেম্বর মাসেই পূর্ব দিক থেকেই আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট অক্ষ ধরে চূড়ান্ত অভিযান শুরু করে। অগ্রসর হওয়ার পথে ২১ নভেম্বর আটগ্রামে পাকিস্তানিদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বেঁধে যায়। এখানে যৌথবাহিনীর ৪/৫ গুর্খা রাইফেলস মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়। আটগ্রাম ও চারগ্রাম সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত দুটি ছোট গ্রাম। জকিগঞ্জ থানা সদর থেকে উত্তর দিকে এর অবস্থান। গ্রামদু'টির উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুরমা নদী, তারপর ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্ত এলাকা। আবার জকিগঞ্জ-সিলেট সড়কটিও এই চারগ্রামকে সীমানা ঘেঁষে গেছে। ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সীমান্ত পকেট প্রভৃতি কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকাটি সামরিক গুরুত্ব লাভ করে।



www.amarboi.org
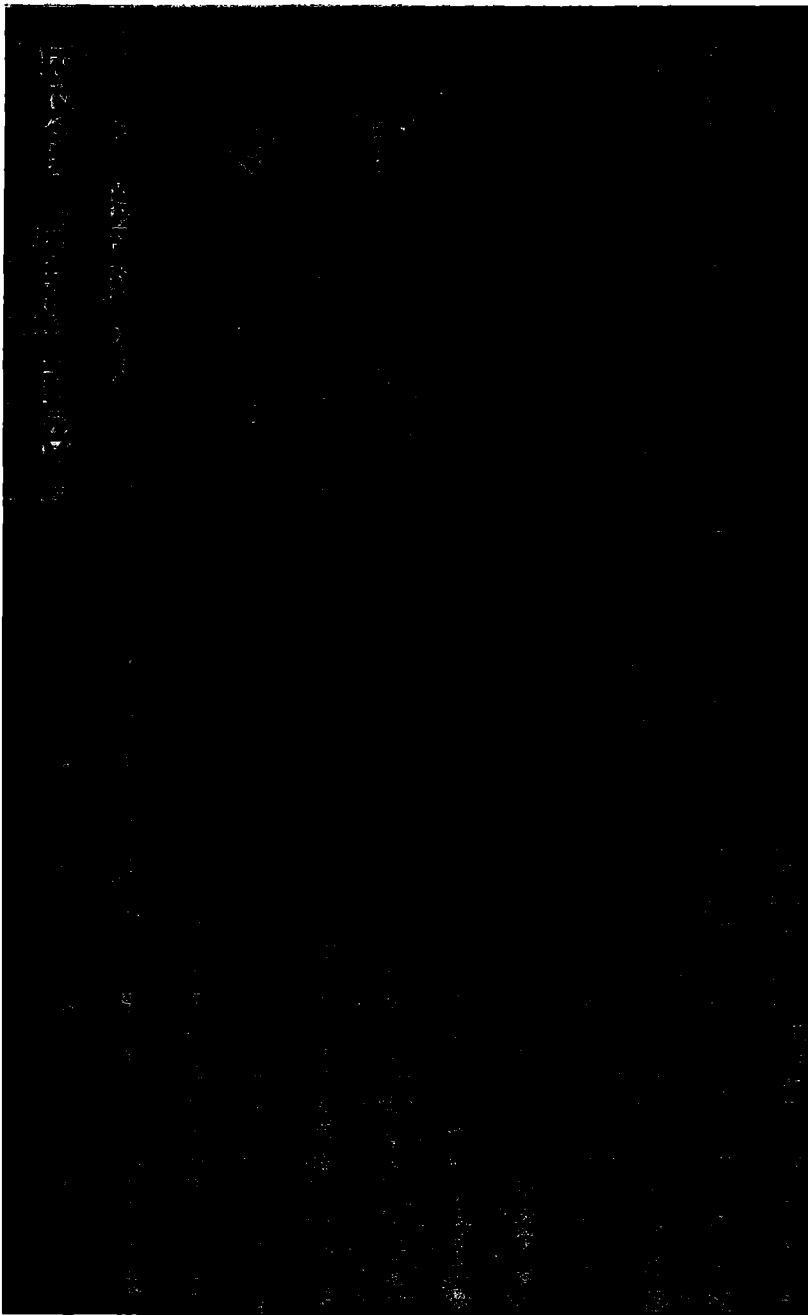
মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিক থেকেই এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনী নিজ নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে শক্তিশালী আধুনিক সাজে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর মারণাস্ত্রের সামনে নামে মাত্র ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই করলেও অস্ত্র, সংগঠন ও প্রশিক্ষণের স্বল্পতার কারণে তারা ত্বরিত বিজয় স্থায়ী ভাবে ধরে রাখতে সমর্থ হয় নাই। এখানে স্মর্তব্য যে ২১ নভেম্বর থেকেই প্রবাসী সরকার ভারত সরকারের ইচ্ছানুসারে মুক্তি বাহিনীকে ভারতীয় বাহিনীর অধিন্যস্ত করা হয়। সেই চুক্তি অনুসারে ২১ নভেম্বর থেকে ৪/৫ গুর্খা ব্যাটালিয়ন জেড ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গভীর রাতে সুরমা নদী অতিক্রম করে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি আটগ্রামের ওপর আক্রমণ চালায় এবং আটগ্রাম দখল করতে সক্ষম হয়। তবে এই যুদ্ধে উভয় অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনী এবং তাদের অধীন মুক্তি বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। এতে ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজর ও ৬ জন সেকেন্ড লেফটেন্যান্টসহ অনেক সৈন্য নিহত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আটগ্রাম ও চারগ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী দুটি ঘাঁটি।

আটগ্রাম দখলের পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে চারগ্রাম দখল করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ঐ একই দিনে অর্থাৎ ২১ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ওয়াট 'জেড ফোর্স' কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়াকে চারগ্রামে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাতে অনুরোধ করেন। সংগত কারণ যে, আটগ্রাম যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের সম্মুখীন হয়ে তারা চারগ্রাম অভিযানে অংশগ্রহণ করতে কিছুটা হতাশাবোধ করে। এই পরিস্থিতিতে কর্ণেল জিয়া তার আটগ্রাম হেডকোয়ার্টারে এক কনফারেন্স ডাকেন। তিনি ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্র্যাভো কোম্পানিকে চারগ্রামের পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। সে সময় আটগ্রামের কাছেই চারগ্রাম ইনসপেকশন বাংলো এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী এক প্লাটুন অতিরিক্ত নিয়মিত সৈন্য অবস্থান করছিল। শত্রু এলাকার তিন দিকে ৩০০ গজ থেকে ৫০০ গজ পর্যন্ত সমতল এলাকা, ধান ক্ষেত, ফলে ফিল্ড অফ ফায়ার অত্যন্ত পরিস্কার। এছাড়াও একপাশে সুরমা নদী প্রবাহিত অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার ফলে পাকিস্তান বাহিনী যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ২১ নভেম্বর বিকেলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্র্যাভো কোম্পানি ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে চারগ্রাম আক্রমণের পরিকল্পনা করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয়রা আর্টিলারি সাপোর্ট দেযার নির্দেশ থাকে। তখন



www.amarboi.org
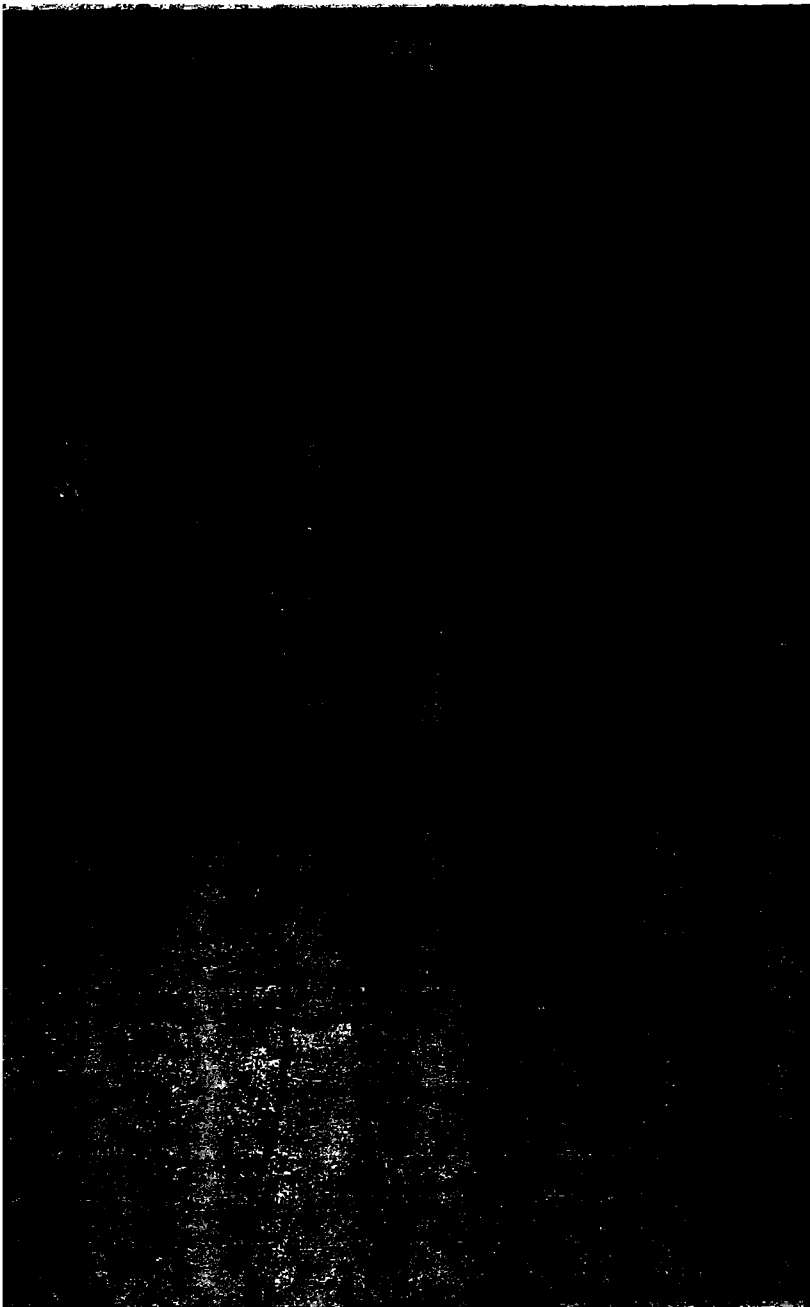
ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের ওপর আর্টিলারি গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং একই সাথে ব্র্যাভো কোম্পানি ঋটচ এ যাওয়ার চেস্টা চালায়। পাকিস্তানিরা বাঙ্কার থেকে মেশিনগান ও রাইফেল দিয়ে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। FUP তে পৌছার আগেই দুজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। ফলে দিনের আলোতে ঋটচ এ যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়। কারণ এতে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভবনা থাকে। তাই মুক্তিযোদ্ধারা রাতের বেলায় ঋটচ এ যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়। এই অবস্থায় কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন হাফিজ ভোর ৪টায় তার কোম্পানিকে শেষবারের মত ব্রিফ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা শেষ রাতে অত্যন্ত কৌশলে ঋটচ এ পৌছে যায়। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা 'নারায়ে তাকবীর' বলে ভারতীয় আর্টিলারি সাহায্য ছাড়াই তীব্র বেগে শত্রুর অবস্থানের উপরে গুলি করতে করতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর অবস্থানের এরিয়ায় ঢুকতে থাকে। ১০০ গজ দূরে থাকতেই শত্রুর এলএমজি ও রাইফেল সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এ রকম বিপজ্জনক অবস্থা অগ্রাহ্য করে ১ম বেঙ্গলের বি কোম্পানী এবং মুক্তিবাহিনী মিলিত ভাবে ১ম বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে শত্রুর ঘাঁটিতে প্রবেশ করে তারা পাকিস্তানি প্যারা-মিলিটারির প্রায় ২০জনকে সনাকে আহত অবস্থায় বন্দি করে। বাকিরা পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ৫জন আহত হয়। শত্রুর ঘাঁটি দখল করেই রিপিট এ্যাটাকের জন্য ব্রাভো কোম্পানীর সাথে মুক্তিবাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তানি বাহিনী তখন পলায়নরত। চারগ্রাম দখল হওয়ার পর জেড ফোর্স কমান্ডার কর্ণেল জিয়া ও মিত্রবাহিনীর ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল গন্‌জালভেস চারগ্রামে আসেন। জেনারেল গনজালভেস এই যুদ্ধের জন্যে জেড ফোর্সকে ভূয়সী প্রশংসা জ্ঞাপন করেন।

একই দিন 'জেড ফোর্সে'র ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এ কোম্পানি ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে আটগ্রাম ব্রিজ আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ দখল করতে সক্ষম হয়। এভাবে মুক্তিযোদ্ধারা আটগ্রাম ও চারগ্রাম এলাকাকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বাধীনতার পর যারা বিভিন্ন জাতীয় খেতাব ও পুরস্কারে ভূষিত হন তারা হলেন ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী বীর বিক্রম, নায়েক সুবেদার হাশেম বীর বিক্রম, নায়েক সুবেদার ইব্রাহিম বীর বিক্রম।

আটগ্রামে পরাজয়ের পর সেই দিনই (২১ নভেম্বর) পাকিস্তানিরা চারগ্রামে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গতিরোধ করে। তুমুল যুদ্ধের পর চারগ্রাম পুণরায় মুক্তিবাহিনীর কজায় আসে। এভাবে কর্ণেল জিয়াউর রহমানের উঁচুমানের



www.amarboi.org

পেশাদারি নির্দেশনায় তাঁর অধিনস্ত অফিসার, সেনা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সাহসী ভূমিকার কাছে পাকিস্তানিরা হার মানে। এ যুদ্ধে লেঃ ওয়াকারের অফিসারসুলভ গুনাবলি প্রশংসার দাবিদার। অতঃপর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গৌরীপুরে কানাইঘাটের পাকিস্তানিদের মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে।

একই দিনে মিত্রবাহিনী উভচর ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে জকিগঞ্জ সীমান্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। ফলে আটগ্রাম থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত এলাকায় পলায়নরত শত্রুসেনাদের পকেটগুলো সরিয়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে জেড ফোর্সের Linkup করার দায়িত্ব জেড ফোর্সের ওপরই বর্তায়। জেড ফোর্স সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। সিলেট শহর রক্ষার জন্য 'জেড ফোর্স' কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জিয়ার নেতৃত্বে সেনারা সামরিক কায়দায় এ্যাডভান্স-কনটাক্ট করে এগিয়ে যেতে থাকে। এবার তাদের লক্ষ সিলেট শহরের দিকে। এই অগ্রযাত্রায় বিডিএফ এর নেতৃত্বে ছিলেন ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমান ও তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফবৃন্দ আরও ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর গোলন্দাজ অফিসার মেজর রাও, যাতে করে প্রয়োজন মোতাবেক পশ্চাদপসরণরত শত্রুর ওপরে ভারি কামানের গোলাবর্ষণ করা যায় । ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সুরমা নদীর পাড়ে আটগ্রাম গৌরীপুরে তাদের অস্থায়ী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এক পাশে আলফা ও ডেল্টা কোম্পানি অন্যপাশে ব্র্যাভো ও চার্লি কোম্পানি তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

**কানাইঘাটের যুদ্ধ** (২২ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর '৭১)

মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ২টি যুদ্ধ গৌরীপুর যুদ্ধ ও কানাইঘাটের যুদ্ধ। সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-ভাগে ৪নং সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ দু'টি সংঘটিত হয়। কানাইঘাট সিলেট জেলার একটি থানা। কানাইঘাট থানা সদরটি জৈন্তাপুর-জকিগঞ্জ সংযোগ সড়কে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। মেঘালয় সীমান্তের নিকটবর্তী এই থানাটি অবস্থানগত কারণে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনী উভয়পক্ষের কাছেই সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৯৭১ সালের নভেম্বরে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনীর সরাসরি অংশ গ্রহণের আওতায় আসে। তারা তখন মিত্রশক্তির সাথে কনভেনশনাল যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচিছল। অন্যদিকে জনযুদ্ধের বিস্ফোরণে পাকিস্তান সরকারও এ সময় যুদ্ধকে 'ভারত-পাকিস্তান' সর্বাত্মক যুদ্ধের দকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সময়ে পাকিস্তানিরা সিলেট জেলায় এক ব্রিগেড সৈন্য মোতায়েন করেছিল। সিলেট



www.amarboi.org

শহরের প্রতিরক্ষার জন্য সীমান্ত থেকে সিলেট অঞ্চলে প্রবেশের পথগুলোতেই মূলত ডিফেন্স গড়ে তুলেছিল। সিলেট দখলের জন্য মুক্তিবাহিনী কিংবা যৌথবাহিনীর কাছে কানাইঘাটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জকিগঞ্জ ও আটগ্রাম দখলের পর কানাইঘাট দখল করাটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। আর কানাইঘাটে পাকিস্তানিরা এ সময় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সত্যিকার অর্থেই ৪নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর একটি সাহসী, সাফল্যমন্ডিত অভিযান ছিল কানাইঘাট দখলের অভিযানটি।

৪নং সেক্টরের উত্তরদিক থেকে সিলেটের পূর্বাঞ্চলীয় সীমানা দিয়ে সিলেট শহর অভিমুখে ৩টি প্রবেশ পথ ছিল। যেমন কোম্পানীগঞ্জ-গোয়াইন ঘাট-সিলেট অক্ষ, তামাবিল- জৈন্তাপুর- সিলেট এবং আটগ্রাম- চরখাই- সিলেট অক্ষ। তামাবিল- জৈন্তাপুর-সিলেট এবং আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট এই দুটি অক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে কানাইঘাটের অবস্থান। কানাইঘাট শহর এলাকা গড়ে উঠেছে সুরমা নদীর উত্তর পাড়ে। কানাইঘাট একটি থানা হেডকোয়ার্টার এবং কৌশলগতভাবে স্থানটি একটি সুবিধাজনক ফেভারেব্ল গ্রাউন্ড। দরবশত্ থেকে শহীদবাগ পর্যন্ত প্রসারিত একটি সংযোগকারীর রাস্তার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী অক্ষ দুইটির ওপর প্রভাব রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কানাইঘাট এলাকাটি বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতই সমতল এবং উন্মুক্ত। বেশ কয়েকটি গ্রাম কানাইঘাটের চারপাশে রয়েছে, যেমন- গৌরীপুর, বড়চাতাল, ডালিয়ারচর প্রভৃতি। এর চারপাশেই ছিল ধানের ক্ষেত, পুকুর, জলাশয় প্রভৃতি। কানাইঘাটের উত্তর-পূর্বে আন্দল বিল নামে একটি ছোট বিল বা হ্রদও ছিল।

১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যভাগ। এ সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সবচেয়ে সম্মুখ অবস্থানের ডিফেন্স লাইন ছিল কানাইঘাটে। কেননা ইতিমধ্যে জকিগঞ্জ, আটগ্রাম স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট অক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কানাইঘাটের ডিফেন্স ছিল অত্যন্ত চমৎকার। এখানে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ৩১পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি, পশ্চিম পাকিস্তানি স্কাউটস্ দলের এক প্লাটুন মিলিশিয়া এবং বেশ কিছুসংখ্যাক রাজাকার। তাদেরকে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করেছে একটি আর্টিলারি ব্যাটারি। একই সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী দরবশত এলাকাতেও শক্তিশালী ডিফেন্স গড়ে তুলেছিল, যা ছিল তামাবিল-জৈন্তাপুর-সিলেট অক্ষের একটি অগ্রবর্তী অবস্থান। যেহেতু কানাইঘাট-দরবশত এর সঙ্গে সংযোগকারী একটি সড়ক ছিল, তাই মুক্তিবাহিনী কিংবা যৌথবাহিনীর জন্য এই দুটি স্থান দখল করে নেয়াটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে



www.amarboi.org

পড়ে। কেননা সিলেট পর্যন্ত অগ্রসর হতে হলে এই পথেই তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

যৌথবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড, ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত শক্তি সিলেট দখল করবে। পরে অক্টোবরের মাঝামাঝিতে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম ব্রিগেড জেড ফোর্সও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। জেড ফোর্সের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান সিলেট অভিমুখে চূড়ান্ত অভিযানকালে তাঁর ব্রিগেডের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জালালপুর (আটগ্রামের বিপরীতে এর অবস্থান)। থেকে তার অভিযান শুরু করে। তারা আন্তার্জাতিক সীমনা পেরিয়ে সুরমা নদী অতিক্রম করে আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট অক্ষের ওপরস্থ চারগ্রামে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করার পর ১ বেঙ্গলের প্রথম কাজ দাঁড়ায় জকিগঞ্জ দখল করা। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযানের পথিমধ্যে অবস্থিত জকিগঞ্জের পাকিস্তানি অবস্থানটি আয়ত্তে আনাটা ছিল জরুরি। ১৫ নভেম্বরে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সাফল্যের সঙ্গে জকিগঞ্জ দখল করে। অতঃপর তারা আবারও চারগ্রামে পূর্বের অক্ষে ফিরে আসে। এখানে রেজিমেন্টটি পুনরায় সংগঠিত হয়ে কানাইঘাট দখলপূর্বক সিলেট পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আটগ্রাম-কানাইঘাট-চরখাই সিলেট অক্ষ বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। তারা সুরমা নদীর উত্তর তীর ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। ২২ নভেম্বর তারা গৌরীপুরে পৌঁছে যায়, যা কানাইঘাট থেকে মাত্র ২ মাইল দূরে অবস্থিত।

কানাইঘাটে পাকিস্তানিদের শক্তিশালী ডিফেন্স থাকায় রেজিমেন্টটি গৌরীপুরে তার গতি থামিয়ে দেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়নটি তার আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানিকে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে ডিপ্লয় করে। চার্লি ও ডেল্টা কোম্পানিকে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে ডিপ্লয় করা হয়। ইতোমধ্যে সর্বশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জেড ফোর্সের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান ৪নং সেক্টরের অধিনায়ক কে তার বাহিনী নিয়ে কানাইঘাট শত্রুমুক্ত করার নির্দেশ দেন যাতে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নির্বিঘ্নে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে। এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই কারণে যে, সিলেট শহরের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার ক্ষেত্রে যাতে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শক্তি-সামর্থ পূর্ণ-মাত্রায় বজায় থাকে। ৪নং সেক্টরের অধিনায়ক পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে এই মিশন সফল



www.amarboi.org

করার জন্য পূর্ণ মনোযোগ দেন। ৪নং সেক্টর ট্রুপস গঠিত হয়েছিল মূলত সাবেক ইপিআর বাহিনীর সৈনিকদের দ্বারা। তাদের সঙ্গে বেশকিছু সেনা সদস্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং মুক্তিযোদ্ধা যোগ দিয়েছিল। আর ছিল বিপুলসংখ্যাক ছাত্র-জনতার সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। সেক্টরের অধিনায়ক মাত্র ৪ কোম্পানি সৈন্য নিজের অধীনে রেখেছিলেন। তিনি সবচেয়ে সিনিয়র কোম্পানি কমান্ডার মেজর আঃ রবকে এই ৪ কোম্পানি সৈন্য নিয়ে কানাইঘাট দখল করার আদেশ দেন। এই অপারেশনের জন্য অন্যান্য কোম্পানি কমান্ডাররা ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জহির, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট গিয়াস এবং সুবেদার আব্দুল মতিন চৌধুরী। এঁরা সকলে ছিলেন সাহসী এবং নিষ্ঠাবান সৈনিক।

যেহেতু কানাইঘাটে পাকিস্তানিদের ১ কোম্পানিরও অধিক শক্তি নিয়োজিত ছিল এবং এখানে তারা একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তাই কানাইঘাট দখলের অভিযানকে সফল করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অপারেশন এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার পর দেখা গেল যে, দরবশত এবং চরখাইতেও পাকিস্তানিরা ব্যাপক শক্তি, সামর্থ্য নিয়ে ডিফেন্স তৈরী করে অবস্থান করছে। কানাইঘাটের ওপর আক্রমণ করার সময়ে যাতে দরবশত কিংবা চরখাই থেকে কোনোরকম রি-ইনফোর্সমেন্ট আসতে না পারে, যাতে নির্বিঘ্নে কানাইঘাটের পাকিস্তানিদের লন্ড ভন্ড করা যায় সে জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয় যে, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট গিয়াসের নেতৃত্বে একটি কোম্পানিকে দরবশত-কানাইঘাট রোডে এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জহিরের নেতৃত্বে আরেকটি কোম্পানিকে চরখাই-কানাইঘাট রোডে মোতায়েন রাখা হবে। এই দুটি কোম্পানিকে মূলত উপরোক্ত রাস্তা দুটির ওপর ব্লকিং পজিশন তৈরি করে যথাক্রমে দরবশত ও চরখাই থেকে পাকিস্তানিদের রি-ইনফোর্সমেন্ট প্রতিহত করার আদেশ দেয়া হয়। সেই সঙ্গে কানাইঘাট থেকে পাকিস্তানিরা যাতে পশ্চাদপসরণ করতে না পারে সে দিকটিও তারা দেখবে। বাকি দুটো কোম্পানি মেজর আব্দুর রবের নেতৃত্বে সুরমা নদী পেরিয়ে কানাইঘাট আক্রমণ করবে। যেহেতু সুরমার দক্ষিণে কানাইঘাটের সম্মুখ অবস্থানে পাকিস্তানিরা প্রচুর মাইন পুঁতে রেখেছিল তাই এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া গেল যে, পাকিস্তানিরা প্রাকৃতিক আর নিজেদের তৈরিকৃত প্রতিবন্ধকতার সাহায্য নিয়ে, আর্টিলারির আক্রমণ সহযোগে তাদের অবস্থান দৃঢ়তার সঙ্গেই ধরে রাখবে। একান্তই যদি অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব না হয় তখনই কেবল তারা তাদের পরবর্তী ডিফেন্সিভ অবস্থানে পশ্চাদপসরণ করবে।



www.amarboi.org

২২ নভেম্বর যখন ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গৌরীপুরে পৌঁছে তখন ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি (যেটি কানাইঘাটে ছিল), ডিফেন্সিভ পজিশন ছেড়ে পূর্ণ শক্তিতে অগ্রসর হয়ে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সম্মুখভাগের দুটি কোম্পানিকে ঘিরে ফেলে। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানি দুটি সুরমা নদীর উত্তর তীরে ডিপ্লয়মেন্টে ছিল।

পাকিস্তানি ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অতর্কিত আক্রমণে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অগ্রবর্তী কোম্পানি তথা আলফা কোম্পানি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়। আলফা কোম্পানি অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মাহবুবু আক্রমণকারী শত্রু সৈন্যদের অবস্থান ম্যাপের গ্রিড রেফারেন্স জানিয়ে কামানের গোলা ফেলার অনুরোধ জানাতে থাকেন। তুমুল গোলাগুলি চলছিল। আলফা কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব দৃঢ়তার সঙ্গে এই আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছিলেন। কিন্তু একপর্যায়ে পাকিস্তানিদের গুলিতে ক্যাপ্টেন মাহবুব শাহাদাতবরণ করেন। যুদ্ধকালীন ক্যাপ্টেন মাহবুবের জায়গায় কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত। গৌরীপুরে এক পর্যায়ে তিনিও শত্রুর বুলেটে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন।

২৩ নভেম্বরে পাকিস্তানিরা ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানির ওপর আক্রমণ চালায়। তারা একই সঙ্গে সুরমা নদীর দক্ষিণে অবস্থানরত আলফা ও ব্র্যাভো কোম্পানির ওপরেও আর্টিলারি ফায়ার ও শেলিংয়ের মাধ্যমে প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করেছিল। কয়েক মিনিট পরই ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক মেজর বিজে পাটোয়ারী জানান যে, তাঁর সর্বদক্ষিণের প্লাটুনটি পাকিস্তানিদের হাতে বিধ্বস্ত। পাকিস্তানিরা ডেল্টা কোম্পানির ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং কোম্পানির কেন্দ্রীয় প্লাটুনটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার প্রচেস্টা চালিয়ে যায়। আক্রমণের সময় পাকিস্তানিরা হুমকি-ধমকিসহ মুক্তিবাহিনীকে বারবার আত্মসমর্পণের আহবান জানাতে থাকে।

নাজুক অবস্থা উপলব্ধি করে ডেল্টা কোম্পানির কেন্দ্রীয় প্লাটুনটি কমান্ডার সুবেদার মুসা তাঁর ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিংবা সাব-স্টেশনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। মুসা তাঁর বামপার্শ্বের প্লাটুন কমান্ডার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন। সুবেদার মুসা যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা তাঁর কাছে তুলে ধরেন। তিনি আরো জানান যে, তার পক্ষে আর অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। নব্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি সুবেদার মুসাকে যেভাবেই হোক অবস্থান



www.amarboi.org

নিজেদের আয়ত্তে আনার পরামর্শ দেন। তিনি মুসাকে নদীর তীরের পার্শ্বে শেলটার নিয়ে সেখানেই অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। সেকেন্ড লে. ওয়াকার ঝড়োগতিতে পাকিস্তানিদের ওপর পাল্টা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন। একটি মেশিনগান গ্রুপ, একটি এলএমজি গ্রুপ নিয়ে মেশিনগানের ফায়ারিং সাপোর্ট নিয়ে ওয়াকার শত্রুর অবস্থানের দিকে সুকৌশলে অগ্রসর হতে থাকেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার ২০-২৫ জন সৈনিক নিয়ে ক্রল করে দ্রুত অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানিদের একেবারে নাকের ডগায় ৬০০ গজের মধ্যে পৌঁছে যান।

এরূপ সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ ভিন্ন আর কোনো রাস্তা কখনও খোলা থাকে না। ওয়াকারের জন্যেও ঠিক একই অবস্থা দাঁড়ায়। এখানে দু'পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ ধরনের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হলো। পাকিস্তানিরা অবস্থা বেগতিক দেখে ফায়ারিং সাপোর্ট অব্যাহত রেখে ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে থাকে। অন্যদিকে ওয়াকার তাঁর আক্রমণের গতি আরো বাড়িয়ে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য পাকিস্তানিদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। পলায়নের সময়ে পাকিস্তানিদের কোম্পানি কমান্ডার মেজর সারওয়ার নিহত হলেন। এই যুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য আর বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট ওয়াকারকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। যদিও মুক্তিবাহিনীর এই ছোট সাহসী দলটির পাল্টা আক্রমণ সাফল্য অর্জন করেছিল তথাপি বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এরা কানাইঘাটে গিয়ে তাদের ডিফেন্সিভ পজিশনে পুনরায় যোগদেয়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই অপ্রত্যাশিত অপারেশনটি ৪নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীকে উৎসাহিত করে। তারা কানাইঘাটের পাকিস্তানিদের বিধ্বস্ত করে দিতে বদ্ধ পরিকর হয়।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনী কানাইঘাট আক্রমণ করে। মেজর আব্দুর রব কানাইঘাট থেকে ৫ মাইল দূরের লুবাছড়া চা বাগান এলাকায় তাঁর বাহিনীকে সমবেত করেন। ২৫/২৬ নভেম্বরের রাতে এখানে অস্থায়ী ডিফেন্স গড়ে তোলেন। পরবর্তী রাতে এই বাহিনী বড় চাতালপুর গ্রামের দিকে মার্চ করে। তারা এখানে দরবশত কানাইঘাট রোডের ওপরে একটি ব্লকিং পরিজশন তৈরি করে যাতে পাকিস্তানি বাহিনীর যে কোনোরকম মুভমেন্টকে প্রতিহত করা যায়। এই গ্রামে তারা সম্মখভাগ এবং পশ্চাদভাগ দু'দিকেই মুখ করে ডিফেন্সিভ পজিশন তৈরি করে। যাতে কানাইঘাটে কোনোরকম রি-ইনফোর্সমেন্ট হতে না পারে সেই সঙ্গে কানাইঘাটের পাকিস্তানিরাও যেন পালাতে না পারে। মুক্তিবাহিনীর মিশনটি ছিল কঠিন।


www.amarboi.org

পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিবাহিনীর ব্লকিং পজিশনটি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ১০৫ মিলি মিটার কামানের মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানিদের প্রবল আক্রমণের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ধরে রাখাটা কঠিন হয়ে পড়লেও তারা ওভারহেড প্রটেকশনের মাধ্যমে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থান ধরে রাখে এবং দরবশত-কানাইঘাট রোডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১ ডিসেম্বর '৭১, জেড ফোর্সের অধিনায়ক তাঁর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অগ্রসর হওয়ার স্বার্থে ৪ নং সেক্টর ট্রুপসকে কানাইঘাট দখলের জন্য আবারো নির্দেশ বার্তা পাঠান। সেদিন বিকেল ৫টায় ৪নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর দত্ত, মেজর আব্দুর রবকে পরদিন ভোরেই কানাইঘাট আক্রমণের আদেশ দেন। কিন্তু মেজর আব্দুর রব তাঁর অধিনায়ককে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাঁর সৈনিকেরা ৩ রাত ধরে নির্ঘুম অবস্থায় রয়েছে এবং দারুণ ক্লান্ত। তদুপরি এই কয়েক দিনের যুদ্ধের ফলে গোলা-বারুদও কিছুটা কমে গিয়েছে। এই ঘাটতিপূরণ করাটাও জরুরি ছিল। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় মেজর রবের উক্ত আবেদন রক্ষা করা মেজর সি.আর.দত্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি যেটুকু শক্তি-সামর্থ রয়েছে তাই নিয়েই কানাইঘাট দখলের জন্য মেজর রবকে আদেশ দিলেন। বহুবিধ সমস্যা সত্ত্বেও মেজর আবদুর রব ১ ডিসেম্বরের বেলা দুটোর দিকে কানাইঘাট দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করেন।

১ ডিসেম্বরের দিনগত রাত দুটোর দিকে তারা পূর্বপরিকল্পিত সমাবেশস্থলে পৌঁছেন। ২ ডিসেম্বর ভোর সাড়ে ৩টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। রোডের ওপর পাকিস্তানিদের একটি স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল দলের প্রতি-আক্রমণ সামলে নিয়ে মুক্তিবাহিনী এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানিদের অবস্থানের ৫০০ গজের ভেতরে পৌঁছে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর সকল সদস্য তাদের ফর্মিং-আপ প্লেসে পৌঁছে পাকিস্তানিদের এই শক্তিশালী ডিফেন্সে যদি আঘাত করে তবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

এখানে পৌঁছে মেজর আবদুর রব আবারও তার অধিনায়ক মেজর সি আর দত্তের কাছে সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। মেজর দত্ত প্রথমে যদিও আক্রমণ শুরু করতে বলেন কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি সমগ্র ব্যাপারটি বিশেষত অসুবিধার দিকগুলো বিবেচনা করে মুক্তিবাহিনীকে পিছু হটে নিরাপদ দূরত্বে ফিরে এসে তাঁর বাহিনীকে ১ দিনের পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করেন। যুদ্ধের অব্যাহত চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে ১ দিনের পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে মেজর আব্দুর রবের এই বাহিনী



www.amarboi.org

আক্রমণের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হয়ে ওঠে। মানসিক চাপও কেটে যায়। তারা কানাইঘাট দখলের জন্য আবারো দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়।

৩ ডিসেম্বর রাত ৮টার দিকে মেজর আব্দুর রব তাঁর দুটি কোম্পানি নিয়ে কানাইঘাট দখলের উদ্দেশ্যে পুনরায় অভিযান শুরু করেন। একই সময়ে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট গিয়াস ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জহিরের নেতৃত্বাধীন কোম্পানি দুটিও দরবশত-কানাইঘাট এবং চরখাই-কানাইঘাট রোডের ওপর ব্লকিং পজিশন তৈরি করার জন্য অগ্রসর হয়। ৩ ডিসেম্বরের দিবাগত রাত ১.৩০ মিনিটের দিকে লেফটেন্যান্ট গিয়াসের বাহিনীর অবস্থানটি পাকিস্তানিরা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সম্ভবত রোডের একটি কালভার্টের পার্শ্বে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের একটি স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল দলের সঙ্গে গিয়াসের বাহিনীর লড়াই বাঁধে। গিয়াসের বাহিনী সমূহ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

একই সময়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জহিরের বাহিনীর অবস্থানও পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরে আক্রমণ করে এবং দু'পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাত ৪টার মধ্যে লে. গিয়াস তাঁর বাহিনী নিয়ে ভালোভাবেই তাঁর ব্লকিং পরিজশন তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। কিন্তু সেকেন্ড লে. জহিরের বাহিনীর অগ্রগতি পাকিস্তানিদের মর্টার ও মেশিনগানের ফায়ারের সম্মুখে অত্যন্ত ব্যাহত হয়। তাঁর বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এ্যামুনিশনের পরিমাণও কমে যায়। ইতোমধ্যে ৪ ডিসেম্বরের ভোর ৪টার দিকে মেজর আব্দুর রব তাঁর দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে ফর্মিং আপ পজিশনে পৌছে যায়। পাকিস্তানিরা মুক্তিবাহিনীর ফর্মিং আপ প্লেসের অবস্থান প্রথমাবস্থায় নির্ণয় করতে পারেনি, কিন্তু বেশ খানিক সময় পরে পাকিস্তানিরা মুক্তিবাহিনীর FUP বুঝে ফেলে প্রচন্ড রকম আর্টিলারি শেলিং শুরু করে।

পাকিস্তানিদের অব্যাহত আক্রমণ মুক্তিবাহিনীর সম্মুখ গতিকে থামিয়ে দিতে পারেনি। মুক্তিবাহিনী ৩ ইঞ্চি মর্টারের ফায়ারিংয়ের কাভার নিয়ে পাকিস্তানিদের অবস্থানের বেশ নিকটে পৌছে যায়। অগ্রসর হওয়ার সময় মুক্তিবাহিনী যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং আক্রমণ শুরু করার আগে তাদের বাড়তি এ্যামুনিশনের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট গিয়াস এবং সেকেন্ড লে. জহিরকে তাদের ব্লকিং পজিশন থেকে কিছু সৈন্য ও এ্যামুনিশন নিয়ে মেজর রবের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হয়। দুই তরুণ অফিসার উক্ত নির্দেশ মোতাবেক মেজর রবের সঙ্গে যোগ দিয়ে কানাইঘাট আক্রমণে শরিক হন। ৪



www.amarboi.org

ডিসেম্বরের ভোরবেলায় পাকিস্তানিদের অবস্থানকে দুই প্রান্ত থেকে বেষ্টনীবদ্ধ করে ফেলা হয়। সকাল ৭.৩০ টার দিকে কানাইঘাটের পাকিস্তানিদের অবস্থানে সর্বাত্মকভাবে ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এদিন দু'পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ যুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী বিরতিহীনভাবে পাকিস্তানিদের বাঙ্কারগুলোতে আঘাত হানতে থাকে। উপয়ান্তর না দেখে পাকিস্তানি বাহিনীর কিছু সদস্য সম্মুখবর্তী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের রিয়ারে দিকে পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ সৈন্যই মুক্তিবাহিনীর নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডের বিস্ফোরণে, রাইফেলের গুলিতে কিংবা ট্রেঞ্চের মধ্যে বেয়নেট চার্জে মৃত্যুবরণ করে। সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা ধরে একটানা যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানিদের ডিফেন্স বিধ্বস্ত হয়। মুক্তিবাহিনী বিজয় অর্জন করে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ১১ জন সৈন্য শহীদ, ২০ জন আহত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানিদের পক্ষে ৫০ জন নিহত, ২০ জন আহত হয় এবং ২৫ জন্য পাকিস্তানি সেনা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এভাবে কানাইঘাট মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেলে জেড ফোর্সের ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষে নির্বিঘ্নে সিলেটের দিকে চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়। কানাইঘাটের পতনের পর পাকিস্তানি সেনাদেরকে চরখাই ও দরবস্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জেড ফোর্সের অধিনায়কের সঙ্গে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ৬ ডিসেম্বর দরবশ্ত শত্রুমুক্ত করে। অধিনায়কের সঙ্গে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ৬ ডিসেম্বর দরবশ্ত শত্রুমুক্ত করে। অতঃপর ব্যাটালিয়নটি চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে হরিপুর হয়ে সিলেটমুখী অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে এবং পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে সিলেটের এমসি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে যায়।

মুক্তিবাহিনীর সেক্টর ট্রুপস পরিচালিত সফলতম যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি হলো এই কানাইঘাটের যুদ্ধ। গৌরীপুরে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাল্টা আক্রমণে অনুপ্রাণীত ৪নং সেক্টর ট্রুপসের কানাইঘাটের ডিফেন্সে চূড়ান্ত আক্রমণস পাকিস্তানিদেরকে প্রকৃতপক্ষেই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। কানাইঘাটে মুক্তিবাহিনীর বহুবিধ সমস্যা ছিল। তাদের না ছিল উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের সুবিধা কিংবা আর্টিলারির সাপোর্ট, না ছিল এয়ার রেইডের সমর্থন, বরং অস্ত্রশস্ত্র, এ্যাম্যুনিশনের ঘাটতি নিয়েই তারা পাকিস্তানি ডিফেন্সে আক্রমণ চালায়। নদী পারাপারের ভালো কোন বন্দোবস্তও তাদের ছিল না তদুপরি মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদলের বেশিরভাগই ছিল স্বল্পকালের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-জনতার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। তথাপি এই অপারেশনটি চমৎকার সাফল্য অর্জন করে। মুক্তিবাহিনী র



www.amarboi.org

দেশপ্রেম, সাহস, সুদৃঢ় মনোবল, বীরত্ব তাদের নানাবিধ দুর্বলতাকে ছাপিয়ে বিজয় এসে দিয়েছিল। কানাইঘাটের যুদ্ধে বিজয় মুক্তিবাহিনীর সিলেট বিজয়েও প্রভাব ফেলেছিল।

আটগ্রামে পরাজয়ের পর সেই দিনই (২১ নভেম্বর) পাকিস্তানিরা চারগ্রামে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গতি রোধ করে। তুমুল যুদ্ধের পর চারগ্রাম মুক্তিবাহিনীর হাতে আসে। এভাবে লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের সুযোগ্য নির্দেশনায় লে. ওয়াকারের বীরত্বে এবং ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সাহসী ভূমিকার কাছে পাকিস্তানিরা হার মানে। অতঃপর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কানাইঘাটের পাকিস্তানিদের মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। ৪নং সেক্টরের ট্রুপসের সহযোগিতায় ৪ ডিসেম্বর কানাইঘাটে পাকিস্তানিদের পতনের পর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্মুখপানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। অতঃপর ব্যাটালিয়নটি চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে হরিপুর হয়ে সিলেটমুখী অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে।

কানাইঘাটের যুদ্ধে বিজয় মুক্তিবাহিনীর সিলেট বিজয়েও নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলেছিল। কানাইঘাটের পতনের পর পাকিস্তানিরা পিছিয়ে দরবস্ত এবং খাদিমনগরে অবস্থান নেয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পাকিস্তানিদের এসব অবস্থান এড়িয়ে যৌথবাহিনীর ৪/৫ গুর্খা ব্যাটালিয়নকে হেলিকপ্টারে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে ড্রপ করা হবে। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানিদের অবস্থানের মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে অনুপ্রবেশ করে তাদের সঙ্গে লিংকআপ করবে। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট হাওড়ের মধ্য দিয়ে কানাইঘাট-চরখাই হয়ে সিলেট-দরবশত সড়কে পৌঁছানো এবং সিলেট পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কাঁচা রাস্তা, বিল, হাওড়ে মধ্যে দিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার কর্ণেল জিয়াউর রহমানসহ ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এক দুর্গম পথ ধরে সিলেট অভিমুখে রওনা দেয়। এই বাহিনীতে ছিল প্রায় ১১০০ সৈন্য। ৬ ডিসেম্বর ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জেড ফোর্সের অধিনায়কের সঙ্গে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে দরবশত পাকিস্তানি মুক্ত করে। কর্ণেল জিয়ার আদেশে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানিদের কে দরবশতে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। ৪নং সেক্টরের তরুণ অফিসার লেফটেন্যান্ট জহিরের কোম্পানির সঙ্গে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সম্মিলিত আক্রমণে দরবশতেও পাকিস্তানি সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে।

মুক্তি বাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ করেও হরিপুর থেকে পাকিস্তানি সেনাদেরকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তানি সৈন্যরা ১১ ডিসেম্বর নদী



www.amarboi.org

www.amarboi.org
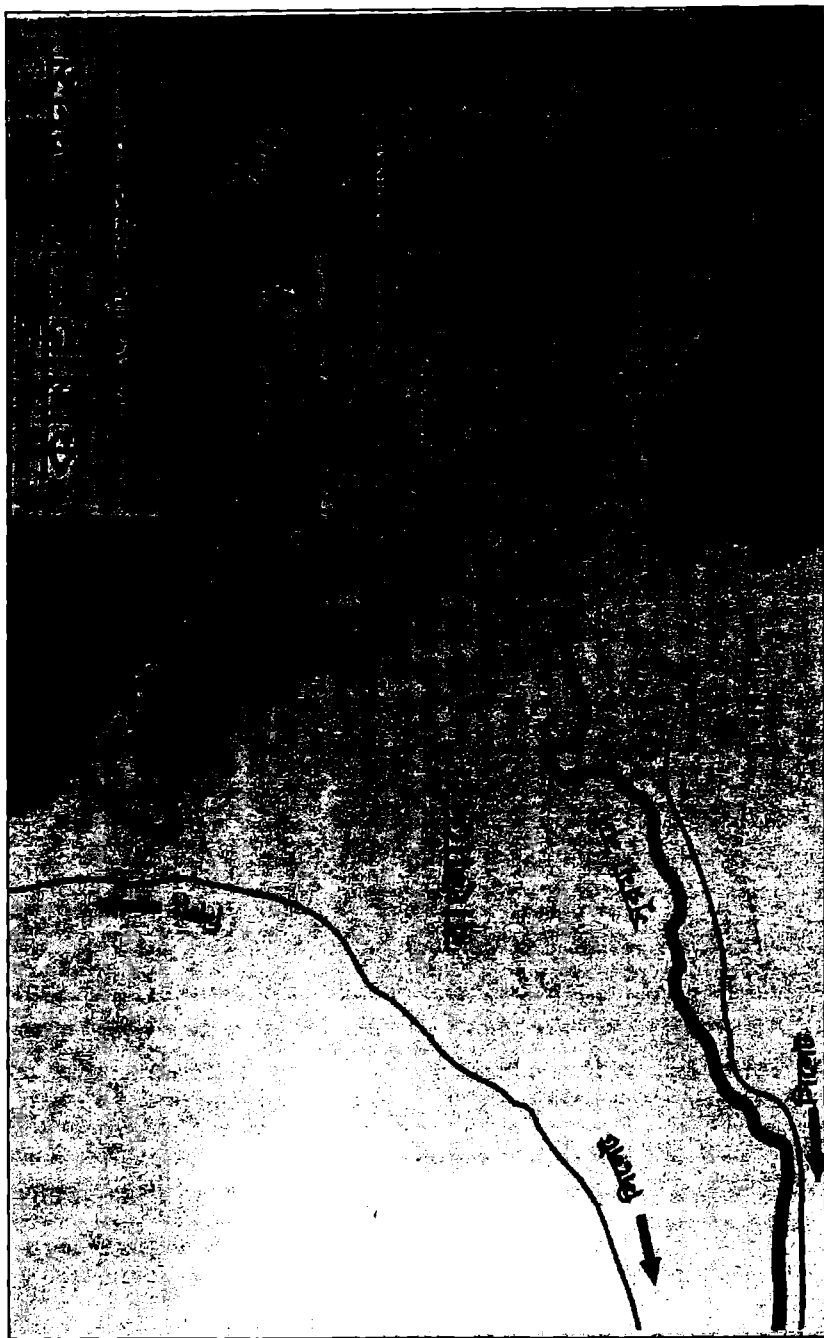
পার হয়ে আক্রমণ করে মুক্তি বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর বেশ ক্ষতিসাধন করে। এই আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় ১২ ডিসেম্বর দুই দিক থেকে হরিপুরে আক্রমণ করে। এবারের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তানিরা হরিপুর থেকে পশ্চাদপসরণ করে। পথিমধ্যেকার পাকিস্তানীদের বেশকিছু ছোট-বড় ছাউনি উচ্ছেদ করে। ৭ ডিসেম্বর দরবস্ত থেকে সরে আসা পাকিস্তানিরা হরিপুরে ডিফেন্স তৈরি করে। প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সহ ৮ ডিসেম্বরে চিকনাগুল চা বাগান এলাকায় পৌছে যায়। ১০ ডিসেম্বরের গভীর রাতে এই বাহিনী সিলেট-দরবশত সড়কের কাছাকাছি এক গ্রামে এসে পৌছে।

## অপারেশন এমসি কলেজ (১৩-১৫ ডিসেম্বর '৭১)

*১৫ ডিসেম্বরে সিলেট এম সি কলেজ- এ মেজর জিয়ার সঙ্গে ভারতীয় সেনা অফিসারবৃন্দ*

ব্রিগেড কমান্ডার লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ১৩ ডিসেম্বর ১ বেঙ্গল সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজ সংলগ্ন পাকিস্তানিদের শক্তিশালী ডিফেন্সের মুখোমুখি হয়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানিদের অবস্থান থেকে ৫০০ গজ দূরে এমসি কলেজের উত্তরদিকের টিলাগুলোর ওপর তাদের প্রতিরক্ষা



www.amarboi.org

অবস্থান নেয়। এই প্রতিরক্ষা অবস্থানের সামনের ডিফেন্সে ছিল ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ব্র্যাভো কোম্পানি এবং ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানি। পিছনে অর্থাৎ রিয়ার ডিফেন্সে ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে আলফা কোম্পানি এবং লেফটেন্যান্ট কাইয়ূমের নেতৃত্বে চার্লি কোম্পানি অবস্থান নেয়। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারসহ যথারীতি ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল জিয়াউর রহমান এই ব্যাটালিয়নের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই ৪টি কোম্পানির প্রতিরক্ষা অবস্থানের মাঝামাঝি অবস্থান নেন। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর আর্টিলারির একজন ব্যাটারি কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে তিনি তার গান পজিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে ৩ ইঞ্চি মর্টারের মাত্র ১৪টি গোলা অবশিষ্ট ছিল। তথাপি পাকিস্তানিদের নাকের ডগায় মুক্তিবাহিনী ট্রেঞ্চ খনন করে পজিশন নিতে থাকে।

পাকিস্তানিরা অতি নিকটেই ছিল এবং নির্বিকারভাবে মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। তারা চিন্তাও করতে পারেনি এরা মুক্তিবাহিনী। কারণ মুক্তিবাহিনীর পোশাক, স্টিলের হেলমেট, অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানিদের মতই ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরক্ষা অবস্থানের পিছনে এবং বাদিকে খাদিমনগরে যুদ্ধ চলছিল ফলে তাদের পজিশনের ভিতর দিয়ে মুক্তিবাহিনী এত তাড়াতাড়ি সিলেট শহরে প্রবেশ করবে পাকিস্তানিরা সেটি কল্পনাও করতে পারেনি। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু চলতে থাকে। চিৎকারের জবাব না দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিরবে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে থাকে। এ সময় ডেল্টা কোম্পানির পজিশনের সামনের রাস্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর একটি আর্টিলারি গান ও দুটি জীপের কনভয় থাকে। ডেল্টা কোম্পানির কমান্ডার উক্ত কনভয়ের ওপর মর্টারের গোলাবর্ষণ করেন, যার ফলে একটি জীপে আগুন ধরে যায়। পাকিস্তানিরা এমতাবস্থায় সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যে যেদিকে পারে ছোটাছুটি করতে থাকে। তাদের মনোবল তখন বোধকরি করুণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল

এ সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগান দিয়ে তাদের আক্রমণ চালায়। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৫ জন সৈন্য রাস্তার ওপরই হতাহত হয়। পাকিস্তানিরাও মর্টারের সাহায্যে মুক্তিবাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং তাদের সৈন্যদের মৃতদেহগুলো সরিয়ে নিতে চেস্টা করে। এ সময়



www.amarboi.org

মুক্তিযোদ্ধাদের নিখুঁত গুলিবর্ষণের ফলে পাকিস্তানিদের আরও কিছু সৈন্য হতাহত হয়। দুপুরে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এবং মর্টারের প্রবল গোলাবর্ষণের সাহায্যে ব্র্যাভো কোম্পানির ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মর্টারের গোলা শেষ হয়ে যায়। তবু মুক্তিযোদ্ধারা মেশিনগান, হালকা মেশিনগান এবং রাইফেলের সাহায্যে দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানিদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতে থাকে। মুক্তিবাহিনী ওয়্যালেসের মাধ্যমে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং তাদের কাছে বিমান হামলার সাহায্য চাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিত্রবাহিনীর বিমান পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের ওপর হামলা চালায়। বিমান ও পদাতিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৮০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং তারা বিদ্ধস্থ হয়ে যায়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্র্যাভো কোম্পানি এবং ডেল্টা কোম্পানির মোট ২০ জন সৈন্য শহীদ হন এবং আরো প্রায় ২০ জন সৈন্য গুরুতর ভাবে আহত হন।

এদিকে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে এবং ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ খবর শুনে আমরা সবাই উল্লসিত হলাম। উপলব্ধি করলাম শুরু হলো শেষ লড়াই, যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই। দেশ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হবে। ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনীর যৌথ আক্রমণ শত্রুর পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থনহীন এবং ঘৃণার শিকার হয়ে কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। বিগত কয়েক মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়ায় তাদের মনোবল এরি মধ্যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। ফলে বোঝাই যাচ্ছিল তাদের পরাভূত করতে যৌথবাহিনীকে তেমন কষ্ট করতে হবে না।

সিলেট শহর দখলের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো। পাকবাহিনীরা পিছিয়ে এসে শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছে দরবশত এবং খাদিমনগর এলাকায়। স্থির হলো, এসব অবস্থান এড়িয়ে মিত্রবাহিনীর ৪-৫ গুর্খা ব্যাটেলিয়নকে হেলিকপ্টারে ড্রপ করা হবে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এবং ১ম ইস্ট বেঙ্গল শত্রু অবস্থানের মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে অনুপ্রবেশ (Infiltration) করে তাদের সঙ্গে লিঙ্কআপ করবে।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কানাইঘাট-চুরখাই হয়ে হাওরের ভেতর দিয়ে পথ পোড়িয়ে সিলেট-দরবশত সড়কে উঠবো এবং সেখানকার পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী রুট



www.amarboi.org

সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবো। পুরো ব্যাটেলিয়ন যাত্রা করলাম সিলেটের উদ্দেশে। লক্ষ্য, সবার আগে সিলেট শহর দখল করতে চাই। কানাইঘাট এরি মধ্যে শত্রুমুক্ত হয়েছে, সেখানে মুক্তিবাহিনীর বিজয়ী সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হলো। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জহিরের নেতৃত্বে একটি এমএফ কোম্পানি এবং ক্যাডেট মুদাস্‌সরের নেতৃত্বে অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গলের ইকো কোম্পানীও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। যেহেতু কাঁচা সড়ক এবং হাওরের ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, তাই পর্যাপ্ত খাবার ও গোলাবারুদও সঙ্গে নেওয়া যাবে না। সবাই, যতোটুকু বহন করা সম্ভব, চিড়াগুড় এবং এ্যামুনিশন পিঠের বিগপ্যাকে নিয়ে নিলাম। তিন বছর আগে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি ছাড়ার পর এতো ভারি বোঝা কখনো বইতে হয়নি আমাদেরকে। অর্ডারলি আফতাব আমার বিগপ্যাকও বহন করতে ইচ্ছুক, অনেক বলে কয়ে তাকে নিরস্ত করলাম।

আমাদের প্রায় ১১০০ সৈনিকের বহর যাত্রা শুরু করলো সিলেটের উদ্দেশে। সামরিক কায়দায় এগিয়ে চলেছি, বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পানি ও ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মিত্রবাাহিনীর ব্যাটারি কমান্ডার মেজর রাও সঙ্গে আছেন। তার বেতার সেটের মাধ্যমে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছি আমরা। গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য আমরা সারারাত হাঁটি, দিনে ঝোঁপঝাড়ে লুকিয়ে থাকি। পাঁকে ভর্তি হাওরের মধ্যে আমাদের চলার গতি শ্লথ, পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত জোঁক রক্ত খেয়ে এক সময় আপনা আপনি ঝরে পড়ে, কারো সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। শত্রুর পশ্চাদপসরণের কারণে আমাদের মনোবল এখন তুঙ্গে। শেষ রাতের দিকে বিশ্রাম নিই আমরা। কমান্ডার জিয়াউর রহমানের সঙ্গে পলিথিনের কভার দেওয়া বিশাল ম্যাপ রয়েছে (৮ ফুট বাই ৬ ফুট। হাবিলদার রউফ দিনে বহন করে, রাতে সেটি বিছিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার জিয়া'র সাথে আমারও শোবার সুযোগ হয়।

৮ ডিসেম্বর। চন্দ্রালোকিত রাত। হাওরের একপ্রান্তে ম্যাপ কেস বিছিয়ে আমরা গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। থেমে থেমে মিডিয়াম কামানের গোলার শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবত দরবশত এলাকায় সংঘর্ষ চলছে। শুয়ে নিচু স্বরে নানা বিষয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের যে স্বপ্ন দেখে আসছি, শেষ পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকবো তো কাঙ্খিত বিজয় সেলিব্রেট করার জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন হবে, কেমন থাকবে দেশবাসী ? পাকিস্তানিদের জায়গায় ভারতীয়রা আবার জেঁকে বসবে না তো !

১০ ডিসেম্বর গভীর রাতে সিলেট-দরবশত সড়কের কাছাকাছি এক গ্রামে এসে পৌছুলাম। সামরিক ম্যাপ দেখে স্থির করলাম বসতিপূর্ণ এলাকা ছেড়ে চা



www.amarboi.org

বাগানের পথ ধরে এগুনোই আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। যদিও চা বাগানের মাঝে ম্যাপের সাহায্যে পথ চলা কষ্টকর, তবুও এ পথে শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা কম। পাঁচজনের একটি রেকি গ্রুপ নিয়ে মহাসড়কের দিকে গেলাম একটি ক্রসিং পয়েন্ট নির্বাচন করার জন্য। গ্রামের পথ ধরে এগুচ্ছি, জনমানবের কোনো সাড়াশব্দ নেই, ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। একটু এগুতেই পাকা সড়ক পেলাম। ধীর গতিতে দু'টি সামরিক যান সিলেটের দিকে চলে গেলো হেডলাইট নিভিয়ে। পাকবাহিনী না মিত্রবাহিনীর গাড়ি, অন্ধকারে বোঝা গেলো না। সড়ক পেরুলেই অপর পাশে জঙ্গল আর চা বাগান। একটি সুবিধাজনক ক্রসিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে ফিরে এলাম।

জিয়াউর রহমান, জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ ম্যাপ খুলে চা বাগানের ভেতর দিয়ে সিলেট পৌছানোর জন্য একটা রুট ঠিক করলেন। ভোর হওয়ার আগেই পূর্বনির্ধারিত ক্রসিং পয়েন্ট দিয়ে আমরা সবাই খাদিমনগর-দরবশত সড়ক পেরিয়ে চা বাগানের ভেতর প্রবেশ করলাম। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে চা বাগানগুলো ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ম্যাপ রিডিং করে পথ চলা খুবই শক্ত, তবে বিমান আক্রমণ এবং শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করার সম্ভবনা কম। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ধীর গতিতে এগুতে লাগলাম সিলেট অভিমুখে। এক সময় মেজর রাও জানালেন, তিনি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে বেতার সেটে যোগাযোগ করতে পারছেন না, ফলে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম আমরা।

তিনদিন ধরে এগিয়ে চলেছি অব্যবহৃত চা বাগান আর ঘন জঙ্গরের ভেতর দিয়ে। সরু গ্রাম্যপথ ধরে দ্রুত এগুনো সম্ভব হচ্ছে না। অনেক সময় জঙ্গল কেটে এগুতে হচ্ছে। কোনো জন মানবের দেখা নেই। লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে আগেই। সঙ্গে বহন করা চিড়ে-গুড় শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে। ৩৬ ঘন্টা ধরে সবাই অভুক্ত। চিকনাগুলে একটি মোটাতাজা গরু পাওয়া গেলো, বিসমিল্লাহ বলে রাইফেল দিয়ে গুলি করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করা হল। ছুড়ি বেয়নেট দিয়ে মাংস ছিলে, টুকরো করে, নালার পানিতে সেদ্ধ করা হলো, লবণ বা কোনো মসলা ছাড়াই। পাঁচ তারা হোটেলের অভিজ্ঞ শেফ-এর তৈরি যে কোনো স্টেক-ডিশের চাইতে এ মাংস সুস্বাদু মনে হলো। ক্ষুধাই নাকি সবচাইতে উপাদেয় সস্। আমাদের বাঁ দিকে কিছুটা পেছনে গোলাগুলির শব্দ পেলাম। দু'টি ফাইটার এসে দূরে, সম্ভবত খাদিমনগর এলাকায় কয়েকটি রকেট নিক্ষেপ করে গেলো। সেগুলো কোন পক্ষের ফাইটার, বোঝা গেলো না।



www.amarboi.org

১৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এম সি কলেজের উত্তর পাশে এসে পৌছলাম। ১৪ ডিসেম্বর ভোরের আলো ফুটতেই দু'শ গজ দূরে টিলার ওপর এম সি কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবন দৃষ্টিগোচর হলো। সেদিকে মুখ করে ব্রাভো কম্পানির প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্থাপনের উদ্যোগ নিলাম। আমার ডান দিকে ডেলটা কম্পানি। পেছনে চার্লি, আলফা কম্পানি ও ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার। সামনের টিলায় রোদ পোহাবার জন্য খাকি পোশাক পরা সৈনিকেরা বাঙ্কারের ওপর উঠে দাঁড়ায়, তাদের চেহারা-সুরত দেখে বুঝলাম এরা পাকবাহিনীর সদস্য। তারাও আমাদেরকে অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে। সে মুহূর্তে যুদ্ধ চলছে কয়েক মাইল দূরে খাদিমনগর এলাকায়, শহরের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী এসে গেছে এটা তারা ভাবতেই পারে নি। আমাদের পরণে তাদের মতোই খাকি পোশাক, হাতে অনুরূপ চাইনিজ অস্ত্র। তারা উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষায় চিৎকার করে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলো। আমরা উত্তর না দিয়ে দ্রুত ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চলেছি ডিফেন্স নেবার জন্য। আমাদের নীরবতায় এবং তাদের দিকে মেশিনগান তাক করে পজিশন নেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেলো আমরা কারা! দ্রুত সংগঠিত হয়ে তারা আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ করে। আমরা টিলার ওপরে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে আক্রমণ প্রতিহত করি এবং তাদের প্রায় চল্লিশ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। যেহেতু আমাদের ট্রেঞ্চগুলোর অর্ধেকও খোঁড়া হয়নি, আমাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলো। ব্রাভো কম্পানির সাতজন শহীদ ও ১৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হলো। খর্বাকৃতি বলে যাকে একদিন রিক্রুট করতে চাইনি, সেই সদাহাস্যময়, সাহসী তরুণ যশোরের বন্দুক বিক্রেতার ছেলে মহিউদ্দিন শহীদ হলো। আমার যোগ্যতম প্লাটুন কমান্ডার দুঃসাহসী যোদ্ধা সুবেদার ফয়েজ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে শহীদ হলেন। মেশিনগান ডিটাচমেন্টের সেপাই বাচ্চু মিয়া ও নূর নবী শহীদ হওয়ার পর নায়েব সুবেদার হোসেন আলী সাহসিকতার সঙ্গে মেশিনগান চালিয়ে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। আহতদের পেছনে পাঠিয়ে দিলাম। ডাক্তার মুজিব ফকির তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জীবন-রক্ষাকারী ইনজেকশন দিয়ে কোনো প্রকারে বাঁচিয়ে রাখেন।

দুপুরের দিকে সৌভাগ্যবশত মেজর রাওয়ের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর বেতার সংযোগ পুনঃস্থাপিত হলো। আমি তাঁকে সামনের অধ্যক্ষ ভবনে অবস্থানরত পাকবাহিনীর ওপর বিমান হামলার জন্য অনুরোধ পাঠাতে বললাম। কিছুক্ষণ পর তিনি জানালেন মিত্রবাহিনীর বিমান আসছে। আধঘন্টা পর মিত্রবাহিনীর দু'টি ফাইটার এসে সামনের পাকসেনাদের বাঙ্কার এবং দালানের ওপর প্রায় ১০ মিনিট ধরে



www.amarboi.org

রকেট নিক্ষেপ করে গেলো। আমাদের সৈনিকেরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। বিমান আক্রমণের শব্দই পদাতিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। রকেট হামলার পর পাকসেনাদের আর কোনো তৎপরতা দেখা গেলো না।

১৫ ডিসেম্বর। খবর পেলাম পাকবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে পরদিন আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা হলাম, বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অবশেষে হাতের মুঠোয় এলো। সৈনিকদের এ খবর জানাতেই তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। নির্ধারিত সময়ে হাতের স্টেন শূন্যে তুলে ধরে কিছুক্ষণ একটানা ফায়ার করে বিজয় সেলিব্রেট করলাম। দুপুরের দিকে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে হেঁটে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি আসর জমিয়ে গল্প করছেন জিয়াউর রহমান, জিয়াউদ্দিন, পাটোয়ারী, নূর, লিয়াকত ও ডাক্তার মুজিব। সবার হাতের মগে ধূমায়িত চা। আবেগভরে সবার সঙ্গে কোলাকুলি করলাম। জিয়াউর রহমান মুচকি হেসে গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলেন, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড?

'হোয়াট হ্যাপেন্ড, মানে যুদ্ধ শেষ, আমরা বেঁচে আছি। কী আশ্চর্য,' আমার জবাব। সবাই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি। একটু পরেই সম্মিলিত অট্টহাসি।

১৬ ডিসেম্বর। এমসি কলেজের উত্তরে অবস্থিত টিলা ও ক্যাটল ফার্ম এলাকার পরিখাগুলো থেকে আমরা সবাই নিচে নেমে এসে সারিবদ্ধভাবে যাত্রা করলাম সিলেট রেলস্টেশনের উদ্দেশে। রাস্তার দু' পাশে দাঁড়িয়ে আছে শহরবাসী লোকজন, তাদের হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না দেশ শত্রুমুক্ত। তাদের নিজস্ব বাহিনী দৃপ্ত ভঙ্গিতে, দিবালোকে রাস্তা কাঁপিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে সামনে দিয়ে, গতকালও তাদের কাছে এ দৃশ্য ছিল অকল্পনীয়। সেনাদলের অগ্রভাগে হেঁটে চলেছি। হাতে বেতার যন্ত্রের হ্যান্ডসেট, পাশাপাশি চলেছে সেট বহনকারী সিগনালার। হাঁটছি আর ভাবছি, স্বপ্ন দেখছি না তো। দেশ সত্যিই স্বাধীন হলো অবশেষে! নয়টি মাস প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে, বনে-জঙ্গলে মশা আর জোঁকের কামড় খেয়ে, কামান আর মেশিনগানের মরণ ছোবল উপেক্ষা করে বিজয়ী হয়েছি, বেঁচে আছি- এও কি সম্ভব? যেন চলচ্চিত্রের সিনেরীল মানসপটে ভেসে উঠল সারা মার্চ ব্যাপী স্বাধীকারের আন্দোলন ও সংগ্রাম, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চে পাক হানাদারদের বর্বরতম হত্যাকান্ড, ২৫ মার্চ রাতেই জিয়াউর রহমানের ৮ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন নিয়ে ৫ ডিভিশন হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, ২৬ মার্চ অমিতবিক্রম মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, ফলশ্রুতিতে সারাদেশ ব্যাপী সমস্ত ক্যান্টনমেন্ট, সেনা ছাউনি, ইপিআর, পুলিশ



www.amarboi.org

আনসারদের বিদ্রোহ, জিয়াউর রহমানের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ দিন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করে ত্রিপুরার সাব্রুমে ঘাটি স্থাপন, মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় প্রবাসী সরকারের অভিষেক, বেনাপোলের যুদ্ধ, রিক্রুটদের ট্রেনিং, কামালপুর, নক্শী বিওপি, বাহাদুরবাদ ঘাট-দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল পাক আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ, বিশ্ময়কর চিলমারী অভিযান, ছালিয়া পাড়া, কোদালকাটি, ধলই, গৌরিপুর, চারগ্রাম, আটগ্রামের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষসহ অসংখ্য এ্যামবুশ আর রেইডের দৃশ্যাবলি। স্বদেশের মাটিতে সেনাদলসহ স্বাধীনতার মিষ্টি রোদে অবগাহন করে বীরের ভূমিকায় আপনজনের মাঝে আবার ফিরে এসেছি। নিজেকে মহাযুদ্ধের সমর নায়কের মতো মনে হচ্ছিল। স্বাধীনতা যে এতো আনন্দের উৎস, আগে তা কখনো অনুভব করিনি। স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। ১৭৫৭ সালে যে স্বাধীনতা ইংরেজ বেনিয়া আর তাদের দেশীয় দোসরদের চক্রান্তে হারিয়ে ছিলাম তা আবার রক্তের বিনিময়ে ফিরে পেলাম!



www.amarboi.org

## সেক্টর কমান্ডার এম. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক

### সংক্ষিপ্ত জীবনী

এম. হামিদুল্লাহ খান বিক্রমপুর পরগণার লৌহজং থানার মেদিনীমন্ডল গ্রামে ১৯৪০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম এম. দবিরুদ্দীন খান এবং মাতা মরহুমা জসিম উন্ নিছা খান। পিতার বদলীযোগ্য সরকারী চাকুরীর কারণে তাকে দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করতে হয়েছে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর রিসালপুর একাডেমীতে যোগদান করেন। সেখানে দুই বছর প্রশিক্ষণ শেষে কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সনে তিনি পাকিস্তানী জান্তার নৃশংস বাঙ্গালি হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার পর প্রথম এ্যাসাইনমেন্ট পেলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্ববৃহৎ গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্প ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়ায় প্রবাসী সরকারের প্রধান সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে। চাকুলিয়ায় সি-ইন-সি স্পেশাল ব্যাচের ট্রেনিং সফল সমাপ্তির পর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী তাঁকে উত্তর ফ্রন্টে মেজর জিয়ার কমান্ড অধীন 'জেড' ফোর্সের হেড কোয়ার্টার ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তেলঢালা নামক ঘাঁটিতে পোষ্টিং দেন। সেখানে পৌছামাত্র মেজর জিয়া তাঁকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বিপরীতে মেঘালয়ের দনীবন্দর মানকাচর সাব-সেক্টরের অধিনায়ক হিসাবে রণাঙ্গণে যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনার দয়িত্ব প্রদান করেন। ৩ নভেম্বর তিনি ১১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। ঐ সেক্টরের অধিনস্থ ৮টি সাব-সেক্টরের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হয়।

আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত হামিদুল্লাহ খান এর যুদ্ধের ব্যাপক সফলতার বিশদ বিবরণের সিট্রেপ (সিচুয়েশন রিপোর্ট) এর মাধ্যমে তেলঢালা থেকে প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। প্রবাসী সরকার ঐ সাফল্যের মূল্যায়ন করে তাঁকে ফিল্ড প্রমোশন দিয়ে স্কোয়াড্রন লীডার পদে উন্নীত করেন।

সেক্টর কমান্ডার হিসাবে তিনি আনুমানিক ২২৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি বিশাল বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে সাফল্যের সাথে ঢাকা অভিযানে ১৫ ডিসেম্বর রাজধানীর উপকন্ঠে সাভার ও জয়দেবপুর পৌঁছে যান। বিডিএফ হেড কোয়ার্টার এর নির্দেশে সদলবলে ঢাকায় অগ্রসর হওয়ার উপর নিষিদ্ধাদেশ